ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

উপাসনা তত্ত্ব।

শ্রী-উপেন্দ্র-চন্দ্র-মিত্র-কৃত

প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল আমি কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত "ভাগবত সভার" প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়া অবধি বঙ্গ, বিহারের কিয়দংশ ও ত্রিহুতের কিয়দংশ যে যে স্থানে, ভক্তি বিষয়ক, ধর্ম্ম ও সাধনতত্ত্ব বিষয়ক যে সকল বক্তৃতা করিয়াছি; তাহা শ্রবণে আনন্দিত হইয়া সুবিজ্ঞ হইতে সাধারণ সভ্যগণ মাত্রেই আমাকে সেই সকল বক্তৃতার সারাংশ পুস্তকাকারে প্রচার করিতে অনুরোধ করেন। বহুদিবস যাবৎ সে ইচ্ছা বলবতী ছিল, কার্য্যানুরোধে সফল হয় নাই। এতদিনে ভগবান বাসুদেবের ও শ্রীগুরুর কৃপায় সেই সকল বক্তৃতার সারাংশ উপাসনা-তত্ত্ব নামে পুস্তকাকারে প্রচারে বাধ্য হইলাম। ইহাতে আমার নিজের কল্পনা বা কৃতীত্ব কিছুই নাই, সমস্তই শ্রীসম্প্রদায় চূড়ামণি মদ্‌গুরু পূজ্যপাদ মাধবচৈতন্যস্বামী পরমহংস প্রবরের উপদেশ এবং শাস্ত্র-বাক্য লিখিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। ইতস্ততঃ প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশিকে একত্রে সংগ্রহ করিয়া যেখানে যেটি সাজাইলে সুশোভিত হয়, ইহাই যেমন মালাকার করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই উপাসনা-কুসুমতত্ত্ব-সুষমা আমি সংগ্রহ করিলাম মাত্র। মালাকার যেমন মালা গাঁথিয়া দেবতাকে ও বিলাসীকে সুসজ্জিত করে, তদ্রূপ আমিও উপাসনাতত্ত্বরূপী, গুরু ও শাস্ত্রপ্রণেতা আর্য্যঋষিগণের বাক্যকুসুমগুলিকে প্রমাণরূপী মাল্যেসজ্জিত করিয়া তাঁহাদের চিরপবিত্র নাম সুরঞ্জিত করিলাম। হরি ভগবৎতত্ত্বরসের বিলাসী তাঁহাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে সাজাইতে চেষ্টা করিলাম। মালাকারের ন্যায় পরকেই সাজাইলাম, সকলকে

সুশোভিত দেখিয়া সুখী হইলাম, কিন্তু নিজে সুশোভিত হইতে পা। লাম না, এই দুঃখেই দিবানিশি কাঁদিতে কাঁদিতে দুর্ল্লভ জন্ম ক্ষয় করিলাম। যাহা পাঠ করিলে মনুষ্য পুরুষার্থের ছায়া দর্শন করে। যাহা অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্য পুরুষার্থ সম্পন্ন হইয়া শমনকে দমন করিয়া জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক ও ত্রিতাপের জ্বালাকে উপহাস করে যাহা অনুষ্ঠান করিয়াই আর্য্য সংসার স্বর্গকে তুচ্ছ করিয়াছে ব্রহ্মপদকে উপহাস করিয়াছে; স্বয়ং ভগবানকে দাসত্ব করাইয়াছে। যে সিদ্ধির বলে ভৃগুমহর্ষির যুগলচরণ ভগবানের বক্ষঃস্থলে অলঙ্কার রূপে পরিণত হইয়াছে। যাহা সাধনা করিলে মনুষ্য দেবতার দেবতা এবং যাহা অনুষ্ঠান না করিলে মনুষ্য বিষ্ঠার কৃমি হইতেও হেয় হয়। তাহারই নাম উপাসনা। ভারতে এখন আছে কি! ধন নাই যে জগৎ সম্মান করিবে! বল নাই যে জগৎ গৌরব করিবে! কিন্তু এখনো যে জ্ঞানের জন্য, যে পারমার্থিকী বিদ্যার জন্য, জগৎ ভারতের কাছে ঋণী; সেই দেবতার দুর্ল্লভ, সংসারের দুর্ল্লভ, বাহ্যধনমানবলের দুর্ল্লভ; উপাসনাতত্ত্ব এক্ষণেও ভারতের স্তরে স্তরে বিরাজমান, ভারতের কন্দরে কন্দরে বিরাজমান, ভারতের অরণ্যে অরণ্যে বিরাজ মান, অর্থাৎ যাহা আছে বলিয়া এখনো ভারত ইংলণ্ডের শিক্ষাস্থল! আমেরিকার আদর্শস্থল! জর্ম্মনীফ্রান্সের শ্রদ্ধাস্থল! আমরা সেই বিজ্ঞান প্রণোদিত অপার্থিব অলৌকিক বিষয়কে যাহাতে আর না বিস্মৃত হই, ইহার জন্যই উপাসনাতত্ত্বের প্রয়োজন।

ভারত জ্ঞানের আদি প্রকাশস্থান, এইস্থানেই সৃষ্টির আদি হইতে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি, বিজ্ঞানের প্রবাহ যুগযুগান্তর হইতে প্রকাশ হইয়াছিল। বল, বীর্য্য, ধৈর্য্য, জ্ঞান, ভারতে কিসের অভাব ছিল? ধন, মান, ঐশ্বর্য্যে ভারত কিসের ভিখারী ছিল! জগৎ ভারতের কাছে ভিক্ষা করিয়াছে করিতেছে, ও করিবে; দয়ারখনি ভারত চিরদিন জগৎকে দিয়াছে, দিতেছে ও দিবে!! ভারতে যখন পুরুষার্থ বিরাজ করিত, জগৎ তখন ভারতের দ্বারে ভিক্ষা করিত!! জগতের কে কোথায়

জানিত যে ভূমিতলের গর্ভে মণিস্বর্ণ জন্মায়; ভারত সন্তান উপাসনা-বলে, তপস্যা বলে, আকর হইতে মণিরত্ন উঠাইয়াছে, কণ্ঠে ধরিয়াছে; আত্মীয়স্বজনকে পরাইয়াছে, দেবতাকে সুশোভিত করিয়াছে, দরিদ্রকে দান করিয়াছে; যখন ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে তখন সেই ধনরত্ন-মালাকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া উলঙ্গ হইয়া সর্ব্বাত্মাকে ভগবানে অর্পন করিয়াছে!! সংসারে কে কোথায় জানিত যে, সিন্ধুর অন্তরে শুক্তির গর্ভে মুক্তা জন্মায়, ভারত সন্তানই তপস্যাবলে অতলস্পর্শ সাগরতল হইতে তাহা উঠাইয়াছে; ব্যবহার করিয়াছে, শেষে ভক্তিমালাকে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া সেই প্রেমে উন্মত্ত হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছে।

অতএব উপাসনা বলে ভারত জ্ঞানী, ভারত ধনী, ভারত জগতের মধ্যে সকল বিষয়ের আদর্শস্থান ছিল। এখনো যাঁহারা উপাসক বা সিদ্ধ, তাঁহারা জগতের মৃত প্রাণের সঞ্জীবনীশক্তি বলিয়া বিখ্যাত আছেন। শ্রদ্ধা ভক্তি না থাকিলে, প্রাণে প্রাণে মিলে না। প্রাণে প্রাণে না মিলিলে একতা আসে না। যে ভক্তিপ্রেমবলে ঈশ্বরকে জয় করা যায়; বিশ্ববিমোহনকারিণী মায়াকে দাসী করা যায়; সেই ভক্তজীবন যে সংসারে একতা স্থাপন করিয়া ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধন করিবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? ধর্ম্মের বল ও ভগবৎবিশ্বাস ভিন্ন জগতের কখন কাহারো ঐহিক বা পারমার্থিক উন্নতি ঘটে নাই ও ঘটিতে পারে না!!

আমরা ধর্ম্মবলচ্যুত হইয়া, শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া, অবিশ্বাসী হইয়া, আয়ু নষ্ট করিয়াছি; ধন, মর্য্যাদা, কুল, শীল সকলি নষ্ট করিয়াছি। আমরা জগতের গুরু ছিলাম, একা ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্ত ধর্ম্মবল বিহনে পথের ভিখারী ও উদরান্নের জন্য কুকুরের ন্যায় লালায়িত হইয়াছি। রোগ, শোক, জরা ও অকালমৃত্যুতে আক্রান্ত হইয়াছি। সকলেই রোগী, সকলেই দুঃখী, সকলেই বুদ্ধি ও বল হীন। যেমন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর জনকজননীও পুত্রের

মুখের গ্রাস পশুর ন্যায় বলপূর্ব্বক গ্রাস করে; তদ্রূপ আমরা একা ধর্ম্মশ্রদ্ধা বিহনে সুখের ভারত সংসারকে দুঃখের দুর্ভিক্ষভূমি করিয়াছি, স্বামী স্ত্রীতে প্রবঞ্চনা; পিতা পুত্রে, আত্মীয় ভ্রাতায় সদাসর্ব্বদা স্বার্থ লইয়া কলহ করিতেছি। ছিলাম মনুষ্য দেবতার পূজ্য. জগতের আদর্শ ভারত সন্তান !! কেবল ধর্ম্ম, শ্রদ্ধা ও ভক্তি বিহনে হইলাম কাক, শৃগাল, কুকুর ও শূকরাদি পশুর ন্যায় আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও মৈথুনের জন্য লালায়িত; দিবানিশি ক্ষুব্ধ; জগতের সম্মুখে উপহসিত।"

হায়! হায়!! আর্য্যভ্রাতাগণ, একবার প্রাচীন শান্তিপূর্ণ অবস্থা মনে কর, পশুভাব ত্যাগ করিয়া উপাসনাবলে, ধর্ম্ম ও ভক্তিবলে বলীয়ান হও! দুঃখ ও দুর্দ্দশা হইতে জীবনকে সুখে লইয়া যাও। ভোগ বা মোক্ষ যে দিকে তাকাও, জরা, ব্যাধি, শোক ও তাপ কোন অবস্থাই আমাদের প্রিয়ঙ্কর হইবে না। তাই বলি ভোগ করিলেও উপাসনা চাই; মুক্তি ইচ্ছা করিলেও উপাসনা চাই। উপাসনা জীবকে ব্রহ্ম করে, নির্জীবকে চৈতন্য দেয়, মূর্খকে পণ্ডিত করে, আয়ুহীনকে দীর্ঘায়ু করে; রোগীকে সুস্থ করে; শোক ও তাপকে প্রশান্ত করে, মর্ত্ত্যকে অমৃতপদ প্রদান করে। অতএব উপাসনা বালক, যুবক, বৃদ্ধ, ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ, নর ও নারী সকলেরই আদরের বস্তু। ইহা বুঝিয়াই গুরুদেবের অনুমত্যানুসারে এবং উৎসাহদাতা বন্ধুগণের ইচ্ছানুসারে উপাসনাতত্ত্ব সংক্ষেপে অথচ সকলের বোধ্য হয় এমন কৌশলে যথামতি লিখিলাম। এই উপাসনাতত্ত্বমালা ভারত সন্তানের হৃদয়ে বিরাজ করুক, আমি দেখিয়া চিরসুখী হই, এই মাত্র আশা।

ভক্তানুদাস
শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র।
(ভক্তিতীর্থ।)

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

অথ উপাসনা তত্ত্ব।

মঙ্গলাচরণ।

গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুম তলাশ্রিতং।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজ মধ্যগং॥
কালিন্দী জলকল্লোলসঙ্গী মারুতসেবিতং।
চিন্তয়ং শ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবামি সংসৃতে॥

আত্মানং গোপায়তীতি গোপঃ জীবঃ। তস্যাবরণশক্তিঃ গোপী মায়া। গাবঃ মন্ত্রাশ্চ তৈঃ আবীতং স্বামীতা আশ্রিতং। সুরদ্রুমঃ বেদঃ। তস্য তলং মূলং বা স্বরূপং। আশ্রিতং তৎপ্রতিপাদ্যং। দিব্যালঙ্করণৈঃ ষড়বিধৈশ্বর্য্যৈঃ উপেতং, তথা রত্নতুল্যং অতি বিশুদ্ধং। পঙ্কজং হৃদযকমলং। মধ্যগং তদন্তস্থাকাশগতঃ তং। কালিন্দী নাম নির্ম্মলোপাসনা, তস্যাঃ জলকল্লোলাঃ প্রেমভক্তি স্ফুরণ তরঙ্গাঃ তৎসঙ্গী মারুতঃ নিশ্চল প্রাণবায়ুশ্চ তাভ্যাং সেবিতং আরাধিতং; ভক্তানুগ্রহার্থং প্রকট-চিন্ময় বপুধারিণং কৃষ্ণং চিন্তয়ং সন্ সংসৃতে মুক্তো ভবামাত্যর্থঃ।

অস্যার্থঃ—যিনি জীব, মায়া ও শ্রুতি মন্ত্রগুলি দ্বারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহাদের আশ্রিত হইয়াছেন। যিনি উপাসকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে ষড়ৈশ্বর্য্যমণ্ডিত হইয়া ভক্তের বিশুদ্ধ হৃদয় কমলস্থ চিদাকাশে সমুদিত হয়েন। প্রেমভক্তিপূর্ণ নির্ম্মল উপাসনা দ্বারা সমাহিত বা নিশ্চল প্রাণ বায়ু সম্পন্ন সিদ্ধচিত্তের দ্বারা যিনি সদা আরাধিত হয়েন। এই চিন্ময় বপুধারী শ্রীকৃষ্ণ প্রকট লীলাতেও যে অনুরূপ ব্রজবিহারী মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিয়া জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, তাপসংকুল সংসার হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি।

গুরুর্মাতা পিতা স্বামী বান্ধবং সুহৃদঃ শিবঃ।
ইত্যাধায মনো নিত্যং ভজ সর্ব্বাত্মনা গুরুং ॥ ১
শ্রীগুরুং বৈষ্ণবং বন্দে শাক্তং শক্তিসুরসিকং।
যেষাং কৃপা কটাক্ষেন মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥ ২।

অস্যার্থ—গুরুই সুকৃতি প্রদাত্রী জননী, গুরুই সৌভাগ্য প্রদাতা পিতা, গুরুই পরকাল ও ইহকালের অধ্যক্ষ, গুরুই বিপদ ও সম্পদের বন্ধু, গুরুই মুক্তিমন্ত্রণাদাতা সুহৃদ্, গুরুই কল্যাণপ্রদাতা শিব হইতেছেন। রে মন, তুমি প্রাণপণে একনিষ্ঠ হইয়া শ্রীগুরুকে এইরূপ সর্ব্বগুণময় ভাবিয়া সদা ভজনা কর। ১

যাঁহাদের কৃপাকটাক্ষপাতে মূর্খ ব্যক্তি অর্থাৎ পরমার্থ তত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞান ব্যক্তি পরমার্থ জ্ঞান লাভ করে, এবম্বিধ শ্রীগুরু এবং সর্ব্ব ব্যাপী বিষ্ণু তত্ত্বরসিক বৈষ্ণব, শক্তিতত্ত্বরসিক শাক্ত মহাজনগণের বন্দনা আমি (গ্রন্থারম্ভে বিঘ্ন বিনাশার্থে) করিতেছি।

উপাসনা কাহাকে বলে?

যে কথা লইয়া সংসার উন্মত্ত রহিয়াছে, যাহার উপকারিতা স্থির করিতে সাধু সংসার ত্যাগী হইয়া, কোলাহল বর্জ্জিত গিরিকন্দর আশ্রয় করিয়াছেন। যাহার অমৃত তেজে অমর হইবার জন্য যোগীগণ বাহ্য জগতের ফল, ফুল, জল, অনল, অনিল, রবি, শশী, গ্রহ, মায়া, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, ভোগ, তাপ সকল ভুলিয়া, বাহ্যচৈতন্য হারাইয়া, সচল হইয়াও অচল ও সমাহিত হইয়া প্রেমমধু পান করিতেছেন। উপাসনার প্রকৃত অর্থ কি, ইহা পূর্ব্বে স্থির না করিয়াও যাহার নাম মাত্র শুনিয়া সমগ্র সংসারী সংসারতাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, দিগ্‌দিগন্তে ছুটিতেছে। যাহা অবলম্বন করিলে মনুষ্য মূর্ত্তিমান্ জন্তু মনুষ্য হয়। যাহা ত্যাগ করিলে মনুষ্যমূর্ত্তি পশুত্ব লাভ করে। যাহা চন্দ্রে নাই, সূর্য্যে নাই। অনলে অনিলে সলিলে নাই। ফলে ফুলে লতায় পাতায় নাই!! মৃগ সরীসৃপে নাই, যাহা ভূমিতে বা স্বর্গে নাই। যাহা

অবলম্বন করিলে বৈকুণ্ঠ লাভ হয়,যাহা ত্যাগ করিয়া জীবিত কাল দুঃখ, শোক, জরা, মৃত্যু ও জন্মজনিত কষ্টে দিবানিশি ব্যথিত হইয়া অন্তে ঘোর নরক লাভ হয়। সেই অপূর্ব্বা, অলৌকিকী, মহাদৈবী শক্তির নামই উপাসনা হইতেছে। উপাসনায় করে কি? উপাসনা মর্ত্ত্য জীবকে অমর শিব করে, ত্রিতাপের জ্বালায় ব্যথিত প্রাণকে শান্তি সিঞ্চনে শীতল করে। জরা ব্যাধি জন্ম মৃত্যুকে দূরীভূত করে; জননী নিজের হৃদয়ের শোণিতকে যেমন পীযূষরূপে সন্তানের বদনে দিয়া তাহাকে পুষ্ট করে; তদ্রূপ উপাসনা অজ্ঞানী অথচ ভক্তিপ্রপন্ন মানবকে নিজ কৃপাপীযূষ শক্তিতেজে জ্ঞান ও প্রেমে পুষ্ট করিয়া থাকে। মানব জন্ম লাভ করিলেই উপাসনার ক্রোড়ে জীবকে নিজ জীবন, মন, বুদ্ধি সমস্ত অর্পণ করিতে হয়। উপাসনাদেবী জননী রূপে প্রপন্ন জীবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জীবনকে দীর্ঘায়ুষ্মান্ করে; দেহত্যাগে বাহ্য সংকল্প হইতে অতীত করিয়া ভগবৎস্বরূপে পরিণত করে। বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ করিয়া আত্মতত্ত্ব বিষয়ে নিযুক্ত করে।

সংসারে মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া সকলেই আত্মকল্যাণ ইচ্ছা করে; সেই সুখ কেহ চাহে ভোগ সহযোগে, কেহ চাহে ভোগাতীত মুক্তিতে। ভুক্তি বা মুক্তি যাহা কিছুই জীব অবলম্বন করুক না কেন? সুখ এবং শান্তি সকলেরই অভীপ্সিত হইতেছে। যদি সুখ ও শান্তি সকলেরই প্রয়োজনীয় হইল, তখন সুখ কাহাকে বলে বুঝা উচিত হয়। যে তৃপ্তি আয়ুতে না বাধা পায়; জরাতে, ব্যাধিতে না ক্ষয় হয়; বিপদে সম্পদে না লোপ পায়; দুঃখ, দারিদ্র্য, কাম,ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক ও তাপ প্রভৃতিতে না বিনষ্ট হয়। সেই তৃপ্তিকেই শাস্ত্রকর্ত্তাগণ সুখ কহিয়াছেন। অর্থাৎ অদৃষ্ট চক্রানুসারে সংসারের অধিকৃত ও প্রাপ্য বিষয়ভোগ জনিত তৃপ্তি কোন প্রকার দৈব বা দৈহ্য কৌশল দ্বারা বাধা যদি না পায়, তাহা হইলেই সুখ ভোগ হইল। ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে।

এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই,

তন্মধ্যে জীবমাত্রেই সুখানুসারী। স্থাবর ও জঙ্গমের মধ্যে জঙ্গমেরাই অনুভব করিতে সক্ষম। সকলের অনুভূতিই সুখের জন্য লালায়িত। স্থাবরের মধ্যে এমন কি বৃক্ষলতাদি জীবশ্রেণীও সুখের জন্য লালায়িত। সকল তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন। যে জীব যেরূপ অদৃষ্ট ও বাসনানুসারে আপনাপন সংসারভোগ্য স্বভাব হইয়াছে; সেই স্বভাবপ্রকৃতির স্ফুরণ জনিত তৃপ্তিই সুখের পরিচায়ক হইতেছে। আপনাপন প্রকৃতির বা স্বভাবের স্ফুর্ত্তি না হইলেই দুঃখ এবং স্ফূর্ত্তি হইলেই সুখ।

জলচর চায় জল; জলে তাহাদের প্রকৃতির স্ফূর্ত্তি, অতএব জল ভোগই তাহাদের সুখ ও জীবনের কল্যানপ্রদ হইতেছে। স্থল তাহাদের দুঃখের কারণ এবং জীবনের হানিকর হইতেছে। এমন কি স্বাদু জলে যাহাদের স্ফূর্ত্তি লবনাক্ত জল তাহাদের সুখকর নহে, লবনাক্ত অসীম জল যাহাদের সুখকর; স্বাদু পুষ্করিণী, সরোবর, নদী, তাহাদের সুখকর নহে। যে জীব, কীট, লতা ও বৃক্ষাদি হিমানীতে জন্মায়, মরুভূমি তাহাদের অসুখের। আর মরুভূমির বস্তু বা জীব হিমানীতে দুঃখ পায়। তত্ত্ববিদ্পণ্ডিতগণ আরো কহিয়াছেন, সকল জীবই আহার, নিদ্রা, বাসস্থান আপন প্রকৃতির তৃপ্তি অনুসারে করিয়া থাকে। সিংহ ঘোরারণ্যে থাকিয়া দুই চারি দিবসান্তে হিংসা করিয়া পশু ভক্ষণ করে। তাহাকে যদি নগরে স্বর্ণপিঞ্জরে রাখিয়া অনায়াসলভ্য প্রচুর মাংস দেওয়া হয়, সে কখনই তাহাতে তৃপ্ত হইবে না। সে পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া নগর ও অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া যেখানে অরণ্য সেই স্থানে গমন করিয়া কষ্টলব্ধ পশু সংহার করিয়া সুখী হইবে। সর্প বিবরে থাকে, বাহিরে পরিষ্কার স্থানে আসিলে সে সদা সর্ব্বদা বিবর অন্বেষণ করিবে। লতা একটী ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া যখন প্রথম শাখা বিস্তার করে; সহকারই তাহার অবলম্বনীয় প্রকৃতি, এই জন্য আপনার চতুর্দ্দিকস্থ বস্তুর মধ্যে যে দিকে সহকার পায় সেই দিকে শাখা বিস্তার করিয়া থাকে। এই

নিয়মে জগৎ পর্য্যালোচনা ও জীবের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখিলে বৃক্ষ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলকেই আমরা সুখের অনুসারী বুঝিয়া থাকি। নিজ নিজ প্রকৃতির স্ফূর্ত্তিই হইল সুখ। এই অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে আলোচনা করিয়া স্থির হইল এই যে, আপনাপন প্রকৃতির স্ফূর্ত্তিই হইল সুখ এবং তদ্বিপরীত ভোগই হইল দুঃখ।

প্রবৃত্তি পরিপূর্ণ সংসার মধ্যে সকলেই ভোগের জন্য লালায়িত এবং সেই ভোগ যাহাতে নিজ নিজ প্রকৃতিব স্ফূর্ত্তিকারক বা সুখের আবিষ্কারক হয় ইহার জন্য সচেষ্টিত রহিয়াছে। সুখের জন্য লতা পাগল, বৃক্ষ পাগল, কীট পাগল, পতঙ্গ পাগল, মৃগ ও সরীসৃপ পাগল, জীব চবাচর সকলেই পাগল। সকলে কেবল পাগল নহে, প্রাণপণে আপন সুখের জন্যই লালায়িত হইয়া আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও মৈথুন এই পঞ্চস্বভাব চরিতার্থ করিতে সদা, ব্যস্ত হইয়া আছে।

প্রবৃত্তিপূর্ণ জীবেব মধ্যে মনুষ্য সকলের শ্রেষ্ঠ। সকলেব ন্যায় প্রবৃত্তি মার্গে মানবও সুখের জন্য পাগল হইয়া আছে। স্নেহ, মায়া, মমতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, হিংসা, শত্রুতা, কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ ইত্যাদি সমস্তই মানবে আপনাপন সুখ উৎপাদনের জন্য আশ্রয় ও ব্যবহার করিয়া থাকে। মনুষ্যমধ্যে শিশু চাহে কিশোর কাল। কিশোব চাহে যৌবন কাল। যুবক ভাবে চিবদিনই যৌবন থাকুক। আমি কামিনীকাঞ্চন বেষ্টিত সংসারসুখ উপভোগ করি। মনুষ্য চাহে সৌভাগ্য, দরিদ্রতা চাহে না। মনুষ্য চাহে শান্তি, অশান্তি চাহে না। মনুষ্য চাহে আয়ু, মৃত্যু চাহে না। মনুষ্য চাহে জ্ঞান, অজ্ঞান চাহে না। মনুষ্য চাহে সুবুদ্ধি, দুর্ব্বুদ্ধি চাহে না। মনুষ্য চাহে বলবীর্য্য, জরা চাহে না। মনুষ্য চাহে অশোক; অভয়, শোক তাপ চাহে না। মনুষ্য চাহে বুদ্ধি, জ্ঞান, দৃষ্টি, শান্তি, পুষ্টি; শক্তিহীন হইতে চাহে না। বালক বৃদ্ধ যুবক যাহার কাছে যাই এই পূর্ব্বোক্ত ভোগস্পৃহা ভিন্ন ঐ সকল অবস্থাহীন হইতে কাহাকেও ইচ্ছুক দেখি না।

ধনী হউক, দরিদ্র হউক, জ্ঞানী হউক, মূর্খ হউক; উচ্চ হউন বা নীচ হউন, ধার্ম্মিক হউন, বা অধার্ম্মিক হউন, সুখী থাকিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। অথচ পূর্ব্বপ্রমাণে দেখান হইল আপমাপন প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ বা স্ফূর্ত্তিই সুখের প্রকাশক হইতেছে। বালক, বৃদ্ধ, যুবক, জড়, মূক, অন্ধ, বধির, ধনী, দরিদ্র কেহই রোগ, জরা, শোক ও তাপগ্রস্থ হইতে চাহে না; কেহ মরিতে বা দুঃখী হইতে চাহে না। কেহ অজ্ঞান বা মূর্খ থাকিতে চাহে না। অতএব মৃত্যুর অতীত, দুঃখের অতীত; জরা, রোগ, শোক ও তাপের অতীত; অজ্ঞান ও মূর্খতার অতীত এমন একটি অবস্থা আছে, যাহা লাভ করিবার জন্য প্রাণের আশা সতত ধাবিত হইতেছে।

যদি কেহ সন্দেহ করেন, যে সকল অবস্থা পাইয়াছি, ইহাই চরম অবস্থা, ইহার অতীত বা ভবিষ্যৎ আর কোন অবস্থার স্বীকার কেমন করিয়া করা যায়! সেই সকল সন্দেহকারীগণের সংশয় দূরীকরণার্থ যদিও বহু প্রমাণ মীমাংসা শাস্ত্রে আছে; যোগ শাস্ত্রে আছে, তন্মধ্যে একটি সংশয়চ্ছেদী যুক্তি দেখান হইতেছে। প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ কহেন, যে জন্মযুক্ত যে দেহের যে স্বভাব প্রকৃতি তাহা হ্রাস বা পূর্ণ ভাবে চিরদিনই সেই সেই জন্ম ও দেহযুক্ত জীবের ভোগ হয়। যেমন উদ্ভিদ্ আকাশে অঙ্কুরিত হয় না, মৃত্তিকাভেদই তাহাদের স্বভাব। যেমন লতা সহকারের অনুসারে শাখার সঞ্চালন করে। যেমন পাখী ডিম্ব হইতে বিকাশ হইতে না হইতে জনক জননীর মুখের আধার খায় এবং সম্মুখে সমাগত মক্ষিকা পতঙ্গাদিকে স্বতেজে ধরিয়া ভক্ষণ করে। বানর অর্দ্ধ প্রসূত হইয়াই বৃক্ষশাখা ধারণ করে। হংসাদি শিশুকাল হইতেই সন্তরণ দেয়। বৎস জন্মিবার পরক্ষণেই মাতৃস্তন আপনি অনুসন্ধান করিয়া পান করে। যেমন শিশু সদ্য জন্মাইবার পরক্ষণেই মাতৃস্তন মুখে পাইলেই চুষিয়া খাইতে চাহে। এইরূপ সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ এবং মৈথুন এই পাঁচটি স্বভাব আপনাপন দেহ ও গঠনানুসারে পূর্ব্ব সংস্কার মতে লাভ হইয়া থাকে।

যদি জন্মাইবার পূর্ব্বে সূক্ষ্ম সংস্কার অন্তরে না থাকিত কখনই জন্মাইবার পরক্ষণে তাহা বিকাশ হইতে পারিত না। অতএব জগতের সকল সৃষ্ট প্রাণী যেমন পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে সংসারে আপনাপন বৃত্তির বিকাশ করিতে পারিলে সুখী বিবেচনা করে, আর যে অবস্থায় বা স্থানে বৃত্তিগুলির বিশেষ বিকাশ না হয় তাহাকেই দুঃখ বিবেচনা করিয়া ত্যাগ করিতে চেষ্টা করে। এই সুখের অন্বেষণ এবং দুঃখ হানিকারণ নিজ নিজ পূর্ব্বসংস্কার অনুসারে জীবে করিয়া থাকে।

এই প্রমাণ দ্বারা স্থির হইল যে—আমরা মনুষ্য হইয়া যখন মৃত্যু ইচ্ছা করি না, দুঃখ, অজ্ঞান, শোক, তাপ, ব্যাধি, জরা, প্রভৃতি কোন প্রকার ব্যাঘাৎ ইচ্ছা করি না। দুর্ব্বল, দরিদ্র ও মুর্খ থাকিতে ইচ্ছা করি না। আমাদের অন্তরে এমন একটি পূর্ব্বসংস্কার আছে যাহা কেবল মাত্র ঐ সকল অবস্থার অতীত এমন একটি অবস্থার দিকে প্রাণ মনকে অন্তরে অন্তরে ধাবিত করে, যাহার নাম সুখ ও শান্তি হইতেছে।

এই সুখ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমটিকে প্রবৃত্তি সম্ভোগ জন্য সুখ কহে। অর্থাৎ আহার নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও মৈথুন এই পঞ্চ স্বভাবের নির্ব্বাধে চরিতার্থতা হইলে এই সুখের বিকাশ হয়। পশু কীট পতঙ্গ হইতে প্রবৃত্তি স্বভাবাক্রান্ত মানব পর্য্যন্ত এই সুখের প্রয়াশী হইতেছে। দ্বিতীয়টিকে নিবৃত্তি সংস্কারলব্ধ সুখ কহে, ইহারই অবস্থা-ভেদে নামান্তর শান্তি ও আনন্দ হইতেছে। দেহতত্ত্ব ব্যাখ্যা কালে মানবের বৃত্তির পরিচয় এবং পশু হইতে মানব জীবনী ভাবের ভেদ কি, কোন সুখের জন্য মনুষ্য লালায়িত ইহা যথাসাধ্য প্রমাণ করা হইবে।

অন্যান্য জীব আপনাপন সংস্কারানুসারী ভোগ দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ প্রবৃত্তি সুখ ভোগ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্য সুখের পূর্ণ উপভোগ ভিন্ন সুখী বিবেচনা করে না। অন্যান্য পশু প্রভৃতি যতদুর সাধ্যমত সুখভোগ করিল বটে, কিন্তু কোন কোন দুঃখ হানি করিবার ক্ষমতা একেবারেই তাহাদের নাই। অর্থাৎ মৃত্যু কষ্ট কেহই ইচ্ছা করে

না, কিন্তু উহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উপায়ও তাহাদের নাই। এতদ্ব্যতীত অতিমাত্র সুখপ্রকাশক পূর্ব্ব সংস্কার পশুর নাই। কারণ জ্ঞান, অহংবোধ, স্মৃতি, বিবেক প্রভৃতি বৃত্তিগুলি পশুদেহে প্রায় প্রকাশ হয় না; কোন কোন পশুর যদিও কিছু স্মৃতি দেখা যায়—তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র।

এখন আমরা বুঝিলাম যে;—পশু হইতে মানবের প্রকৃতি যখন বহু বহু নূতন বৃত্তিতে অলংকৃত এবং দুঃখের একান্ত অনভিলাষী; তখন ইহাদের সেই অভাব মোচন করিয়া প্রকৃত সুখের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য; পশুর অতীত যে সকল অভিনব বৃত্তিতে মানব সুখী হইবে তাহার আবির্ভাব করিবার কৌশল চিরকাল পূর্ণমনুষ্যেরা উপভোগ করিয়া গিয়াছেন ও থাকেন। যেমন রোগী কোন ঔষধে আপনার রোগ শান্ত করিলে অপর রোগীকে সেই ঔষধ সেবনের পরামর্শ দেয়। গমনের ও আহারের সুখ দেখিয়া যেমন পিতামাতা আত্মীয় সকলে শিশুকে হাত ধরিয়া ভ্রমণ করায় ও নানাবিধ রসজনিত খাদ্য আস্বাদন করায়। সেইরূপ পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে যে সকল মনুষ্য আপনাপন জীবনকে দুঃখ হইতে একান্ত উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন; অজ্ঞান, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু হইতে আপনাকে স্বাধীন করিতে পারিয়াছেন। যে সকল বৃত্তি সুখের অবরোধক, তাহাকে নষ্ট করিয়া অতিমাত্র সুখের উপভোগ করিযাছেন। সেই স্বতঃসিদ্ধ একান্ত সুখভোগ কৌশলের নাম উপাসনা হইতেছে।

যেমন বুদ্ধির ব্যবহার করিতে করিতে বুদ্ধিমান হয়, ভাষা শিক্ষা করিতে করিতে ভাষাতত্ত্বজ্ঞ হয়; বহু রস আস্বাদন করিতে করিতে রসতত্ত্ববিৎ হওয়া যায়, যেমন বলীর সংস্পর্শনে দুর্ব্বল বল লাভ করে। অর্থাৎ যাহার যে শক্তির অল্প স্ফূর্ত্তি থাকে, সেই বৃত্তির বহু স্ফুর্ত্তিমান্ অবস্থার সহিত তাহার মিলন ও অনুশীলন ঘটিলে পূর্ব্বব্যক্তি অধিক বৃত্তিপূর্ণ হইয়া থাকে। এই স্বাভাবিক নিয়মের অনুকরণেই পূর্ণ-সুখভোগকারী আর্য্যঋষিগণ আপনাপন পূর্ণসুখভোগের উপায়গুলি

অসম্পন্ন মানবগণের জন্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। সেই সকল সুখোদ্রেকারী সাধনকৌশলের নামই উপাসনা। বিশেষ অর্থ এই :—যে সুখান্বেষণকারী পূর্ব্বসংস্কার আমাদের অন্তরে আছে, পশু-সংস্কার বা অনভ্যাসের জন্য সেই অবস্থা আমাদের উপভোগ হয় না। যাহাতে পশুভাব ক্ষয় করিয়া অভ্যাসের আধিক্য বলে সেই সুখসংস্কারগুলি আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়, ইহার উপায় বিধানকে উপাসনা কহে। এখন সকলে বুঝিয়া দেখুন, এই অতি সুখের অবস্থাটি জগতের মধ্যে কি ঘোর সংসারী, জ্ঞানী, অজ্ঞানী ও মুমুক্ষু সকলের আবশ্যকীয় কি না? উপাসনা শব্দের বুৎপত্তি এই;—আস্ ধাতুর অর্থ উপবেসন করা। উপ+আস্+অন+আ=উপাসনা। আপন অভাব মোচন করিবার জন্য অভাব মোচনে সক্ষম কোন অবস্থার সমীপস্থ হওনকে উপাসনা কহে। বেদান্ত কহিতেছেন :—

উপাসনানি সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানস ব্যাপাররূপানি শাণ্ডিল্যবিদ্যাদীনি। এতেষাং নিত্যাদিনাং বুদ্ধিশুদ্ধিঃ পরং প্রয়োজনং, উপাসনান্ত চিত্তৈকাগ্র্যং।

অর্থঃ—উপাসনা কাহাকে বলে? শাণ্ডিল্য গোভিল প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রকার মহর্ষিগণ মানবের মানসিক বৃত্তিগুলিকে সগুণ অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী ঐশ্বর্য্যময় মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মবস্তুতে পরিণত করিতে যে কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাকে উপাসনা কহে। নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, নিষিদ্ধ, ব্রত প্রভৃতির অনুষ্ঠানে বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু চিত্তকে একাগ্র করিতে উপাসনাই প্রধান আশ্রয়স্থল হইতেছে।

পূর্ব্বে যে সকল কথা বলা হইয়াছে; এবং সগুণ ব্রহ্মবস্তুতে কি আছে, ইহা বিশেষ আলোচনা করিলেই উপাসনাতত্ত্ব সহজে বোধ হইবে সন্দেহ নাই। দ্রব্য, ক্রিয়া, কাল, কর্ম্ম,স্বভাব ও গুণ সংযুক্তা মায়া নাম্নি মহাশক্তিতে অনুরঞ্জিত, বিশ্বচৈতন্যে চৈতন্যস্বরূপে অবস্থিত ঈশ্বরকে সগুণব্রহ্ম কহে। অবস্থা, ভাব ও ক্রিয়াভেদে আর তিনটী উপাধি এই সগুণব্রহ্মের হইয়া থাকে। সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের যে

অবস্থাটী জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বল, বীর্য্য, শক্তি ও তেজ নামক ছয় ভাব প্রকাশক তাহাকে ভগবান বলে। কেবল মাত্র কার্য্যের সাক্ষী হইয়া দ্রব্যাদি ছয় সদ্ভাব চেতয়িতা থাকিলে আত্মা বলে। যে অবস্থায় মায়া ক্রিয়া করে না, অথচ সুপ্তা নহে, চৈতন্য চেতয়িতা নহেন, অথচ বিশুদ্ধ, এইরূপ শক্তিচৈতন্য মিশ্রিত বিশ্বব্যাপী অথচ বিশ্বাতীত অবস্থাকে ব্রহ্মের পরমাত্মাবস্থা কহে। সাংখ্য ও বেদান্তশাস্ত্রে এই সকল অবস্থার বিশেষ মীমাংসা আছে। আমাদের উপাসনার প্রয়োজনীয়তা দেখাইতে যতটুকু বুঝা উচিত তাহা বলা হইতেছে। এই যে সগুণ ব্রহ্মের আত্মা, পরমাত্মা ও ভগবান নামক অবস্থাত্রয়, ইহারাই উপাসকের প্রধান অবলম্বনীয়। ভগবান নামক অবস্থাটি কি প্রবৃত্তি কি নিবৃত্তি উভয় প্রকৃতিসম্পন্ন মানবেরই অবলম্বনীয় হইতেছে। আত্মা ও পরমাত্মা কেবল নিবৃত্তিস্বভাবসম্পন্ন মানবেরই আবশ্যক হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় অবস্থায় মানবেই সুখের জন্য লালায়িত হইতেছে। প্রবৃত্তিগত প্রকৃতিগুলি অবাধে উপভুক্ত হইলে যে তৃপ্তির উদয় হয়, তাহাকে প্রবৃত্তিগত সুখ কহে। সেই সুখের আধিক্য ভোগ করিতে করিতে যখন অতি তৃপ্ত হওয়া যায়, আর ভোগস্পৃহা থাকে না, তাহাকে নিবৃত্তিজনিত আনন্দ কহে।

আমরা প্রবৃত্তিতে সুখী হইবার জন্য মৃত্যু চাহিনা, রোগ, শোক চাহি না, যে কোন অবস্থায় আমাদের সুখের ব্যাঘাত হয় তাহা আমরা চাহি না। কি অবলম্বন করিলে আমাদের ঐরূপ অবস্থার আবির্ভাব হইবে, তাহার জন্য তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে অবস্থা জন্মায় সেই অবস্থাই ক্ষয়, বৃদ্ধি, পরিণতি ও মৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে। এই ক্ষয়, বৃদ্ধি, পরিণতি ও মৃত্যুই ঘটনানুসারে আমাদের দুঃখ প্রদান করে। এই কয়টি অবস্থা হইতে অতীত থাকিতে পারিলেই চরমসুখ হইল, আর কিছু কিছু স্বাধীন হইতে পারিলেও তারতম্যানুসারে সুখভোগ হইয়া থাকে। অনেকের সন্দেহ হইতে পারে এই কয়টী অবস্থার অতীত

কোন

নৈয়ায়িকগণে এই বিষয়ে এইরূপ প্রমাণ প্রদান করেন। যেমন একটি শ্বেত কাগজের উপর ভিন্ন বর্ণ ফেলিলেই দেখা যায়, যেমন কষ্ট অনুভূত হইলে কষ্টশূন্য একটী অবস্থার স্মৃতি থাকা চাই :—সেইরূপ ক্ষয়, বৃদ্ধি, পরিণতি, মৃত্যু ও জন্মাদি যখন আমাদের অনুভূত হইতেছে তখন মায়াতীত, বৃদ্ধিশূন্য, পরিণতি বিহীন, অমৃত ও জন্মাদিহীন একটি নিত্য অবস্থার অনুভূতি অতি সূক্ষ্মরূপে আমাদের মানব জন্মের সংস্কার বলে বোধ হইতেছে। যখন আমরা পশুভাবে একেবারে উন্মত্ত হই তখনি ঐ নিত্য অবস্থার অনুভূতি একেবারে বিস্মৃত হইয়া থাকি, আর যখন আমরা কিছু কিছু জ্ঞানাদির আলোচনা করি তখনি নিত্যবস্তুর সামান্য স্মৃতি আমাদের অন্তরে অনুভূত হইয়া থাকে। এই যে নিত্য ও সূক্ষ্ম অবস্থা, ইহা অনুভব করিতে ; মানসাদি বৃত্তিগুলিতে সেই নিত্য বিষয়ে পরিণত করিতে পারিলে মানব সকল দুঃখাতীত হইয়া থাকে। কায়িক, বাচিক, মানসিক এই ত্রিবিধ অবস্থায় সেই নিত্য ভাবময় থাকিবার জন্যই পূর্ণ মনুষ্য মহর্ষিগণ এই উপাসনাতত্ত্ব সংসারে প্রচার করিয়াছেন। অতএব মানবজীবন ধারণ করিয়া যখন নিত্য অবস্থাময় হইবার উপায় আছে। নিত্য হইতে পারিলেই যখন অবাধে সুখ অনুভব হইতে পারে। তখন এই নিত্যাবস্থা লাভ করিতে মনুষ্য মাত্রেরই পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে। উপাসনা শব্দের অর্থ যখন দুঃখাবস্থা ত্যাগ করিতে পরিপূর্ণ সুখের সমীপস্থ হওয়া। একমাত্র নিত্যাবস্থাই যখন সকল সুখের মূল হইতেছে ; তখন ক্ষয়, বৃদ্ধি, পরিণতি, মৃত্যু ও জন্মাদি জন্য দুঃখ হানি করিতে একমাত্র নিত্যসুখাবস্থার সমীপস্থ হওয়াই যুক্তি ও অভ্যাসসিদ্ধ ; কারণ ক্ষুধিত ব্যক্তি ক্ষুধা নিবারণ করিতে আহারের আশ্রয় গ্রহণ করে, শীতার্ত্ত ব্যক্তি উত্তাপের, ভীত ব্যক্তি অভয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। সেইরূপ আমাদের দুঃখের হানি করিতে নিত্য ও একান্ত সুখপূর্ণ অবস্থার সমীপস্থ হওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে। এই জন্য কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মূর্খ, কি বিদ্বান্, কি ধার্ম্মিক, কি

অধার্ম্মিক, উপাসনা অবলম্বনে সকলেরই মানবজন্মের প্রকৃত সুখের উদয় হইয়া থাকে। অতএব উপাসনা দেবী সকলেরই আরাধনীয়া হইতেছেন। বর্ত্তমান ধর্ম্মবিপ্লবে উপাসনাতত্ত্ব বিশেষরূপে সকলের ফলদায়ী হইবে। উপাসনা অবলম্বনে দুঃখ, শোক, তাপ, দৌর্ব্বল্য, ব্যাধি প্রভৃতি হইতে শান্তি লাভ হইবে। দুঃখের সংসার সুখের রমণীয় স্থান হইবে। আমাদের ন্যায় মুমূর্ষু আর্য্যজাতি পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া সংসারে আত্মমর্য্যাদা স্থাপনে সক্ষম হইবে। অজ্ঞান ও পশুবৃত্তি হীন হইয়া আমাদের হৃদয় আনন্দরসে উন্মত্ত হইয়া উঠিবে। অতএব উপাসনা সকলেরই প্রয়োজনীয় এবং আরাধ্যা দেবী হইতেছেন। এই উপাসনা বুঝিতে হইলে তিনটী বিষয় প্রধানতঃ বোধ হওয়া উচিত হইতেছে। উপাসক কেমনে হওয়া যায়? উপাস্য বস্তু কিসে নির্দ্ধারিত হয়? উপাসনা কি কৌশলে লাভ হয়? এই তিনটী প্রশ্নের উত্তর যথাসাধ্য স্থির হইলে এবং বুঝিলে উপাসনার প্রয়োজন স্থির হইবে। এক্ষণে ক্রমে ক্রমে সেই সকল তত্ত্বের আলোচনাই আরব্ধ হইল।

অথ মানবদেহ তত্ত্ব।

পূর্ব্ব প্রস্তাবের উপসংহারে বলা হইয়াছে, উপাসক, উপাস্য ও উপাসনা এই তিন অবস্থা বোধ হইলেই আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য যে এক মাত্র উপাসনা তাহা বোধ হইবে। প্রথমে উপাসক অবস্থাটি বোধ করা উচিত হইতেছে। অভাব পূরণ করিবার ক্ষমতা যাহার আছে, এবম্বিধ অবস্থায় আশ্রয় লইয়া অভাব পূরণ করাই উপাসনা; একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আমরা এই যে দেহ ও মন পাইয়াছি ইহাকে তত্ত্ববিদ্যার দ্বারা আলোচনা করিলে আমরা যদি ইহা বুঝিতে পারি যে;—আমাদের দৈহিক সমস্ত বৃত্তিই স্ফূর্ত্তির জন্য পরমুখাপেক্ষী অর্থাৎ

অপরের অধীন; শিক্ষা বা অভ্যাস সহযোগে আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, তাহা হইলে আজন্মই আমরা পরমুখাপেক্ষী বা উপাসক ইহা স্থির হইবে।

এই পরমুখাপেক্ষীত্ব স্থির করিতে আমাদের তিনটি বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান হওয়া আবশ্যক হইয়া থাকে। জন্মান্তর কি? কর্ম্মফল কি? স্থূল ও সূক্ষ্মভাবাত্মক দেহ কি? যদিও জন্মান্তর ও কর্ম্মবাদ অতিশয় দুর্ব্বোধ্য এবং বহু শাস্ত্র, প্রমাণ ও যুক্তির অধীন। আমি ততদূর বিশদ ভাব ইহাতে প্রকাশ করিব না; কেবল উপলব্ধির চেষ্টা মাত্র করিব। জন্মান্তর কাহাকে বলে প্রথমে বুঝিয়া শেষ কর্ম্মতত্ত্ব বুঝিলে দেহাবস্থাটি সুন্দররূপ অনুভব করা যায়, এই জন্য প্রথমে জন্মান্তর কথাই বলিতেছি।

সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষা গীতা অতি সহজে জন্মান্তর বুঝাইয়াছেন, সেই গীতোক্ত ভগবদ্বাক্যই প্রথমে অবলম্বন করা যাউক।

"দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি র্ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি। ২য়।১৩। গী
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোহস্তস্তনয়ো তত্ত্বদর্শিভিঃ। ২য়।১৬। গী"

অস্যার্থঃ—এই বর্ত্তমান দেহে যেমন প্রথমে শিশুকাল তদতীতে যৌবন কাল তদতীতে জরা দেখা যায়, এক দেহের উপরেই সাক্ষাতে এত পরিবর্ত্তন যখন প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন অপরিবর্ত্তনীয় একটি নিত্যসত্ত্বা দেহান্তরে বর্ত্তমান আছেন। সেই নিয়মে মৃত্যুর পরে যে দেহান্তর হয় তাহাও পরিবর্ত্তন মাত্র; আত্মার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। তত্ত্বদর্শী সাধুগণ অপরিবর্ত্তনীয় আত্মার উপরে—এই সকল পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া জন্ম বা মৃত্যুতে সুখ বা দুঃখ বিবেচনা করেন না। ১৩।

যদি বলেন যে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন কি? দেহ সৎ বিবেচনা করিলে দোষ কি? তদুত্তরে ১৬ শ্লোকে গীতা দেখাই-

লেন। যে বস্তু নিত্য পবিবর্ত্তনশীল তাহার অস্তিত্ব কোথায়? কোন একটি অবস্থার অবলম্বন থাকিলে তবে পরিবর্ত্তন বোধ হয়। যেমন সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলনে জলকুংকাে ব বহুবর্ণ দেখা যায। বাস্তবিক সেই কিবণেরই অবলম্বনে জলফুংকাব বহুবর্ণ ধাবণ কবিল, বর্ণটি দেখিতে সত্য বটে, কিন্তু বাস্তবিক দৃষ্টিভ্রান্তি মাত্র। তদ্রূপ এই ভূতাত্মক দেহে যথন দিবানিশি পবিবর্ত্তন ঘটিতেছে, এবং পবিবর্ত্তন ঘটিতেছে বলিয়া ঐ অবস্থাটি আমাদেব সত্য বলিয়া অনুভূত হইতেছে। কিন্তু যাহা অবলম্বনে পবিবর্ত্তন দেখা যায় তাহাই সত্য এবং পবিবর্ত্তনাত্মক অবস্থাটি মিথ্যা হইতেছে। এখন এই দেহতত্ত্ব প্রমাণ কবিলে দেখা যায যে ভূত প্রপঞ্চ এবং সূক্ষ্মশক্তি সমূহ বহু কৌশলে কোন একটি ক্রম ভাবলে পবিবর্ত্তিত হইতেছে। এই ভূতপ্রপঞ্চ ও শক্তিসমূহ যখন নিত্য পবিবর্ত্তিত হইতেছে তথন পবিবর্ত্তন শক্তি এবং ঐ দুই অবস্থা এই তিনটিই কোন একটি চতুর্থ অবস্থাব অবলম্বনে বিকাশ হইতেছে। কারণ শবকে পুষ্ট কবা, বৃদ্ধি ও পবিণত কবা এবং সকল প্রকাব চৈতন্যময় কবা একটি চিন্ময ও সাক্ষী অবস্থা বর্ত্তমান আছে, যাহা ঐ তিন অবস্থাব প্রকাশক। সেই অবস্থাই নিত্য তাহাই আত্মা। তাহাই সত্য। পবিবর্ত্তনকাবী কৌশলকেই কর্ম্ম কহে।

গীতাব ১৬ শ্লোক এই জন্য বলিতেছেন যাহা পবিবর্ত্তনীয তাহাই অসৎ; সতেব আশ্রয় ব্যতীত অসৎ কখন প্রতীত হইতে পাবে না; এবং যাহা সৎ তাহার কখনই পরিবর্ত্তন বা অভাব হইতে পাবে না। এই উভয তত্ত্ব বুঝিযাই বিজ্ঞানবিদ্ সাধুগণে আত্মাতিবিক্ত কাহাবো নিত্যতা স্বীকাব কবেন না।

জন্মান্তর বুঝিতে গেলে প্রথমে আমাদের দেহাবস্থা বোধ করা উচিত। যে দেহ নামক অবস্থা পাইয়াছি তাহার নামকরণ হইতে বস্তু নির্দ্দেশ পর্য্যন্ত, সকল অবস্থাতেই তাহাকে মিথ্যা বলিয়া পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন; কারণ ইহার সকল অবস্থাই পরিবর্ত্তনশীল। যেমন কোন একটি গৃহে কোন বিশেষ কার্য্য করিবার জন্য কতকগুলি লোকে কার্য্যোপযোগী

উপকরণ পাইয়া কিছুক্ষণ কার্য্য করিয়া শেষে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যায়। সেইরূপএই দেহরূপী পুরীতে ইন্দ্রিয়াদি,মনাদি কোন একটি কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া কিছু কাল থাকিতে থাকিতে, তাহারা যে সকল কার্য্য করিতে আসিয়াছিল তদনুরূপ ভাব মাখিয়া থাকে, কার্য্য ক্ষয় হইলে স্ব স্ব ব্যাপারে চলিয়া যায়। গীতা বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে ;—যাহা সদা পরিবর্ত্তিত তাহা অসৎ, এবং অসৎ কখনই সতের আশ্রয় ভিন্ন প্রকাশ হইতে পারে না,যেমন আলোকের সত্বার অপলাপই অন্ধকার। আলোক অপেক্ষা অন্ধকার অধিক অনুভব হইয়া থাকে। এই নিয়মে আমরা এই দেহের কি পরিণাম দেখিতেছি; এবং কোন অবস্থাটিকেই বা সত্য বলিতে পারি, তাহা দেখা যাউক। আমরা যে দেহকে এত সুন্দর ও সকল ভোগের আস্পদ বলিয়া বিবেচনা করি, তাহার কোন অবস্থাটি সত্য বা সুন্দর নহে। যে ভূতপ্রপঞ্চের মিলনে দেহের গঠন ও কান্তি ইত্যাদি, তাহা মনোময় অংশের সুখদুঃখের উপরে আশ্রিত রহিয়াছে। কারণ অন্তরে যদি বেদনা বা দুঃখ থাকে, বাহ্য দেহ কখনই পুষ্ট বা কান্তিময় হইতে পারে না। মন যে বৃত্তিমান্ অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, কাম ও ক্রোধাদি, ব্যঞ্জক হইবে ; বাহ্য দেহও সেই সকল ভাবের বিকাশক হইয়া থাকে। এই প্রমাণে ভূতগুলিকে দেহের কারণ বলা যায় না, মনাদিই দেহের পুষ্টি ; কান্তি সম্পন্ন পরিবর্ত্তনের কারণ হইতেছে। মনাদির অস্তিত্ব বিচার করিলে দেখা যায় ;—মনাদিও কাম, ক্রোধাদি বা পাপ, পুণ্য সম্বন্ধীয় বৃত্তি, সত্বরজো ও তমো গুণময় স্বভাবে আক্রান্ত হইয়া, সেই সেই ভাব সতত ভোগ করে ও সেই সেই অবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে। এই মনাদি সম্পন্ন দেহ শিশুকালে যে ভাব ধারণ করে, যৌবনে বার্দ্ধক্যে তাহার পরিবর্ত্তন দেখা যায়। জাগরণে যে ভাব থাকে, স্বপ্নে তাহা বোধ হয় না, স্বপ্নে যাহা বোধ হয় নিদ্রায় তাহা হয় না। আহারে যে অবস্থা তৃষ্ণায় তাহা নহে, তৃষ্ণায় যে অবস্থা ভয়ে তাহা নহে। এইরূপ অন্তর ও বাহ্য বস্তুর দিবানিশি পরিবর্ত্তন দেখিয়া, সাধুগণে

ইহার নাম দেহ রাখিয়াছেন। দিহ ধাতু হইতে দেহ শব্দের বুৎপত্তি। দিবানিশি যাহা পরিবর্ত্তিত এবং জরা ব্যাধি মৃত্যু প্রভৃতি আশঙ্কার সন্দেহান্বিত, তাহাকেই দেহ কহে।

এই পরিবর্ত্তন—কৌশল—তত্ত্বের জ্ঞান হইলেই জন্মান্তর বোধ হয়। আমরা চক্ষে বা বুদ্ধিতে দেখি বা অনুভব করি নাই বলিয়া প্রধানতঃ জন্মান্তর অস্বীকার করিয়া থাকি। সূক্ষ্মবুদ্ধিতে বিবেচনা করিলে সে সন্দেহ আমাদের থাকে না। যেমন শিশুতে যৌবন দেখা যায় না বলিয়া যৌবনের অস্বীকার যেমন মুর্খের কার্য্য, যেমন যুবকের বার্দ্ধক্য দেখা যায় না বলিয়া অস্বীকার্য্য হইতে পারে না। কেননা আমরা অন্য জীবের তাহা দেখিতেছি। যেমন জাগরণে নিদ্রার অভাব হয়, নিদ্রায় জাগরণের অভাব হয়, অথচ অন্য অবস্থায় তাহা ভোগ করি বলিয়া সকল অবস্থায় স্বীকার করি। কিন্তু ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ, দুঃখ কিম্বা মনাদি সমস্ত বৃত্তি ও শক্তিগুলি অবস্থাবিশেষে উদয় হয় আবার অন্তর্হিত হইয়া থাকে। উদয়টি অনুভব হয় মাত্র, চক্ষে দেখা যায় না। এইরূপ আমাদের দেহের সকল ক্রিয়মান্ শক্তিসমূহ ভূতপ্রপঞ্চের অন্তরে উদয় হয়, আবার অন্তর্হিত থাকে। যে দেহকে আমরা দেখিতেছি বলিতেছি; তাহার কি দেখিতেছি? পরিবর্ত্তিত ভূত-প্রপঞ্চ মাত্র। যাহারা দেহের গঠনকারী, যাহারা শক্তি, সত্বা, তাহাদের ভূতপ্রপঞ্চ মিলনেও দেখি নাই, ভূত বিচ্ছেদেও দেখিতে পাই না। যাহা চিরদিন দেখিতে পাই না, অথচ জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আবির্ভাবে অনুভব হয়, তিরোভাবে অনুভব হয় না। সেই সদা বর্ত্তমান অথচ আমাদের অপ্রত্যক্ষ বিষয়গুলিকে; জন্মের পূর্ব্বে ছিল না, মৃত্যুর পরে থাকিবে না, একথা বলা কি মুর্খের যুক্তি নহে। যেমন জগতের অন্তর্যামি অগ্নি, একটী দীপ বা কোন না কোন আধারে দীপিত হইলে আমরা অগ্নি জ্বলিল বলি মাত্র, সে অগ্নি যেমন পূর্ব্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে, মধ্যে কেবল অন্য পরমাণুর আশ্রয়ে দীপ্তি-মান্ হইল বলিয়া অগ্নির বোধ হইল, তদ্রূপ আমাদের মনপ্রভৃতি

কর্তৃত্বশক্তি, দৃষ্টি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় শক্তি, স্নেহ, কাম, ভয়, প্রভৃতি অবস্থা-শক্তি, চিরদিনই অদৃষ্ট অথচ বিশ্বব্যাপী আছে, যখনি কোন কর্ম্মযোগ এই ভূতপ্রপঞ্চের মধ্যে আকর্ষিত ও সংযুক্ত হয় তখনই দ্রব্যশক্তি ভূতোপাদান প্রকাশ করে, গুণশক্তি মনাদি প্রকাশ করে, ক্রিয়া শক্তি ইন্দ্রিয়াদি প্রকাশ করে, কালশক্তি উহাদের একত্রে মিলন, বর্দ্ধন ও পরিণতি ঘটাইয়া থাকে। কর্ম্ম উহাদের সুখ দুঃখানুযায়ী প্রবৃত্তি প্রদান করে। স্বভাব শক্তি উহাদের পূর্ব্বকর্ম্মানুসারী বাসনা ঘটাইয়া সংসারে সুখ দুঃখ ভোগ করাইয়া থাকে। এইছয় অবস্থার সম্মিলন এক আত্মবস্তুতে ঘটিয়া থাকে। যখন এইরূপ সম্মিলন ঘটে, তখনি আত্মা সাক্ষীচৈতন্যরূপে জীব হয়েন। এই সম্মিলন অনাদি কাল হইতে সংসারে বর্ত্তমান আছে। আত্মা সাক্ষীরূপে এই মিলনাবস্থায় দুঃখের অনুসরণ করেন বলিয়া ইহাকে সংসার কহে। পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখান হইয়াছে যে, দুঃখের একান্ত বিরতি ঘটাইবার জন্যই মনুষ্য জন্ম। কারণ মনুষ্য অতি ভোগেও অতি সুখী হইতে পারে না। যেমন তৈলাদি আধার যতক্ষণ থাকে দীপ ততক্ষণ জ্বলিয়া চক্ষের গোচরীভূত হয়, পরে নির্ব্বাপিত হইলে আধারের পরমাণুগুলির সহিত ধূমময় হইয়া মহাকাশে মহা অগ্নিতে মিলিয়া যায়। কিন্তু যতক্ষণ পরমাণুর সংযোগ থাকে ততক্ষণ বিশুদ্ধাগ্নিতে মিলন ঘটে না। সেইরূপ বিশুদ্ধ চৈতন্যাত্মা পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি ছয় অবস্থার সহিত সংসারী হইয়া জীব নাম ধারণ করেন। যখন কর্ম্মক্ষেত্রে স্থূলবস্থায় বর্ত্তমান, তখনই ইহাকে জন্মাদি পরিবর্ত্তনের অন্তর্গত দেখা যায়। দীপ যেমন আধারের অর্থাৎ তৈলাদির হ্রাসে তৈলপরমাণুর সহিত ধূমায়িত হইয়া মহাকাশে বিশুদ্ধ অগ্নিতে মিশিতে চেষ্টা করে, যতক্ষণ পরমাণুর সম্পর্কে সম্বন্ধীভূত থাকে, ততক্ষণ তাহার বিশুদ্ধ মিলন ঘটে না, সেইরূপ আত্মা ঐ ছয় সংস্থিতির অন্তর্গত থাকিয়া কোন প্রকার ব্যাধি, জরাযোগে ভূতোপাদানের হ্রাস হইলে, বর্ত্তমান দৃশ্য দেহ অর্থাৎ আধার ক্ষয় হয়, কিন্তু তাঁহার জীবভাব ক্ষয় হয় না। ঐ ছয় সংস্থিতি

পরমাণু চিরকাল অদৃশ্য অথচ নিত্য। কেবল বিশুদ্ধি ও অবিশুদ্ধি অনুসারে, আত্মার জৈব ভাবে সুখ, দুঃখ প্রদাতা হইয়া থাকে মাত্র। জন্ম অর্থাৎ ভূতোপাদান সহকারে কর্ম্মক্ষেত্রে দীপবৎ বিকাশ এবং মৃত্যু অর্থাৎ উপাদান শূন্য অবিকাশ অবস্থাদ্বয়মাত্র বুঝিতে হইবে। আত্মাব সংস্থতি অবস্থা জন্মাইবার পূর্ব্বে যেমন ছিল, জন্মের পরেও সেইরূপ রহিয়াছে, মৃত্যুর পরেও সেই ভাবে থাকিবে।

উপাদান অর্থাৎ তৈলাদি অল্প হইলে দীপ যেমন স্তিমিত দেখায়, সেইরূপ ভূতোপাদানের স্বল্পতা বশতঃ শৈশবাদি কালে আত্মার ঐ ছয় সংস্থতি শক্তি অল্প বিকশিত দেখায়। উপাদানের পূর্ণতায় যৌবনে সংস্থতি শক্তিগুলিব বহু বিকাশ আবার জরা অর্থাৎ পুনরায় উপাদান শক্তি ক্ষীণ হইলে পুনরায অল্প বিকশিত থাকিতে থাকিতে উপাদান-চ্যুত সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থান করে। এই যে চির দিন সমসূক্ষ্ম অথচ অদৃশ্য ভাবে স্থিত সংস্থতির অবস্থাগুলি যত দিন না ভোগকার্য্যে চরিতার্থ হয়, ততদিন ভোগেচ্ছা থাকে। ভোগেচ্ছা থাকিতে কখন জীবভাবের অর্থাৎ বারম্বার জন্মমৃত্যুব অভাব হয় না। স্বভাবকে দুঃখাতীত করিতে যে উপায়ে ঐ সংস্থতিশক্তিগুলি আপনাপন কার্য্যে তৃপ্ত হইতে চাহে, তাহাকে ভোগ কহে। অন্তরে যাহার যেরূপ অদৃষ্ট, স্বভাব, কর্ম্মশক্তির দ্বারা জীবনে বিকাশ হইয়াছে। সেই স্বভাবানুসারী বাসনা সুখ বা দুঃখ যে ভাবে চরিতার্থ করিতে ইচ্ছা করে। ইন্দ্রিয় প্রণালীদ্বারা সেই ভাবমণ্ডিত বিষয়গুলিই অন্তরে গৃহীত হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসা, রসনা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় গ্রাহ্য পাঁচটি বিষয় তন্মাত্রাই অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ বিষয় বাসনানুসারে গৃহীত হওয়াকেই ভোগ কহে। বৃত্তিগুলির চরিতার্থ করাই জন্মকালের বা জন্মভাবীয় জীবের উদ্দেশ্য হইতেছে। বৃত্তির চরিতার্থ কেবল ভোগেই হইয়া থাকে। ভোগ আর কিছুই নহে কেবল কর্ম্মানুসারে শব্দাদি সূক্ষ্মবিষয় উপভোগ করা মাত্র।

পূর্ব্বে কর্ম্ম ও স্বভাবের পৃথক পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যে সংকল্পে ঐ ছয় সংস্কৃতি শক্তি আত্মাকে সংসারী করিয়া রাখে, তাহাকে কর্ম্ম কহে। আর কর্ম্ম ভোগ করিতে করিতে সত্ব, রজো ও তমো গুণ ভেদে যে প্রবৃত্তি অন্তরেন্দ্রিয় মনাদিকে সুখী বা দুঃখী করে তাহাকে স্বভাব কহে। অর্থাৎ কর্ম্মবলে যদি আমি দরিদ্র হইলাম, কিন্তু প্রবৃত্তি আমার ধনী হইতে সদা ব্যস্ত হইয়া থাকে। কার্য্যতঃ এই অবস্থায় কর্ম্মশক্তি ধনী হওন প্রবৃত্তির বাধা দিতেছে বলিয়া দুঃখ বোধ হইতেছে। এই প্রবৃত্তি অর্থাৎ সুখ বা দুঃখ ভোগেচ্ছাকে স্বভাব কহে। দেহ থাকিলেও কর্ম্ম ভোগ হয়, দেহ না থাকিলেও ভোগ হয়। কারণ আহা সংস্কৃতির হেতু মাত্র। আত্মার সংস্কৃতি যখন অনাদি তখন এই কর্ম্ম জন্ম বা জন্মাতীত সকল অবস্থাতেই বর্ত্তমান। যেমন অশ্বত্থ বীজের মধ্যে অশ্বত্থ বৃক্ষত্ব বর্ত্তমান, সেইরূপ সূক্ষ্ম শরীরেরও জৈবকর্ম্ম বর্ত্তমান। কিন্তু বৃক্ষের বিকাশ ও ফলফুলগুলিই তাহার স্বভাব হইতেছে; ইহা কখনই বৃক্ষত্ব ভিন্ন প্রকাশ বা চরিতার্থ হইতে পারে না, সেইরূপ দেহ সংযোগ বা জন্ম ব্যতীত কখনই স্বভাবের চরিতার্থ ঘটে না। বীজের কর্ম্ম যেমন বৃক্ষ স্বভাবে পরিণত হইলে তাহার কর্ম্ম স্বভাব এবং তৎসম্পর্কে অনন্ত কর্ম্মবীজের সঞ্চার হয়। তদ্রূপ এই বিশ্বে জীবের জন্মমৃত্যু অনুসারে অনন্ত কর্ম্ম বেষ্টিত জৈব ভাব বর্ত্তমান আছে। যেমন বীজস্থ বৃক্ষভাবীয় কর্ম্ম সতত অঙ্কুরাদি স্বভাব দ্বারা জগতে নিত্য বিকাশ পায়, সেইরূপ কর্ম্মযুক্ত জৈবভাব আপনাপন স্বভাব বিকাশ করিবার জন্য বারম্বার জন্মাইয়া থাকে। যতক্ষণ স্বভাব ক্ষয় না হয়, ততক্ষণ কর্ম্ম ক্ষয় হয় না। স্বভাব চরিতার্থ অর্থাৎ সুখদুঃখের স্পৃহা একান্ত ক্ষয় হইলেই কর্ম্ম ক্ষয় হইল বুঝিতে হইবে। এই কর্ম্মক্ষয় হইলেই আর দেহ লাভ হয় না। মানব জন্মের চরম উন্নতি তাহাই হইল এ কথা প্রস্তাবান্তরে বুঝান হইবে। স্বভাব থাকিতে জন্ম হইবেই হইবে। কারণ স্বভাবই বৃত্তির চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করে। দেহোপাদান ব্যতীত বৃত্তির চরিতার্থ অর্থাৎ বাসনা-

নুসারী ভোগ হয় না। একটি প্রাপ্য দেহের উপাদান ক্ষয় হইলে অর্থাৎ মৃত্যু ঘটিলে স্বভাব পুনর্ব্বার দেহোপাদান গ্রহণ করিয়া থাকে, যেমন আহারে তৃপ্তি হইলে আর আহারে ইচ্ছা হয় না; সেইরূপ স্বভাবের একান্ত চরিতার্থ হইলে আর বাসনার বিকাশ হয় না। বাসনার বিকাশ না হইলে, কর্ম্মক্ষয় হইলে; জীব বিশুদ্ধ হইয়া সংস্থতি জনিত দোষক্ষয়ে নিত্যানন্দ উপভোগ করিতে থাকে। এই আনন্দ সম্ভোগের কথাও অন্য প্রস্তাবে দেখান হইবে।

এখন এই বুঝান হইল যে স্বভাবই বারম্বার দেহের আবশুক হইয়া আছে। যখনি ভোগ চরিতার্থ করিতে এক দেহোপাদান অক্ষম হইল, তৎক্ষণাৎ স্বভাব সে দেহোপাদান ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। এই জীবাবস্থা চিরদিন সংস্থতিতে আবদ্ধ থাকিতে দেহান্তর গ্রহণ নিবারিত হয় না। ইহাকেই জন্মান্তর কহে। এই জন্মান্তর বিধি না থাকিলে ঈশ্বরকে জ্ঞানচক্ষে ভীষণ বলিয়া বোধ হইত। পূর্ব্ব প্রমাণে দেখান হইযাছে কোন একটি ক্রিয়া নিষ্পাদন করিবার জন্যই প্রত্যেকে দেহ ধারণ করিযা থাকে। কারণ দেহটি আর কিছুই নহে, কেবল আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য কতকগুলি কার্য্য নিষ্পাদনের প্রণালী মাত্র। আমরা কর্ম্মটি বুঝাইবার জন্য আরো একটি প্রস্তাবের অবতারণা করিব। এক্ষণে দেখান হইল এই :—সমস্ত জন্তু যেমন সুখভোগের জন্য লালায়িত থাকে, মানবগণও সেই জন্য লালায়িত। তাহাদের দেহ ও যেমন সুখেচ্ছার বৃত্তিগুলিকে চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করে, আমাদের দেহও তাহাই করিযা থাকে। তাহারা যেমন আহার নিদ্রাদিতে ব্যস্ত, আমরাও সেইরূপ আছি। অতএব আহার নিদ্রাদি, কামক্রোধাদি, সুখে থাকিবার ইচ্ছা প্রভৃতি সকলি যদি পশুর সমান হইল তাহা হইলে মনুষ্য যে পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এ কথা কে স্বীকার করিবে!! অথচ শাস্ত্র বলিতেছেন সকল জন্তু জন্ম হইতে মনুষ্য জন্ম শ্রেষ্ঠ হইতেছে; ইহারই বা অর্থ কি? মহর্ষি মনু বলিয়াছেন :—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু তু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥

অস্যার্থঃ—বৃক্ষ, কীট, লতা প্রভৃতি ভূতসমূহের মধ্যে প্রাণবিশিষ্ট জঙ্গম প্রাণিগণই শ্রেষ্ঠ। প্রাণবিশিষ্ট প্রাণিগণের মধ্যে যাহাদের হিতাহিত বোধ আছে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ হইতেছে। হিতাহিত বোধ সম্পন্ন প্রাণিগণের মধ্যে মানবগণই শ্রেষ্ঠ। মানবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ জন্মই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণজন্মের মধ্যে বেদজ্ঞগণেই শ্রেষ্ঠ। বেদবিদ্‌গণের মধ্যে যাঁহারা যজ্ঞমন্ত্রাদিতে দক্ষ তাহারাই শ্রেষ্ঠ। যজ্ঞমন্ত্রতত্ত্বজ্ঞগণের মধ্যে অনুষ্ঠাতাগণই শ্রেষ্ঠ। অনুষ্ঠাতাগণের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করেন তাঁহারাই সর্ব্বপূজনীয় হইতেছেন।

এই প্রমাণ বাক্যে দেখান হইল সকল জন্তুদেহ হইতে মানবদেহ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রধান কি জন্য? না—ইহার আশ্রয়ে বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তর্বৃত্তিগুলির বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয়। বেদাদি বিজ্ঞানবিদ্যা অভ্যাস করিয়া শেষে আপন আপন জীবনকে পশুজন্ম হইতে অতীত বিশুদ্ধ জন্মে পরিণত করিতে পারে। যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আপনাদের দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া শেষে ব্রহ্মবস্তুতে আত্মসমর্পন করতঃ জরা, মৃত্যু ও জন্মাদির হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে দুঃখ নিবৃত্তি, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, জন্ম, শোক, তাপ প্রভৃতি হইতে উদ্ধার; পরিপূর্ণ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অদৃষ্টের সংশোধনকার্য্য প্রভৃতি করিতে সক্ষম হয় বলিয়া, মনুষ্যজন্ম সকল পশুজন্ম হইতে পূজনীয় হইতেছে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন:—

জন্তুনাং নরজন্ম দুর্ল্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততোবিপ্রতা।
তস্মাদ্বৈদিকধর্ম্মমার্গপরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎ পরং॥ ১।
দুর্ল্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহহেতুকং।
মনুষ্যত্বং, মুমুক্ষত্বং, মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥ ২।

অস্যার্থঃ—সমস্ত জন্তু জন্মের মধ্যে মনুষ্য জন্মই দুর্ল্লভ। সেই মানবদেহে আবার পুরুষত্ব লাভ করা অধিক দুর্ল্লভ। পুরুষ হইয়াও বিজ্ঞান সংস্কার সম্পন্ন বিপ্রত্বলাভ করা ততোধিক দুর্ল্লভ। সংস্কার সম্পন্ন শুদ্ধ জন্ম হইতে বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠাতাই সর্ব্বাধিক দুর্ল্লভ; ধর্ম্মানুষ্ঠাতাগণ হইতে ব্রহ্মবিদ্যায় বিদ্বান জন্মই সকল হইতে পূজনীয় হইতেছে। হে শিষ্যগণ! একেত মনুষ্যত্ব লাভ করাই দুর্ল্লভ। মনুষ্য হইয়া মুক্তির ইচ্ছা আরো দুর্ল্লভ, সেই মুক্তিকৌশল বিজ্ঞানের জন্য মহাপুরুষের সাক্ষাৎ ও অনুগ্রহ লাভ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ল্লভ হইতেছে। এই যে মানব জন্ম, মুক্তির ইচ্ছা ও সদ্গুরুর আশ্রয় লাভ প্রভৃতি তিন উপায়, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত কখনই জীবের লাভ হয় না। পুনশ্চ ভগবান আচার্য্য বলিতেছেন:—

"ইতঃ কোন্বস্তি মূঢ়াত্মা যস্তুস্বার্থে প্রমাদ্যতি।
দুর্ল্লভং মানুষং দেহং প্রাপ্য তত্রা[illegible] পৌরুষং॥"

অস্যার্থঃ—ইহ সংসারে সকল জন্মের প্রশংসনীয় পুরুষার্থপূর্ণ মানবদেহ পাইয়া যে ব্যক্তি আত্মমুক্তির ইচ্ছা না করে এবং সতত অস্বার্থ যে মিথ্যাবিষয় ভোগ তাহাতে পশুর ন্যায় নিরত ও উন্মত্ত, ইহ সংসারে তাহা অপেক্ষা মূঢ়াত্মা আর কে আছে?

এই শ্লোকেই দেখান হইল যে মানুষত্বটী দুর্ল্লভ কেন? না-ইহার অন্তরে দুঃখ নষ্ট করিবার জন্য পুরুষার্থশক্তি বর্ত্তমান আছে। সেই শক্তির স্ফূর্ত্তি করিতে পারিলেই মানব প্রকৃত মানবদেহ লাভ করিতে পারিবে। তাহা না লাভ করিলে মানব পশু হইতে হেয় হইয়া থাকিবে। কোন সুখ লাভ হইবে না।

পূর্ব্ব প্রমাণে দেখান হইয়াছে যে;—অতি মাত্র সুখলাভ করাই সকল জীবনের উদ্দেশ্য; তাহা যদি লাভ না হইল; পশুগণ ভোগ্যদেহে ভোগ করিয়া যেমন সুখী হয়, মানব তাহা যদি না পারিবে, তবে মনুষ্য কাম্য বিষয় ভোগেও পশু হইতে হেয় হইল।

যে সকল উপায়গুলির উল্লেখ মহর্ষি মনু ও ভগবান শঙ্করাচার্য্য

করিলেন। যাহা লাভ করিলে মানবদেহ জন্তু হইতে উন্নত ভাব লাভ করিতে পারে। যাহার আশ্রয়ে মনুষ্য একান্ত দুঃখ হানি করিয়া পরিপূর্ণ সুখের মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে, তাহারই নাম উপাসনা হইতেছে। দেহতত্ব ও আত্মতত্ব বোধ না হইলে, আমরা মনুষ্য হইয়া পশু হইতে শ্রেষ্ঠ কিসে হইলাম, এবং আমাদের মধ্যে এমন কোন কোন বৃত্তি আছে যাহা দুঃখহানি করিতে পারে, ইহা স্থির হইবে না। এই প্রস্তাবে দেখান হইল যে;—দেহটি আর কিছুই নহে, কেবল সর্পনির্ম্মোকের ন্যায় একটি ভৌতিক আবরণ মাত্র। ইহার অন্তরে কর্ম্মস্বভাবমণ্ডিত জীবাত্মা যে ভাবে থাকিলে সুখী হইবে, সেই ভাবের ক্রিয়াপ্রণালী সমস্ত প্রকাশ রহিয়াছে। কর্ম্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে, এই দেহ সুখভোগের শক্তি কখন লাভ করে কখন করে না। ইহজন্মে কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের ক্ষয় ও জন্মান্তরে পুনরায় কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের ক্ষয় এই নিয়মেই আর্য্য সংসার চলিতেছে ও চিরদিন চলিবে। এখন তিনটি তত্ত্ববোধ হইলেই উপাসনায় অধিকার বোধ হইবে। পঞ্চভূতময় শরীরটি কিছুই নহে। মনোময়, লিঙ্গ শরীরই সর্ব্বস্ব হইতেছে। লিঙ্গ শরীরই পাপপুণ্যময় কর্ম্ম দ্বারা মণ্ডিত; তাহার পাপপুণ্যময় কর্ম্মগুলির বিকাশ উপযোগী অবস্থাই ভৌতিক দেহ হইতেছে। সেই ভূতময় শরীরের বিকাশ হইলেই জন্ম হইল, তাহার ক্ষয়ই মৃত্যু। পুনরায় সূক্ষ্ম শরীর যখন নিজ কর্ম্ম ক্ষয় বা বিকাশ করিবার জন্য ভূতময় দেহ ধারণ করে, তখনি জন্মান্তর ঘটিয়া থাকে। জন্মান্তর ও ভূতদেহ ব্যাপার এই প্রস্তাবে উভয় আভাস কিছু কিছু দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে কর্ম্ম কি? লিঙ্গ দেহ কি? পাপপুণ্য কি? আত্মস্বরূপ কি? ঐ চারি তত্ত্বের ক্রমে ক্রমে সামান্য আভাস দেওয়া হইতেছে। উহা বোধ হইলেই উপাসন অধিকার জন্মিয়া থাকে।

———

অথ কর্ম্ম তত্ত্ব।
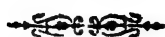
এই সুবিশাল সংসারে যে উপায় বা নিয়মের দ্বারা অনন্ত জীব-শ্রেণী আপনাপন জন্ম চরিতার্থ করিতেছে তাহাকেই কর্ম্ম কহে। যেমন একটি সূক্ষ্ম বীজ দেখিলে তাহাতে বৃক্ষের কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু সেই বীজ অবস্থাভেদে আবার বৃক্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে। তদ্রূপ যতক্ষণ ব্রহ্ম নির্গুণ ও সৎ স্বরূপ, ততক্ষণ তাঁহাতে কর্ম্মের বিকাশ হয় না। বীজভাবে সমস্তই তাঁহাতে লীন থাকে। যখনই তাঁহার ইচ্ছায় জগৎ হইল; সেই অনাদি অনন্তকাল হইতে কর্ম্ম সমস্ত সংসারে বিকাশ হইয়া পড়িল। অর্থাৎ সংসার বলিতে আর কিছুই নহে, কেবল কর্ম্মসমষ্টি মাত্র। সৃষ্টি, সংহার ও পালন ইহাই সগুণ ব্রহ্মের কর্ম্ম হইল। যাহার সাহায্যে সূক্ষ্ম অবস্থা স্থূলে ও ক্রিয়মান্ অবস্থায় পরিণত হয় তাহাকে কর্ম্ম কহে। এই জগতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই। পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার এই সকল উপাদানেই জগৎ গঠিত হইয়াছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই আপনাপন কর্ম্মে পরিণত রহিয়াছে। আকাশ স্থান দিতেছে ও শব্দ প্রকাশ করিতেছে। বায়ু শীতোষ্ণ স্পর্শাদি প্রকাশ করিতেছে। তেজ শোষণ, স্ফূরণ ও রূপাদি বিকাশ করিতেছে। বারি পোষণ, দ্রাবণ, মিষ্টতিক্তাদি রসনাদি করিতেছে। পৃথ্বী গুরুতা ও গন্ধাদি বিকাশ করিতেছে। এই যে আকাশাদি ভূতগণের বিকাশভাব, ইহারা ঐ ভূতগুলির কর্ম্ম হইতেছে। ঐ কর্ম্ম অনাদি কাল হইতে উহাদের বর্ত্তমান আছে, যখন জগতে কোন দেহ বা বস্তুর অঙ্কুর হইবে, সেই অঙ্কুর মাত্রেই অঙ্কুরের

মধ্যস্থ ভূততন্মাত্রাশক্তি দ্বারা স্থূলভূত বিকাশ হইয়া থাকে। এই নিয়মে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদিপ্রকাশিকা শক্তিগুলির সাহায্যে ঐ গুণ ও ঐ সকল গুণময় ভূতগুলির বিকাশ হইয়া থাকে। ভূতের কর্ম্ম বিশ্বে অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান। তন্মাত্রা অর্থাৎ ভূতপ্রকাশক কারণগুলির ক্রিয়াও অনাদি হইতে বর্ত্তমান। এই নিয়মে প্রাণাদি পাঁচটি শক্তির ক্রিয়াও অনাদিকাল হইতে হইতেছে। প্রাণশক্তিতে শ্বাসপ্রশ্বাস অনুসারে দেহের ক্ষয়, পুষ্টি, বৃদ্ধি প্রভৃতি হইয়া থাকে, অপানশক্তিতে দূষিত বস্তু বহির্নিগমন হইয়া থাকে। সমানশক্তিতে দেহস্থ সারাসার বিভাজিত হইতেছে, উদান শক্তিতে স্বর, হিক্কা প্রভৃতি হইতেছে। ব্যান শক্তিতে ধাতু, রস রক্ত প্রভৃতি শরীরের সর্ব্বত্র চালিত হইতেছে। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত বিশ্বের উপাদানগুলি একত্রে মিশিলেই জীবসংসার হয়। বিভাজিত থাকিলেই জীবাতীত পূর্ণ বিশ্ব হইয়া থাকে। জীবদেহ ভূতপ্রপঞ্চে গঠিত, প্রাণ, মন, জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ে গঠিত হইয়াছে। চিত্ত বুদ্ধি ও অহংকার ইহার অন্তরে বর্ত্তমান আছে। জগতে যে কর্ম্মশীল প্রপঞ্চ বর্ত্তমান; জীবসংসারেও সেই কর্ম্মশীল প্রপঞ্চ বর্ত্তমান। অতএব জগৎ যে নিয়মে কর্ম্মী হইয়া অনন্ত কাল বর্ত্তমান, লয় ও সৃষ্ট হইতেছে। দেহও সেইরূপ কর্ম্মপ্রপঞ্চে মণ্ডিত হইয়া অনাদি কাল হইতে কখন জন্ম, কখন জন্মান্তর লাভ করিতেছে। এই জন্য বিশ্বকে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড কহে। দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড কহে। জগতে যাহা আছে দেহেও তাহাই আছে। এই সকল প্রমাণে দেহের সর্ব্বাংশ যে কর্ম্মময় তাহা বলা হইল।

জীবদেহ হইতে ব্রহ্মাণ্ডের পার্থক্য এই যে;—বিশ্ব বা বিরাট্‌দেহে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বপ্রপঞ্চের কর্ম্মই প্রকাশমান্ আছে। জীবদেহে ঐ চতুর্ব্বিংশতি কর্ম্মতত্ত্ব সহযোগে আর একটি পদার্থ আছে যাহাকে সুখ ও দুঃখভোগ কহে। এই সুখ ও দুঃখভোগ উপস্থিত করিতে স্বভাব বলিয়া দ্বিতীয় অবস্থা আছে, যাহা বিশ্বে বা বিরাটে নাই। এই ভোগ ও স্বভাব ইহাদের ক্রিয়া চরিতার্থ হইবার জন্য যে দেহ লাভ

হয় তাহাকেই মানবদেহ কহে। এই মানব দেহে তিনটি কর্ম্ম চরিতার্থ হইয়া থাকে। *বিশ্বপ্রপঞ্চজাত কর্ম্ম, ভোগজন্য এবং স্বভাব জাত কর্ম্ম।* ২৩,০৭০

বিশ্ব প্রপঞ্চ জাত কর্ম্ম বলিতে পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ক্রিয়মান অবস্থা বা গুণগুলির মধ্যে কেহ এই দেহের উপাদান সংগ্রহ করে, কেহ ভোগ করায়, কেহ ভোগ করিয়া থাকে। যেমন ভূতগুলি উপাদান রূপে সংহত হইয়া থাকে। তন্মাত্রাগুলি ভোগ্য বস্তুরূপে বর্ত্তমান। অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি আমরা ভোগ করিয়া থাকি। প্রাণাদি ভোগ করাইয়া থাকে। মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহংকারাদি ভোগ করিয়া থাকে। এই দেহের মধ্যে পদার্থ প্রপঞ্চে আমরা পাইলাম ভোগার্থ উপযুক্ত ভৌতিক গঠন। ভোগ করিবার জন্য শব্দাদি। ভোগ করাইবার জন্য প্রাণেন্দ্রিয় শক্তি এবং ভোগ করিবার জন্য মনাদি। মনুষ্য দেহ কিরূপ হইবে; মনুষ্যের স্বভাব কিরূপ হইবে, এরূপ তত্ত্ব বিশ্বের পদার্থ বা তত্ত্বপ্রপঞ্চে নাই। কিরূপ দেহ গঠিত হইলে মনুষ্যোচিত সুখদুঃখ ভোগ হইবে সেই অনাদি অবস্থাকে ভোগার্থ বা ভোগজন্য কর্ম্ম কহে। এই অবস্থা ব্যতীত কোন জীবেরই ভিন্ন ভিন্ন গঠন হইতে পারে না। যে অবস্থা দ্বারা হিতাহিত বোধ হইয়া জীবের বৃত্তি সুখের বা দুঃখের দিকে ধাবিত হয়, তাহাকে স্বভাবজাত কর্ম্ম কহে। এই অবস্থাই জীবকে দুঃখ ও সুখের ভোগকারী করিয়া বহু প্রাণীমূর্ত্তিতে দেহকে পরিণত করিয়া থাকে।

এখন আমরা দেহের বাহ্য ও অন্তর বোধ করিয়া দেখিলাম যে এই দেহটি কেবল প্রাকৃতিক কর্ম্মের চরিতার্থ করণ স্থল মাত্র। এই প্রাকৃতিক কর্ম্মতন্ত্রে আমাদের মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অংহকার জন্ম ও জন্মান্তর হইতে চালিত হইয়া তাহার ভাবে অনুরঞ্জিত রহিয়াছে; এই জন্য আমরা যে কর্ম্মাতীত ও স্বাধীন হইতে পারি এ অবস্থা স্মৃতি পথে আনিতে পারি না। কিন্তু বাস্তবিক কর্ম্মাতীত হইবার বৃত্তিগুলি

এই দেহে আছে বলিয়াই এবং পুরুষার্থ সংকুল দেহাধার জন্তুগণের মধ্যে পাইয়াছি বলিয়াই আমরা সকল কর্ম্মপূর্ণ জন্ত জন্ম হইতে প্রধান ও পূজনীয় জন্ম লাভ করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি ভোগার্থ এবং স্বভাবজাত ত্রিবিধ কর্ম্ম সম্পর্কীভূত হইলেই দেহলাভ হয়। জীব বিশুদ্ধ হইলেও মনাদি বৃত্তিগুলি কর্ম্মভোগে অনুরত থাকাতে, আপনাকেও তন্ময় বোধ করিয়া থাকে। যেমন সম্মুখে ভীষণ ভাবধারী কোন ব্যক্তি অসিহস্তে আমাকে বধ করিবার জন্য অসি উত্তোলন করিলে, আমি মৃত্যু ও যন্ত্রণা ভয়ে তৎক্ষণাৎ আত্মাকে অভিভূত বোধ করিয়া থাকি; আবার সেই ঘটনা শেষ হইলে, তৎক্ষণাৎ যদি হাস্যরসের ঘটনা ঘটে, তাহাতে তৎক্ষণাৎ আত্মাকে অদ্ভুদরসাক্রান্ত দেখি। এই যে ভাবের অপলাপে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার অনুভব, আত্মাতে হয়; ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, আত্মা উক্ত ভাবগুলিতে মিশ্রিত নহেন, মনাদিবৃত্তিগুলি ঐ সকল ভাবে অভিভূত হইলে, অভিভূতি বোধ করেন মাত্র। এই প্রমাণে অনাদি কাল হইতে জীব প্রাকৃতিক কর্ম্মাবরণে আবৃত হইয়া আসিতেছে। সেই চিরাভ্যস্ত অবস্থায় মনাদি অনুরঞ্জিত থাকাতে আমরা যে স্বাধীন ও বিশুদ্ধ হইতে পারি এ কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক আমরা এই মনুষ্য জন্মে কর্ম্মাতীত হইতে পারি। যেমন দুঃখের অবস্থা অতীত করিয়া সুখের অবস্থায় পরিণত হইলে মনাদি প্রসন্ন হয়, আত্মাও সুখী হইয়া থাকে। তদ্রূপ প্রাকৃতিক গুণ ও কর্ম্মাদি হইতে মনাদি বৃত্তিকে বিশুদ্ধ করিতে পারিলে আমরা কর্ম্মস্বভাব হইতে অতীত সুখস্বরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারিব। এই অবস্থা বুঝাইবার জন্য শ্রীগীতা শাস্ত্রে ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন;—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মানি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

হে অর্জ্জুন! সত্ব রজঃ ও তমোগুণযুক্তা প্রকৃতি জীবদেহে আবিষ্ট হইয়া, জীবের যে গুণময় স্বভাব তদনুযায়ী কর্ম্মসমূহ ভোগ করাইয়া

থাকে। সেই ভোগে বিমূঢ় হইয়া অর্থাৎ জীব আপনায় স্বাধীনতা হারাইয়া কর্ম্মগুণের বশীভূত থাকিয়া তদ্ভোগে অহংকারী হইয়া, আমি কর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা মাত্র করিয়া থাকে। (বাস্তবিক গুণকর্ম্মস্বভাব প্রকৃতির, জীবের নহে।)

এ বিষয়ে মহর্ষি মনু বলিতেছেন;—

"তদাবিশন্তি ভূতানি মহান্তি সহ কর্ম্মভিঃ।
মনশ্চাবয়বৈঃ সূক্ষ্মৈঃ সর্ব্বভূত কৃদব্যয়ং॥

অস্যার্থ;—সেই সগুণ ব্রহ্মাবস্থা হইতে আপনাপণ গুণকর্ম্মযোগে মহাভূতসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই অবস্থা হইতেই জীব জগতের জন্য, সূক্ষ্ম অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর, শুভাশুভ সংকল্প বিকল্প ও সুখদুঃখাদি মূর্ত্তিমান্, সর্ব্বপ্রাণী গঠনবিকাশকারী, অবিনাশী মনের উৎপত্তি হইয়াছে।

মনাদিগত বৃত্তি অনুসারে এবং তাহার অভ্যস্ত কর্ম্মগুলির চরিতার্থ করিবার উপযুক্তি অনুসারে যে দেহের গঠন হইয়াছে। ইহা মহর্ষি মনু বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

স্বয়ং মহেশ্বর শিবসংহিতাতে বলিতেছেন;—

"পিতুরন্নময়াৎ কোষাজ্জায়তে পূর্ব্বকর্ম্মতঃ॥
তচ্ছরীরং বিদুর্দ্দুঃখং স্বপ্রাগ্ভোগায় সুন্দরং॥
মাংসাস্থিস্নায়ুমজ্জাদিনির্ম্মিতং ভোগমন্দিরং।
কেবলং দুঃখভোগায় নাড়ীসন্ততি গুল্ফিতং॥
পারমেষ্ঠ্যমিদং গাত্রং পঞ্চভূতবিনির্ম্মিতং।
ব্রহ্মাণ্ড সংজ্ঞকং দুঃখসুখভোগায় কল্পিতং॥
পূর্ব্বকর্ম্মানুরোধেন করোমি ঘটনামহং।
অজড়ঃ সর্ব্বভূতস্থো জড়স্থিত্যা ভুনক্তিতৎ॥

অস্যার্থ;—পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে 'জীব পিতার অন্নময় কোষজাত' রেত হইতে, অদৃষ্ট ভোগের জন্য এই সুন্দর ভোগাগার প্রাপ্ত হয়। ইহা দুঃখে পরিপূর্ণ, এইজন্য ইহাকে শরীর কহে। এই ভোগমন্দির

স্বরূপ দেহ;—মাংস, স্নায়ু, মজ্জা, অস্থি, এবং নাড়ি সমূহে গঠিত হইয়া কেবল দুঃখ ভোগের জন্যই বর্ত্তমান আছে। এই পঞ্চভূত বিনির্ম্মিত গাত্রের আর একটি নাম ব্রহ্মাণ্ড, তৃতীয় নাম পারমেষ্ঠ্য অর্থাৎ ব্রহ্মলোকস্বরূপ হইয়াছে। কারণ অবস্থাভেদে ইহাতে দুঃখ এবং সুখ উভয়ই ভোগ হইয়া থাকে। জীবাত্মা স্বয়ং চৈতন্য, অন্তর্যামী এবং বিশুদ্ধ,দেহ ভোগ করিতে করিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘটাতেই আমি বারম্বার তাঁহার জন্ম জন্মান্তর ঘটাইয়া,দেহ প্রদান করিয়া থাকি। তিনি এই জড়বৃত্তিমান্ দেহের মধ্যে থাকিয়া সাক্ষীরূপে তাহা চিরদিন ভোগ করিয়া থাকেন।

এইরূপে সংক্ষেপে প্রাকৃতিক, ভোগজাত, স্বভাবজাত কর্ম্ম, এবং অদৃষ্ট স্বভাবের পরিচয় দিলাম। এই সকল অবস্থার অতীত যে দুঃখাতীত অবস্থা আছে তাহা ভোগ করাইবার জন্যই মনুষ্যদেহ ধারণ এবং মানব জন্ম। উপাসনা সাহায্যে তাহাই লাভ হইয়া থাকে। যে উপায় দ্বারা পূর্ব্ব কর্ম্মসমূহ ক্ষয় হয় তাহাকে আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম কহে। যেমন পদে কণ্টক বিদ্ধ হইলে, অন্য কণ্টক দিয়া তাহাকে তুলিয়া লইতে হয়। যেমন ভয় নাশ করিতে উৎসাহ দানও একটী কর্ম্ম। যেমন মূর্খত্ব নাশ করিতে বিদ্যাশিক্ষাও একটি কর্ম্ম, সেইরূপ অদৃষ্ট, স্বভাব ও প্রাকৃতিক কর্ম্ম নাশ করিতে যে কর্ম্মের আবশ্যক হয় তাহাকে আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম কহে। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা অনুষ্ঠানমাত্রে উহার ফললাভ হয় বলিয়া উহাকে আনুষ্ঠানিক কহে। এই আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত। একের নাম সকাম, দ্বিতীয়ের নাম নিষ্কাম।

সকাম অনুষ্ঠান করিলে ভোগটি চরিতার্থ হয়। জরা ব্যাধি প্রভৃতিতে বড় কাতর করিতে পারে না, সুখের চরম ভোগ হয়। কিন্তু পুনর্জন্ম লাভ হয়। নিষ্কাম কর্ম্মে ঐহিক সুখ ক্ষয় হইয়া সকল দুঃখাতীত মুক্ত অবস্থা লাভ হইয়া থাকে কোন্‌টী আমাদের জন্মের উপযুক্ত ব্যবহার ও অভ্যাসযোগ্য কর্ম্ম, কোন্‌গুলিকেই বা আমরা ত্যাগ

করিব, ইহা বুঝাইবার জন্যই সুখ ও দুঃখ নামক অনুভবাবস্থাদ্বয় আমরা পাইয়াছি। এই জন্য মনু বলিতেছেন :—

"কর্ম্মনাঞ্চ বিবেকার্থং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ব্যবেচয়ৎ।
দ্বন্দ্বৈরযোজয়চ্চেমাঃ সুখদুঃখাদিভিঃ প্রজাঃ॥"

সেই ভগবান্, জীবগণ যাহাতে আপনাপন কর্ম্ম বুঝিতে পারে, ইহার জন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম স্থির করিয়া দিয়াছেন। ধর্ম্মানুযায়ী ফল সুখ এবং অধর্ম্মানুযায়ী ফল দুঃখ, এই উভয় বিষয়ে প্রজাসমূহকে সংযুক্ত রাখিযাছেন। অর্থাৎ প্রজাগণ সুখ দুঃখ বিবেচনা করিয়া আপনাপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্থির করিয়া লইবে। এই আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম, যাহা সকাম নিষ্কামে বিভজিত; ইহাই জীবের পূর্ব্ব কর্ম্মক্ষযের কারণ ও একমাত্র উপায় হইতেছে। এই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম যাহাতে সুখ উপস্থিত হয়, তাহা ভোগ করিতে করিতে যখন একান্ত দুঃখ হানি হয়, তখনই মনুষ্য জরা, মৃত্যু, দুঃখ, শোক, তাপের হস্ত হইতে, ব্যাধি, ক্লেশের হস্ত হইতে, কাম ও ক্রোধাদির হস্ত হইতে, অর্থাৎ প্রাকৃতিক, ভোগজাত ও স্বাভাবিক কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। যেমন অতিমাত্র শীতার্ত্ত ব্যক্তি সূর্য্য না উঠিতে উঠিতে অগ্নির সাহায্যে শৈত্য নিবারণ করিতে পারে, সেইরূপ উপাসনাবলে আত্মদুঃখহানি করিবার জন্য চেষ্টা কাবলে; জীব তাহাতে সক্ষম হইয়া থাকে। এই কর্ম্মতত্ত্ব বোধ হইলে জীবের দুঃখহানির জন্য ইচ্ছা হয়। এই কর্ম্ম ক্ষয় করিবার জন্য উপাসনার প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতএব কি ভোগী, কি মুমুক্ষু, সকলেরই পক্ষে যখন পূর্ব্ব কর্ম্ম ক্ষয়ই সুখাবিস্তারের কারণ হইতেছে, তখন উপাসনা সকলেরই আবশ্যক। উপাসনা বলে আনুষ্ঠানিক কর্ম্মযোগে অতিমাত্র সুখোৎপাদন করিয়া মানব পরম সুখী ও মুক্ত হইয়া থাকে।

অথ আত্ম তত্ত্ব।

পূর্ব্বে আমরা প্রকাশ করিয়াছি যে;—উপাসনাতত্ত্বের অধিকারী হইয়া প্রকৃত ফললাভের জন্য চেষ্টা থাকিলে, উপাসককে দেহতত্ত্ব, জন্মান্তর তত্ত্ব; কর্ম্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, জীবের অন্তর্দ্দেহতত্ত্ব, পাপ ও পুণ্য-তত্ত্ব, প্রভৃতি কয়েকটি তত্ত্ব বিশেষরূপে বোধ করিতে হয়। এই সকল অবস্থা বোধ হইলে উপাসনা। আবির্ভাব জন্মায়। বারম্বার এই সকল অবস্থার আন্দোলন করিতে করিতে এমন একটি জ্ঞানময় অবস্থা উপস্থিত হয়, যাহাতে দুঃখ ক্রমে ক্রমে প্রশান্ত হইতে থাকে। দুঃখ শান্ত করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত ছয় তত্ত্ব দ্বারা পূর্ণ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এই জন্য এই সকল অবস্থার বারম্বার আলোচনা করিলে পূর্ণ জ্ঞানময় হওয়া যায়। এই জ্ঞানময় হইলে, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, তাপ, দুঃখ, কামাদি কেমন করিয়া দেহে উপস্থিত হয়, তাহার কারণ বোধ হইয়া থাকে। সকল সুখের ও দুঃখের কারণ জানা যায় বলিয়া এই আলোচনাময় অবস্থাকে জ্ঞানকাণ্ড কহে। ইহাতে বোধ মাত্র হয়; কিন্তু কায়া, বাক্য ও মনাদি দ্বারা সাত্ত্বিকী অনুষ্ঠান যোগে ঐ জ্ঞানকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা বলে আবির্ভাব করিতে হয়। সেই সাত্ত্বিকী অনুষ্ঠান দ্বারা জীবের কর্ম্মক্ষয় হইয়া থাকে। সেই দ্রব্য ও মন্ত্রাত্মক অনুষ্ঠানগুলিকে শাস্ত্রে কর্ম্মকাণ্ড কহে। এই জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড উভয় কাণ্ড আলোচনা ও অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি ও বিজ্ঞানাবস্থা উপস্থিত হইলেই জীবত্ব মুক্ত হইয়া যায়। পূর্ব্বে জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে দেহ, জন্মান্তর ও কর্ম্ম এই ত্রিবিধ তত্ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। এক্ষণে আত্মতত্ত্বের কথা বলা হইতেছে। শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে,

আত্মতত্ত্ব যতক্ষণ বোধ না হইবে, ততক্ষণ জ্ঞান ও কর্ম্ম কাণ্ডের কোন ফলই সহজে লাভ হইবে না। এই জন্য শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিতেছেন ;—

"সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।

অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

ব্যাখ্যা। ব্যক্তং ক্ষরং বিনাশি, অব্যক্তং অক্ষরং অবিনাশি, তদুভয়ং পরস্পরসংযুক্তং এতৎ কার্য্যকারণাত্মকং বিশ্বং ভরতে বিভর্ত্তি, ঈশঃ ঈশ্বরঃ। ন কেবলমীশ্বরো ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে, অনীশশ্চানীশশ্চ স আত্মা অবিদ্যা তৎকার্য্যভূত দেহেন্দ্রিয়াদিভির্ব্বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ। এবং সংষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকত্বেন জীবপরয়োরৌপাধিকস্য ভেদস্য বিদ্যমানত্বাত্তদুপাধ্যুপাসনদ্বারেণ নিরুপাধিকং দেবং ঈশ্বরং জ্ঞাত্বা মুচ্যত ইতি।

অস্যার্থঃ—এই যে কার্য্যকারণাত্মক বিশ্ব দেখা যায, ঈশ্বর নিরূপাধি হইয়াও ব্যক্তাব্যক্ত ক্ষরাক্ষর অর্থাৎ বিনাশি অবিনাশী হইয়া বিশ্বের ভরণপোষণ করিতেছেন। তিনিই জীবরূপে অনীশ্বর হইয়া অর্থাৎ ভোগোপাধি বিশিষ্ট হইয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করিতেছেন। সে নিরুপাধি ঈশ্বরকে জানিতে পারিলে, জীবাত্মার সকল উপাধিজাল-বন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়।'

শ্রুতির তাৎপর্য্যে দেখান হইল যে ;—আত্মা জীবভাবে কেমন করিয়া ভোগে আসক্ত এবং ঈশ্বর কিরূপে নিরুপাধি বিশিষ্ট, এই উভয় তত্ত্ব বোধ হইলে, জীবভাবের ক্ষয়ে ব্রহ্মভাব উপস্থিত হয়। সেই স্বাধীন ও পরিপূর্ণ বিশুদ্ধাবস্থাই মুক্তির পরিচায়ক হইতেছে। এ বিষয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন ;—

"বিশোক আনন্দময়ো বিপশ্চিৎ স্বয়ং কুতশ্চিন্নবিভেতি কশ্চিৎ।

নান্যোঽস্তি পন্থা ভববন্ধমুক্তৈ বিনা স্বতত্ত্বাবগমং মুমুক্ষো॥

নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মমন্তর্ব্বহিঃ শূন্যমনন্যমাত্মনঃ॥

বিজ্ঞায় সম্যগ্ নিজতত্ত্বমেতৎ পুমান্ বিপাপ্মাবিরজো বিমৃত্যুঃ॥"

অস্যার্থ ;—আত্মতত্ত্ব বোধ বিনা অন্য কোন সূক্ষ্ম পথ নাই যাহার সাহায্যে মানবে ভববন্ধন মোচন করিয়া মুক্তিস্থলে উপস্থিত হইতে পারে!! কারণ সেই মুক্তাবস্থাতে শোক নাই, সদা সর্ব্বদা আনন্দ বিরাজ করে; অধিক কি মুক্ত ব্যক্তি, জরা মৃত্যু প্রভৃতি কাহা-তেও ভীত হয় না।

যে পুরুষ আপন আত্মাকে নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত, অন্তর্বাহ্যে সূক্ষ্ম, শূন্যস্বরূপ, অন্য কর্ত্তৃক মিশ্রিত হইতে পারে না, এই ভাবে জ্ঞাত হয়, সেই ব্যক্তিই পাপ হইতে পবিত্র, সুখদুঃখ হইতে অতীত এবং জন্ম-মৃত্যু হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই আত্মতত্ত্বগবতি ব্যতীত সমস্ত ভজন, পূজন প্রভৃতি বিফল হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানশূন্য ব্যক্তি কোন কালে কখনই সুফল লাভ করিতে পারে না;—এ বিষয়ে তন্ত্র বলিতেছেন,—মুণ্ডমালা তন্ত্রেঃ—

"লিপ্যতে ন স পাপেন, বাধ্যতে ন চ কর্ম্মণা।
যথাগ্নির্বিক্রমং স্বর্ণং মালিন্যং দহতি ক্ষণাৎ॥
আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দ্দেবং বিচিন্ত্যতে।
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা ভ্রমণং কাচতৃষ্ণয়া॥
একো দেবশ্চ একোঽহং নাত্মা ভিন্নঃ শরীরতঃ।
ঘটাৎ পটান্মহেশানি কালচক্রান্মহীরুহাৎ॥"

অস্যার্থঃ—যে ব্যক্তির আত্মতত্ত্ব বোধ হইয়া থাকে;—সে ব্যক্তি কখন পাপে লিপ্ত হয় না, কখন প্রারব্ধাদি কর্ম্মে বাধ্য হয় না; অগ্নিতে যেমন স্বর্ণের মলিনতা নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ সেই ব্যক্তির সংসার জনিত বন্ধনদোষ আত্মতত্ত্বজ্ঞানে ক্ষয় হইয়া থাকে।

যেমন নিজহস্তে কৌস্তুভ থাকিতে তাহাকে আদর না করিয়া, কাচের ইচ্ছায় কেহ যদি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, সে যেমন উপহসিত হয়, তদ্রূপ আপনার দেহস্থ দেবতাকে চিন্তা না করিয়া, বাহ্যদেব-তাকে চিন্তা করিলে সে ব্যক্তিও বিফলকর্ম্মা হইয়া থাকে।

আমি ও পরমাত্মা এই শরীরের মধ্যেই এক হইয়া আছি। আত্মা

ভিন্ন আর কিছুই সংসারে নাই, কি ঘট, কি পট, কি কালচক্রসৃষ্ট সংসার, এবং জীবকীট বৃক্ষাদি সকলেই সেই আত্মা হইতে অভিন্ন হইয়া আছে, হে মহেশানি এই বুদ্ধিকেই আত্মতত্ত্ব বোধ কহে।”

আমাদের দেহ ব্যতীত শিক্ষাস্থল আর নাই। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণাদি দেহ এবং তাহার মধ্যে আত্মার অবস্থান ও লীলা প্রভৃতি বোধ করিতে পারিলে, জ্ঞান আপনিই বিকাশ হইয়া থাকে। দেহের অন্তরেই জ্ঞানবিজ্ঞানজনিত সকল শক্তিই বর্ত্তমান আছে। যে ব্যক্তি সাধন বলে সেই সকল শক্তির বিকাশ করিতে পারে, সে ব্যক্তিই আপনার উদ্ধার সাধন করিতে পারে। যে অভ্যাস বা ক্রিয়া বলে ঐ শক্তিগুলি বিকাশ হইয়া থাকে তাহাকেই উপাসনা কহে। ঐ গুলির বিকাশই মানব জন্মের পূর্ণতা। উহা ব্যতীত মানবের আর অন্য ক্রিয়া মানবদেহ ধারণে নাই, এইজন্য উপাসনা ব্যতীত আমরা পশু হইয়া থাকি। কেবল উপাসনার সাহায্যেই আমরা মনুষ্য হইয়া আছি মাত্র। এ বিষয়ে গায়ত্রীতন্ত্র বলিতেছেন,—

“দেহস্থা সর্ব্ববিদ্যাশ্চ, দেহস্থা সর্ব্বদেবতা।
দেহস্থা সর্ব্বতীর্থানি গুরুবাক্যেন লভ্যতে॥

অস্যার্থঃ—এই দেহের মধ্যেই সমস্ত বিদ্যাস্থান বর্ত্তমান আছে এই দেহেতেই সর্ব্ব দেবতার স্থান বর্ত্তমান আছে। সকল তীর্থই এই দেহের মধ্যে বর্ত্তমান। গুরুবাক্যে ও তৎসাহায্যে তাহা লাভ হইয়া থাকে।”

এ বিষয়ে শিবসংহিতা নামে যোগশাস্ত্র বলিতেছেন;—

“দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রানি ক্ষেত্রপালকাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি, বর্ত্ততে পীঠদেবতা॥
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বানি দেহতঃ।
জানাতি যঃ সর্ব্বমিদং স যোগী নাত্র সংশয়ঃ॥

অস্যার্থঃ—এই দেহের মধ্যে সপ্তদ্বীপ সমন্বিত মেরু, সরিৎ, সাগর, শৈল, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রপালকগণ বর্ত্তমান আছে। ঋষি, মুনি, নক্ষত্র, গ্রহ, পুণ্যতীর্থ, পুণ্যপীঠ ও পীঠদেবতা সমূহ এই দেহে বর্ত্তমান আছে। এই ত্রিলোকের মধ্যে যে সকল ভূত বর্ত্তমান, দেহের মধ্যে সেই সকল সদাসর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে; যে ব্যক্তি এই সমস্ত তত্ত্ব অবগত হয়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত যোগী, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপে সমস্ত শাস্ত্রই আমাদের দেহের বাহ্য ও অন্তরের তত্ত্ব পরিজ্ঞা-নের পরামর্শ দিয়া থাকে।

এক্ষণে প্রস্তাবটি অনুভব করিতে সাধ্যানুসারে আমাদের চেষ্টা করা যাউক, কারণ আত্মতত্ত্ব ও অন্তর্দ্দেহতত্ত্ব এত কঠিন যে, বিশেষ ব্যুৎপত্তি ব্যতীত অনুভব হয় না। অথচ কিছু না কিছু অনুভব করিতে না পারিলে সকল নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মও পণ্ড হইয়া থাকে। অতএব এই প্রস্তাবটির আলোচনাই উপাসনাতত্ত্বের প্রধান আশ্রয়। এই প্রস্তাব বোধ না হইলে কি গৃহী কি বৈরাগী কেহই কোন দৈব বা কাম্য অনুষ্ঠান করিয়া ফললাভ করিতে পারে না। অতএব সকলেরই উপযোগী অথচ সংসারের একান্ত উপরতি-কারী এই প্রস্তাবটি হইতেছে। প্রথমে আমাদের দেখা উচিত, আত্মতত্ত্ব কাহাকে বলে? (অততি ব্যাপ্নোতি)=এই ব্যাপ্তি অর্থ হইতে আত্মাশব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। সেই ভগবান যে ভাবে সমস্ত বিশ্বসংসারের চরাচরে চৈতন্যপ্রদাতা হইয়া, সকল কার্য্যের কারণ হইয়া, ব্যাপ্ত ও পূর্ণ আছেন; তাহা বোধ করার নামই আত্ম-তত্ত্ব হইতেছে।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপীত্ব ও সর্ব্ব কারণত্বজ্ঞান অবশ্য বিজ্ঞানভাবের উন্নতিকারী হইতে পারে, কিন্তু উহা জানিলে শোক, তাপ, জরা, মৃত্যু এবং জন্মাদি ক্ষয়ে অমৃত অবস্থা লাভ কেমনে হইতে পারে? যেমন জন্মান্তর ও কর্ম্মতত্ত্ব বিশেষ বোধ বা অন্ততঃ স্বীকার না করিলে ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপরে

ভীষণ সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়; তদ্রূপ আত্মতত্ত্ব অবগত না হইলে, এই জ্ঞান দ্বারা কেমন করিয়া দুঃখ হানি হয়; ইহা না বুঝিলে, ঈশ্বরে শ্রদ্ধা বা উপাসনায় বিশ্বাস উপস্থিত হইতে পারে না। যে সকল বিধর্ম্মী বা উপধর্ম্মিগণ বর্ত্তমান যুগে জগতে বেদ বা স্মৃতির বিরোধী ধর্ম্মপথ প্রচার ও উপাসনার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কর্ম্মবাদ স্বীকার করেন, জন্মান্তর বাদ স্বীকার করেন না, কেহ বা জন্মান্তর ও কর্ম্ম উভয়বাদই স্বীকার করেন না। অস্মদ্দেশীয় নাস্তিক সম্প্রদায়ীগণ কর্ম্ম স্বীকার করেন, জন্মান্তর স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন কর্ম্মকে স্বীকার করিতে অবশ্য হইবে, কারণ, অন্ধ, পঙ্গু, উত্তম, মধ্যম, দুঃখী, ইত্যাদি ভাব যখন জীবে দেখা যায় তখন কর্ম্ম নামে অপূর্ব্বাবস্থা আমাদের অন্তরে ক্রিয়া করিতেছে। সেই কর্ম্মকে বিশুদ্ধ করিতে পারিলেই জন্মের ক্ষয় হইল। সদাচারই তাঁহাদের প্রধান অনুষ্ঠান। তাঁহারা বলেন মরিবার পরে সূক্ষ্মদেহে কর্ম্ম সংসাধন হইতে হইতে অন্তে বিশুদ্ধাবস্থা লাভ হয়।

এই নাস্তিকমতে যদিও যুক্তি ও প্রমাণ বহুতর আছে, তথাপি এক আত্মতত্ত্ববোধ বিহনে এরূপ হইয়াছে। আত্মতত্ত্ববোধে কর্ম্ম ক্ষয় হয়, এ বিষয়টি ইহাদের চিন্তায় মীমাংসিত হয় নাই। আত্মতত্ত্ব আলোচিত হয় নাই বলিয়া ইহা সাধুগণের অনুমোদিত হয় নাই; আত্মা যাহাতে নাই, তাহা কিছুই নহে। এই জন্য বেদ ও স্মৃতিতন্ত্রাদির বহির্ভূত নাস্তিকশাস্ত্র বলিয়া অগ্রাহ্য হইয়াছে। বিদেশীয় বিধর্ম্মপথগুলির মধ্যে খ্রীষ্টীয়, মুসলমানীয় মতই প্রধান, ইহারা উভয়েই জন্মান্তর ও কর্ম্ম স্বীকার করে না। এই জন্য সাধুগণে ইহাদের উপাসনাপথকে প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করেন না। কারণ ইহসৃষ্টির মধ্যে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি, আছে কেহ জন্মমাত্র বা কিছু কাল সংসারে থাকিয়া মরিতেছে। কেহ অন্নকষ্টে দুর্ভিক্ষে, কেহ রোগে জলপ্লাবনে মরিতেছে। যদি ঈশ্বর দয়াময় হইলেন। কর্ম্মানুসারে জীবগণের ঐ সকল ফলস্বরূপ

অবস্থা ভোগ হইতেছে ইহা না স্বীকার করিলে, ঈশ্বরের দয়া কোথায় থাকিল? জন্মান্তর না স্বীকার করিলে, একজন শিশু বহু রোগে মরিল, পুনরায় দেহ ধারণ ব্যতীত যখন তাহার দুষ্কৃতির ক্ষয় অসম্ভব, সেই অবস্থায় মরিয়া সে যদি চিরকাল দেহাতীত ঘোর নরকে পতিত থাকিল, তবে ঈশ্বর তাঁহার প্রতি দয়া কেমন করিয়া দেখাইলেন!! এইরূপ বহু আলোচনায় দেখা যায় যে;—আত্মতত্ত্ব, কর্ম্ম ও জন্মান্তর-তত্ত্ব বোধ বা স্বীকার না করিলে, ঈশ্বরের লীলা বোধ হয় না এবং তাঁহাতে একান্ত প্রীতি আকর্ষিত হয় না। এই জন্য আর্য্যপথ হইতে স্খলিত হইলে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হওয়া অসম্ভব হইয়া থাকে। বেদাতীত কথা মনুষ্য জীবনে প্রকাশ হইতে পারে না। ইহা সত্য। সেই নিয়মে জগতে সকল ধর্ম্মপথ আত্মকল্যাণের জন্য প্রকাশ পাইয়াছে, সকলগুলিতে, আত্মবাদ, কর্ম্মবাদ, জন্মান্তরবাদ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানজনিত অনুষ্ঠানবাদ প্রভৃতির আলোচনা সম্যক্ রূপে স্থান পায় নাই। তাহাদের মধ্যে কেহই এই সকল তত্ত্ব আলোচনা করে নাই। কিন্তু ঐ সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে অনেক লোকে মনুষ্য-স্বভাবসুলভ জ্ঞান পাইয়া, আপনাপন শাস্ত্রকেই যুক্তিহীন মনে করিয়া নিজ নিজ বিজ্ঞানানুসারে মত সংস্থাপন করিয়া মনের চরিতার্থ করিয়া থাকেন। কলিযুগের নিয়মানুসারে লোকের বৃত্তি নীচগতিতে যাওয়াতে আর্য্যরীতির বিরুদ্ধ যে সকল ধর্ম্ম নিয়ম, সেই গুলির উপরে আপাতঃমনোহারী কৌশল দেখিয়া, কতকগুলি ভারতসন্তান তাহাতে মুগ্ধ হইয়া বিদেশী ও বিধর্ম্মমত গুলিকে একত্র করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম এই নাম দিয়া তৎসাহায্যে আপনাদের শান্তি অন্বেষণ করিতে-ছেন। ঐ বিধর্ম্মীয় মূলরীতির অনুসারী পণ্ডিত ও সাধুগণে যখন আপনা-দিগের মূলরীতিকে অসার বলিয়া ত্যাগ করিতেছেন, তখন সেই রীতির অনুসারী হইয়া তাহাদের মতাবলম্বনে কখনই শান্তি আসিতে পারে না, ইহা স্থির হইয়াছে। যে আর্য্যসন্তানগণ বিধর্ম্মমতগুলিকে নিজদেশীয় নাম দিয়া ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহাদের চেষ্টা ও

শ্রম বিফল মাত্র। বিনা আর্য্যরীতি অর্থাৎ আত্মবাদ, জন্মান্তর বাদ, কর্ম্মবাদ, ও কর্ম্মানুষ্ঠানবাদ ব্যতীত যে কেহ ধর্ম্মাচরণ করে বা অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তি কখনই শান্তি লাভ করিতে পারে না। আর্য্যজাতি বা ধর্ম্মী হইলে হয় না। ঐ সকল বাদসহকারে জ্ঞানের আলোচনা ও অনুষ্ঠানের উদ্দীপনা করিতে করিতে অন্তরে যে পরম বিশুদ্ধাবস্থার আবিষ্কার হয়, তাহাকেই পূর্ণমানবাবস্থা কহে। ইহাই আর্য্যশাস্ত্রের গৌরব। আমরাও যে আর্য্যস্থানে জন্মাইয়া সেই আর্য্যরীতির অনুসারী পিতৃগণের ঔরসে দেহ, প্রাণ, মনাদি পাইয়াছি, ইহাই আমাদের প্রধান গৌরব হইতেছে।

একক্ষণে দেখা যাউক আত্মতত্ত্বাবগতি সাহায্যে আমাদের দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি ক্ষয় হয় কি না? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে,—আমাদের ভোগের বা মোক্ষের উপযুক্ত বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি না পাইলেই যে অবস্থার উদয় হয় তাহাকে দুঃখ কহে। এই দুঃখই সংসারের মধ্যে শোক, তাপ, ব্যাধি কাম ও মোহাদির উদয় করিয়া থাকে। এই দুঃখের একান্ত অবস্থা উপস্থিত হইলেই মৃত্যু হয় এবং কর্ম্মস্ফূর্ত্তি পাইবার প্রথম বিকাশকে জন্ম কহে। আত্মজ্ঞান দ্বারা ইহা যদি প্রমাণিত হয় যে, উহাতে কর্ম্ম স্ফূর্ত্তি পায় না, তাহা হইলে জন্ম হয় না প্রমাণিত হইবে। আত্মজ্ঞান দ্বারা যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে, উহাতে পূর্ব্বোক্ত দুঃখ সমূহের একান্ত উপরতি হয়, তাহা হইলে উহাতে দুঃখ ক্ষয় হয় ইহা প্রমাণিত হইবে। যদি দুঃখ ক্ষয়ই হইল, এবং একান্ত দুঃখের নামই যদি মৃত্যু হইল, তাহা হইলে আত্মজ্ঞানে মৃত্যু হইতেও উদ্ধার পাওয়া যায়।

যোগ শাস্ত্র বলিয়াছেন;—একান্ত বিস্মৃতির নামই মৃত্যু হইতেছে। দুঃখ ভোগ করিতে করিতে ক্রমে স্মৃতির বিলয় যে দণ্ডে ঘটে, বুদ্ধি একেবারে লয় যে ক্ষণে হয়, দেহ হইতে তৎক্ষণাৎ আত্মাসংযুক্ত সূক্ষ্ম শরীর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। এই অবস্থাকেই মৃত্যু কহে। যেমন জন্ম, জাগরণ, স্বপ্ন, নিদ্রা প্রভৃতি অবস্থা। সেইরূপ মৃত্যুও একটি অবস্থা বিশেষ মাত্র। যেমন জাগরণাবস্থায় স্বপ্ন ও নিদ্রার চিহ্ন দেখা যায় না,

সেইরূপ জন্মে মৃত্যুর চিহ্ন দেখা যায় না, সে অবস্থার বোধ হয় না। যেমন নিদ্রার পূর্বক্ষণে, জাগরণের শেষে, অল্প তন্দ্রার আবেশ হইতে থাকে, সেই অলসাবস্থায় যেমন জাগরণ জনিত স্মৃতি ও বুদ্ধিক্রিয়ার হ্রাস হয়, সেইরূপ মৃত্যুর পূর্ব্বকালে দেহ থাকিতে থাকিতে স্মৃতির ও বুদ্ধির ক্ষয় হইতে থাকে। যে দণ্ডে দেহের প্রণালীগুলি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, শব্দাদি মনের গোচর হয় না. সেই সময়ে স্মৃতি ও বুদ্ধির একেবারে লয় ঘটিল। দেহ পরিত্যক্ত হইল। ইহাই মৃত্যু হইতেছে। এই দুঃখভোগ ও স্মৃতিভ্রংশ এবং মৃত্যু কেমনে ভোগ্য অবস্থায় ঘটে তজ্জন্য পঞ্চদশী বলিতেছেন ঃ—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

অস্যার্থঃ—পুরুষে বিষয় সমূহের ধ্যান করিলে সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি তাহা হইতে জন্মাইয়া থাকে। আসক্তি হইতে কাম অর্থাৎ ভোগ বাসনা জন্মায়। কামের ব্যবহারে ক্রোধের জন্ম হয়। ক্রোধ ব্যবহৃত হইতে হইতে মোহ প্রকাশ হইয়া থাকে। মোহ দৃঢ় হইলে স্মৃতি ক্ষয় হয়। স্মৃতিক্ষয়ে বুদ্ধিনাশ হয়; বুদ্ধিনাশমাত্রেই পুরুষের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

এই যে বিষয়ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, বিষয় কাহাকে বলে? ভোগের একমাত্র উপায় গুলিকে বিষয় বলে। ইহ সংসারের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি চরিতার্থ হইবার জন্য ঈশ্বর যে পাঁচ অবস্থা বা উপাদান সংসারে রাখিয়াছেন; তাহাকেই ভোগ্যবিষয় কহে। অর্থাৎ কর্ণের শব্দ, চক্ষের রূপ, ত্বকের স্পর্শ, রসনার রস, নাশার গন্ধ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য যে পাঁচটি উপায় অর্থাৎ ভূততন্মাত্রা বা সূক্ষ্ম কারণ; তাহাই আমরা ভোগ করিয়া থাকি। যেমন কোন একটি ফুলের গাছকে টবে বসাইলে তাহাতে নিত্য নিত্য জলসেচন

করিয়া জীবিত রাখিতে হয়, সরস ভূমিতে তদ্রূপ জলসেচনে জীবন রক্ষার প্রয়োজন হয় না। সেই ভগবান এইরূপ কৌশলে দেহরূপী ঘটের মধ্যে আত্মারূপী সত্বাকে দেহীভাবে রক্ষা করিয়া দেহের ও সূক্ষ্ম শরীরের উপাদানগুলি শব্দাদি পাঁচটি উপায় সহযোগে কর্ণাদি প্রণালী দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করাইয়া থাকেন। এই শব্দাদি উপাদান গুলি ভোগ করিবার জন্যই আহার, বিহার, বসন, ভূষণ, অট্টালিকা, আত্মীয়স্বজনের সহবাস ইত্যাদি সংসারে ঘটিয়া থাকে। আমরা অজ্ঞবুদ্ধিতে দেখি সুখের সংসারে না জানি কি অপূর্ব্ব সত্বাই আছে, কিছুই নহে, কেবল ঐ ভূতের ও মনের উপাদান মাত্র গ্রহণ ঘটিয়া থাকে। কেবল তৎসহযোগে পাঁচটি ইন্দ্রিয় সহযোগে মনের স্ফূর্ত্তি হয় মাত্র। এই সকল বিষয় ধ্যান অর্থাৎ একাগ্রভাবে ব্যবহার করিতে করিতে আসক্তি প্রভৃতি জন্মায়। পূর্ব্বশ্লোকে দেখান হইল যে, এই আসক্তি হইতে কাম অর্থাৎ দারুণ ভোগ তৃষ্ণা জন্মায়। এই ভোগ তৃষ্ণার ব্যাঘাৎ হইলেই ক্রোধের উদয় হইয়া থাকে। ক্রোধে ভোগ করিতে করিতে ভোগ্য বিষয়ে এত আসক্তি জন্মায় যে, যাহাতে ঐ ভোগ্য বিষয় আর কাহারো দ্বারা না বঞ্চিত হয় এমন ভাবে দিবানিশি মনকে বিষয়ে অনুরত করিতে যে অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহাতে জ্ঞান প্রকাশ পায় না, ঘোর অজ্ঞান বিকাশ পাইয়া থাকে, এই জন্য এই অবস্থাকে মোহ কহে। মোহ যত বৃদ্ধি পায় স্মৃতি তত ক্ষয় হয়, স্মৃতি ক্ষয় হইলেই বুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া যায়। বুদ্ধি ও স্মৃতি মনোরাজ্যে ক্রিয়মান না থাকিলেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থাটি বিশেষ করিয়া বুঝা উচিত বিধায়ে পুনরায় আলোচনা হইতেছে। মৃত্যুর প্রাক্‌কালে অর্থাৎ মুমূর্ষু অবস্থা এবং অতি শিশু অবস্থা প্রায়ই এক। কারণ উভয় অবস্থাতেই ইন্দ্রিয় প্রণালী ইন্দ্রিয়শক্তিধারণে অক্ষম হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়শক্তি থাকে না বলিয়া ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়-গুলিও গৃহীত হয় না। বিষয়গুলি গ্রাহ্য হয় না বলিয়া উভয় অবস্থায় স্মৃতি ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটে না। যেমন একটি অবস্থা ঘটিবার পূর্ব্বে

ও পরে সেই অবস্থার পরিচয় লক্ষণ দ্বারা স্থির হয়। অর্থাৎ মেঘোদয় ও বর্ষণের পূর্ব্বভাগে যেমন আকাশ অন্ধকার এবং প্রকৃতি ঘোরভাবসম্পন্ন হয়, বর্ষণের শেষেও কিয়ৎকাল সেই অবস্থা দেখা যায়, সেইরূপ মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ ও জন্মের পরক্ষণ দেখিয়াই পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন মৃত্যু কেবল স্মৃতি ও বুদ্ধিভ্রংশের কারণ ঘটিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় প্রণালীগুলিকে সতেজ, ইন্দ্রিয় শক্তি গুলিকে সচেতন রাখিলে স্মৃতিও বুদ্ধির ক্ষয় হয় না এবং মৃত্যু নামে অজ্ঞানাবস্থা আসে না। দেহ ত্যাগ করিলেও স্মৃতিপূর্ণ থাকা যায়। এখন আমরা বুঝিলাম এই যে—দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু এই তিন অবস্থা একা আত্মা দেহে আছে বলিয়া মনোময় সূক্ষ্ম দেহের ঘটিয়া থাকে। আত্মাশূন্য সৃষ্টির এরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটে না। শব্দ স্পর্শাদিই হউক বা মনোময় দেহের চেতনাবস্থা কয়েকটি অর্থাৎ স্মৃতি, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার ইত্যাদি যে কিছুই হউক, এক আত্মার চৈতন্য সাহায্যে দেহে সুশোভিত রহিয়াছে। যে সকল সৃষ্ট অবস্থায় আত্মার সহিত ভোগ্য বিষয় গুলি নাই, আমরা তাহাকে আদর করি না।

আমরা জগতেরদিকে যদি মনোনিবেশ করি দেখিতে পাই কি? অনন্ত আকাশ, অনন্ত দিঙ্মণ্ডল অনন্ত নদী, গিরি, অরণ্য, পর্ব্বত; বৃক্ষ লতা, ফলফুল, পশু, পতঙ্গ ইত্যাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা আনন্দ পাই কিসে? অবস্থা বিশেষে শব্দে, স্পর্শে, রূপে, রসে, গন্ধে!! এই অসীম সংসারের মধ্যে এই শব্দাদি বিষয়গুলি স্থূল ও সূক্ষ্ম এই উভয় অবস্থাতেই ভোগ হইয়া থাকে। পার্থিব শব্দাদিকে স্থূল বিষয় কহে। ইঙ্গিত ও কাম, স্নেহ, মমতা প্রভৃতিকে সূক্ষ্ম বিষয় কহে। যাহাতে আত্মা নাই, এরূপ সৃষ্ট পদার্থে ঐ স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ বিষয় বিকাশ হয় না। যেমন পুষ্প দেখিতে সুন্দর; সুখস্পর্শ আছে, সুগন্ধ আছে; সুরস আছে। এই সৌন্দর্য্যাদি যতক্ষণ তাহাতে থাকে, ততক্ষণ আমরা পুষ্পের আদর করি। সর্ব্বাঙ্গের ভূষণ করি। দেবতাকে সাজাই; রমণীয় বস্তু মাত্রকে সাজাইয়া থাকি। সেই পুষ্প যদি বৃন্তচ্যুত হইয়া

শুষ্ক হইয়া যায়, আর কি তাহার আদর আমরা করিয়া থাকি !! কিসের অভাবে তাহার হতাদর হইল !! একমাত্র আত্মশক্তি লতা বা গুল্মের মধ্যে যখন ছিল, তখনই তাঁহার সহযোগে পুষ্পের এত শোভা বিকশিত হইতেছিল। যে সময়ে উহা বৃন্তচ্যুত হইল। বৃক্ষের আত্মশক্তির সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটিল। তাহার শোভা ক্ষয় হইল, আমরা অনাদর করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলাম। এমন যে পুত্র, কন্যা, রমণী, জনক, জননী যাঁহাদের রূপ, গুণ, স্নেহ মমতায়; আমরা দিবানিশি উন্মত্ত থাকি, যাঁদের কান্তিতে আমরা স্বর্গসুখ উপভোগ করি। তাঁহাদের দেহ হইতে যে দণ্ডে আত্মবস্তু বা সূক্ষ্ম শরীর ক্ষয় বা পৃথক হয়, অমনি আমরা সেই প্রাণাপেক্ষা আদরের ও সম্মানের পদার্থগুলিকে শ্মশানে দাহ করিয়া থাকি। এক আত্মাই যখন তাঁহাদের ছিল, তখনি তাঁহাদের আদর ছিল, আত্মাহীন সেই আদরের বস্তু তুচ্ছ হইয়া গেল। অতএব আমরা জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক, আমরা আত্মার আদরই করিয়া থাকি। এই অনন্ত দুঃখসংকুল সংসারে আর্য্যঋষিগণ গার্হস্থ্যাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন কেন? ইহা বুঝিতে হইলে বেশ বুঝা যায় যে;— মানবের পশুভাব সম্পন্ন হৃদয়কে আত্মজ্ঞানে মণ্ডিত করিবার জন্য ফল, ফুল, পুত্র, কন্যা, জনক, জননী, প্রভৃতির রূপে, রসে উন্মত্ত হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। যখন সকল শোভার একমাত্র প্রকাশক ও কারণ স্বরূপ আত্মাকে প্রবৃত্তিমার্গে বোধ হইবে, মানব তখন একে একে উপাদানের মধ্যগত আত্মসুখানুভূতি ত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ আত্মানুভূতি করিতে উদ্যত হইবে।

আমরা এই প্রবৃত্তিপ্রবণ যুক্তির দ্বারা বুঝিলাম এই যে;—আমরা যে সকল বিষয়ে উন্মত্ত হই, তাহার মূল কারণ আত্মা হইতেছে। ভোগ্য বিষয়গুলি ভোগ করিতে করিতে আমরা যদি আত্মদর্শী না হই, তাহা হইলে, পশুভাব সমন্বিত কামাদি আসিয়া আমাদের অভিভূত করে। ঐ কামের ব্যাঘাতে ক্রোধ, ক্রোধাভিভূত হইতে হইতে মোহ, মোহাভিভূত থাকিতে থাকিতে স্মৃতিক্ষয়, স্মৃতিক্ষয়

হইতে হইতে বুদ্ধিক্ষয় হইলেই দেহান্তর লইতে হয়। এইরূপে বারম্বার জন্ম ও বিষয় ভোগ যতই করিব ততই জন্মান্ত ও দুঃখ আমাদের ঘটিবে, কিন্তু সুখের সংসারে সকল ভোগ্য বস্তুর একমাত্র কারণ যে আত্মা, ইহা যতক্ষণ আমরা না বুঝিব, ততক্ষণ আমাদের ভোগ নিবৃত্তি হইবে না। ভোগ নিবৃত্তি না হইলে জন্ম ও দুঃখ নিবৃত্তি ঘটিবে না।

যদি কাহারো মনে এরূপ সন্দেহ হয় যে সুখের সংসারে সুখ ও শোভাময় পদার্থপ্রপঞ্চ [illegible] করা যায়, এই জন্যই সুখ অনুভব হয়। এই অনুভূত সুখ [illegible] সু ভোগ না হইলে কখনই মানবে উপস্থিত ভোগ্য সুখ [illegible] পারে না। পদার্থপ্রপঞ্চ ইন্দ্রিয় গোচরীভূত। আত্মা [illegible] হইতেছে। অতএব আত্মবোধে অতিমাত্র সুখ কেমন [illegible] হইতে পারে? তদুত্তর এই যথা,—পূর্ব্বপ্রমাণে দে[illegible]হ, বিষয়গুলি অন্তর্বৃত্তিগুলির দ্বারা নির্ব্বাধে ভোগ হইলেই সুখ [illegible]। সেই বিষয়গুলির সুখ প্রদানকারী ক্ষমতাই একমাত্র আত্মা হইতেছেন। আত্মাই তাহাদের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যাহাতে শোভা ও সুখ নাই, সে বস্তু কখনই অন্য সত্ত্বাকে সুখ বা শোভাতে পরিপূর্ণ করিতে পারে না; যেমন অঙ্গারস্পর্শে অঙ্গার কখনই অগ্নিময় হইতে পারে না। মৃতাযুবতী কখনই কামোদ্দীপনে সক্ষম হয় না, মৃত সন্তান কখনই স্নেহ বর্দ্ধন করিতে পারে না। সেইরূপ আত্মাতে আনন্দ স্বরূপ পরম বিশুদ্ধ স্বভাব বা গুণ বর্ত্তমান আছে, এই জন্য আত্মসম্পর্কীভূত পদার্থ বা বিষয়প্রপঞ্চ ভোগে সুখ উপস্থিত হইয়া থাকে এবং সেই সুখবিধানকারী প্রপঞ্চ সমূহ আত্মসম্পর্কে সুখমূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে। অতএব যে আত্মার স্পর্শে সকল সুখের বিকাশ পদার্থে দেখা যায়, তাহার বিশুদ্ধাবস্থা না জানি কতই সুখকর। এইজন্য আর্য্যঋষিগণ বলিয়াছেন, সমস্ত ভোগ হইতে আত্মাকে দর্শন কর, আত্মাকে শ্রবণ কর, সেই আত্মাকে মনন কর, সংসার তাপ হইতে

নিষ্কৃতি পাইবে! আত্মজ্ঞান সহযোগে প্রবৃত্তিপূর্ণ সংসার ভোগ করিলেও অন্তে নিবৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এই জন্য ঘোর বিষয়ী সংসারী হইতে ঘোর বৈরাগী পর্য্যন্ত সকলেরই আত্মবোধ আবশ্যক হইতেছে। সুখের আবির্ভাব হইলে দুঃখের হানি হইয়া থাকে, ইহা চিরসিদ্ধান্তিত আছে। এই প্রমাণে আত্মতত্ত্ববোধে যে দুঃখের একান্ত ক্ষয় হয় তাহা মীমাংসিত হইল।

আত্মবোধ উপস্থিত হইলে মৃত্যু নিবারিত কেমন করিয়া হয়, তাহা এক্ষণে যথা সম্ভব প্রমাণ করিতেছি। আমরা স্বভাবতঃ আমাদের শক্তি ও শান্তি যখন অনুভব করিয়া থাকি, তখনি আমরা সুখে জীবন ধারণ করিয়াছি বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্ব প্রমাণে বলা হইয়াছে, যে ভাবে সুখে দেহভোগ হয় তাহাই মানব জন্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য হই তেছে। জন্মের পর শিশুকাল হইতে মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা দেহের অবস্থা বিচার করিলেই এই অবস্থাটি বোধ করিতে পারিব। শিশুগণ বাক্‌শক্তি সম্পন্ন পিতা মাতার আদর ও সম্বোধন শুনিলে অস্ফুটধ্বনিতে যখন বাক্‌শক্তি প্রকাশের ইচ্ছা করে, গমন দেখিলে গমন করিতে ইচ্ছা করে, গ্রহণ দেখিলে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, আহার দেখিলে আহারে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে। শরীরের প্রণালীগুলি শিশুকালে স্ফূর্ত্তিমান্ থাকে না বলিয়া, শিশু চেষ্টা করিয়াও ঐ সকল উপভোগ করিতে পারে না। এই শিশুকালে উপভোগেচ্ছাই পূর্ব্বকর্ম্মেরও গুণগণের বিকাশক। যখন ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি বিকাশিত নাই, ইচ্ছা থাকিতেও ইচ্ছা পূর্ণ হয় না, তখন আমাদের বুঝিতে হইবে যে;—ইন্দ্রিয় ও জ্ঞান শক্তিগুলি দেহে স্ফুট হইলেই আমরা সুখ উপভোগ করিয়া থাকি। জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বল, বীর্য্য, শক্তি ও তেজ, ইন্দ্রিয় পটুতা যে সময়ে আমরা উপভোগ করিতে পারি, সেই অবস্থাটিই আমাদের সুখের হইতেছে। এই পরিপূর্ণ অবস্থা শিশুকালে ভোগ হয় না; বার্দ্ধক্যের প্রারম্ভেও মধ্যে ভোগ হয় না। কেবল যৌবনে অবস্থা বিশেষ ভোগ হইয়া থাকে। এক কথায় বুঝিতে হইলে আমা-

দের ইহাই স্থির করিতে হইবে যে, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, ভূতদেহ, সূক্ষ্মদেহ, ইন্দ্রিয়প্রণালী, ইন্দ্রিয়শক্তি, প্রাণশক্তি প্রভৃতি যে অবস্থায় দেহে পূর্ণ বিকাশ থাকে, সেই অবস্থাটিই আমাদের সুখের বলিয়া বোধ হয়।

শিশুকালে ঐ সকল বৃত্তির অভাব বলিয়া সুখ ভোগ হয় না। যৌবনে ব্যাধি, শোক, তাপ ইত্যাদিতে অধিক ক্লিষ্ট হওয়া যায় বলিয়া সুখ ভোগ হয় না। ঐ সকল বৃত্তি বার্দ্ধক্যে দেহে বিশেষ বিকাশ থাকিতে পারে না বলিয়া সুখ হয় না। ঐ বৃত্তিগুলির বিশেষ স্ফূর্ত্তিই যখন সুখের হইতেছে, তখন যে অবস্থায় ঐ গুলি শৈশব, বার্দ্ধক্য, ব্যাধি, শোক, তাপ প্রভৃতির অধিকার হইতে স্বাধীন থাকে, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, ইহা যদি ঘটাইতে পারা যায় তাহা হইলে মানব দুঃখাতীত হইবেই হইবে।

আমরা শৈশব হইতে যৌবন কাল পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই যে:—যতই আমরা ভোগ সংসারের ভোগ্য বিষয়গুলি শিশু কাল হইতে ভোগ করিবার জন্য অনুধ্যান করি, ততই আমাদের ভোগশক্তিগুলি শরীরে বিকশিত হইতে থাকে। দেখিব বলিয়া শিশু দৃষ্টির অনুধ্যান বা ইন্দ্রিয়যোগ করিতে করিতে দৃষ্টিশক্তি পাইয়া থাকে। আহার, গমন, গ্রহণ ইত্যাদিও শিশু অনুধ্যান ও চেষ্টা করিতে করিতে লাভ করিতে থাকে। এই সকল বৃত্তি যত বর্দ্ধিত হয়, ততই দেহের বিকাশ ঘটে, যে দিন বিষয় ভোগ করিতে করিতে জ্ঞান, বুদ্ধি, বল, বীর্য্যকে ক্ষয় করিতে আরম্ভ করা যায়, সেই দিন হইতে জরা আসিয়া দেখা দেয়। ইহাতে প্রমাণ হইল যে, ঐ সকল বৃত্তির বিকাশ ও বর্দ্ধনাবস্থা শিশুত্ব ও বার্দ্ধক্যের প্রতিরোধক। শিশুত্ব ও বার্দ্ধক্য উভয়ই অজ্ঞানাবস্থা হইতেছে। এই প্রমাণে দ্বিতীয়তঃ বুঝান হইলে যে, শিশুত্ব ও বার্দ্ধক্যের প্রতিরোধক হইলে ঐ বৃত্তিগুলি পূর্ণজ্ঞানময় অবস্থার বিকাশক হইতেছে। ইহাতে আরো দেখান হইল যে, ঐ বৃত্তিগুলিকে সবল ও স্ফূর্ত্তিমান্

রাখিতে পারিলে পূর্ণজ্ঞানময় থাকা যায়। শিশুত্ব, ও জরার হানি হইলে মৃত্যুহস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। পূর্ণজ্ঞানময়ত্বই মৃত্যু-হানিকর অবস্থা হইতেছে। জ্ঞানই মৃত্যু, শোক, তাপ প্রভৃতি হানি করিয়া থাকে। সেই জ্ঞানময় অবস্থাই পরিপূর্ণ সুখের এবং উহাই নিত্য হইতেছে। এই অবস্থাই মানবদেহের প্রধান উপার্জ্জনের বস্তু হইতেছে। এক্ষণে দেখা যাউক্ আত্মার সহিত এই জ্ঞানময় অবস্থার সম্পর্ক কি? পূর্ব্ব প্রমাণে আমরা দেখাইয়াছি যে;—তত্ত্ববিদ্পণ্ডিত-গণে কহেন; বৃন্তচ্যুত পুষ্পের শোভাসৌন্দর্য্য থাকে না, মূল ছিন্ন বৃক্ষের বদ্ধনাদি জীবনী শক্তি থাকে না।

পুত্রের, পিতামাতার মৃতদেহ হইলে ও আত্মাশূন্য হইলে, আর তাহার সমাদর থাকে না। ইহাতে দেখান হইল যে; যতক্ষণ আত্মা পদার্থে বর্ত্তমান ততক্ষণই দেহে সকল বৃত্তির স্ফুরণ, প্রকাশ ও ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে। যতক্ষণ উহাদের বিকাশ ও ক্রিয়া, ততক্ষণই সেই পদার্থের সমাদর ও শোভা বর্ত্তমান থাকে। যেমন একটি গৃহে নীল, পীত, লোহিতাদি মনিগণ সুসজ্জিত থাকিলে, তথায় একটি দীপজ্যোতিঃতে প্রতি মণির বর্ণানুসারে নীল, পীত, লোহিতাদি জ্যোতিঃ একত্রে প্রকাশ হয়। সেইরূপ দেহগৃহের মধ্যে সুখ প্রকাশকারী অনন্ত বৃত্তি আছে,—এক আত্মজ্যোতিরূপী চৈতন্যের প্রতিফলন মাত্রেই উহাদের বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি ঘটিয়া থাকে। অতএব আত্মাই ঐ সুখ ও জ্ঞান প্রকাশকারী বৃত্তিগুলির প্রকাশক ও চৈতন্যপ্রদাতা হইতেছেন। ঐ বৃত্তিগুলি বিকশিত থাকিলে যখন, স্মৃতি ও বুদ্ধির ভ্রান্তি হয় না তখন মৃত্যু ও দুঃখ ঘটে না। আত্মচৈতন্যের মিলনেই যখন ঐ সকল অবস্থার বিকাশ, আত্মার অভাবে যখন উহাদের হ্রাস ও লয়; তখন এক আত্মাই উহাদের প্রধান উপাদান হইতেছে।

বিষয়ের অনুধ্যানে কাম ক্রোধাদির আবির্ভাবে পশুভাবের বিশেষ বিকাশ হয় বলিয়া মানবোচিত বৃত্তিগুলি বিকাশ পায় না। যৌবনের পরে সেই জন্য মানবোচিত বৃত্তিগুলি ক্ষয় হয়, ক্ষয় হয় বলিয়া তাহাকে

জরা কহে। একথা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। বিষয়ের অনুধ্যানে যখন জ্ঞান বুদ্ধি আবৃত ও ম্লান হইলে জরা, ব্যাধি, শোক, তাপ প্রভৃতি আসিয়া দেহকে নষ্ট করে এবং আত্মার সত্বায় যখন সেই সঞ্জীবনী বৃত্তি গুলি জীবকে সচেতন রাখে; তখন আত্মার অনুধ্যান বলেই সেই সকল বৃত্তি অধিকতর স্ফূর্ত্তিশীল হইয়া উঠে। বৃত্তিগুলি বিশেষ বিকশিত থাকিতে জরা, ব্যাধি ও অজ্ঞানাদি যখন অধিকার করিতে পারে না, তখন আত্মতত্ত্ববোধে দুঃখ ক্ষয় হইবে একথা কে না স্বীকার করিবে! বৃত্তিগুলি বিশেষ বিকশিত থাকিলে যখন বুদ্ধি ও স্মৃতি ক্ষয় হয় না, এবং বুদ্ধিস্মৃতি পূর্ণ থাকিতে যখন দেহের ক্ষয় হয় না, তখন আত্ম-বোধ দ্বারা নিশ্চয়ই মৃত্যুর গ্রাস হইতে উদ্ধার হওয়া যায়!! যে মৃত্যু সকল জীবের ভয়প্রদাতা, যে মৃত্যু সকল সংসারের সংহারকর্ত্তা, এক আত্মতত্ত্ববোধে, যদি সেই জন্ম, জরা, ব্যাধি, তাপ ও মৃত্যু হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তবে কি না লাভ হইল। মর্ত্ত্য জীব আত্মতত্ত্ব বোধে জীবন্মুক্ত ও শিব হইল, পরম কল্যাণ লাভ হইল। এই আত্মতত্ত্ব বোধ একমাত্র উপাসনা বলেই হইয়া থাকে। অতএব উপাসনা মানব মাত্রেরই পূজনীয়া হইতেছেন।

সকল তত্ত্বজ্ঞানই অনুধ্যান বলে বিকশিত হইয়া থাকে, অনুধ্যান বলে যে, শক্তির আবেশ হয় এ কথায় অনেকের সন্দেহ হইতে পারে। তজ্জন্য যথাসাধ্য দুই চারিটি প্রমাণ দেখান হইতেছে। যোগশাস্ত্র এবং সমস্ত দর্শন শাস্ত্রই বলেন যে:— অনুধ্যান বলেই সকল বৃত্তির ও সত্বার বিকাশ সংসারে হইয়া থাকে। স্থাবর জীবে যদিও দেখা যায় না, কিন্তু জঙ্গম জীবে বিশেষ দেখা যায়। ব্যাঘ্র কোন পশু হিংসা করিবার অগ্রে আপনার হিংস্রবৃত্তির অনুধ্যান কিছু ক্ষণ করিলে তবে হিংসা বৃত্তির বিকাশ হইয়া থাকে। বহু দূর আকাশস্থিত কোন পক্ষী ভূতলস্থ আহার দেখিয়া অনুধ্যান বলে উর্দ্ধ হইতে অধো দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। গর্ভের অনুধ্যানবলে মৎস্য প্রভৃতি বহু প্রাণীর গর্ভ হইয়া থাকে। অনুধ্যান বলে মূর্খ ভাষাতত্ত্ববিৎ হয়। শিশু

যৌবন লাভ করিয়া থাকে। অনুধ্যান বলে কামক্রোধাদির আবেশ হয়। দুঃখ, সুখ ভোগ হইয়া থাকে। এই নিয়মে অনুধ্যান ব্যতীত সংসারে জীবের কোন শক্তিই বিকাশ হয় না। যেমন কামশক্তির বলে জীবে অধিক কামী হয়, যেমন ভোগেচ্ছার অনুধ্যানে জীবে অধিক ভোগী হয়। সেইরূপ আত্মবস্তুর অনুধ্যানে আত্মচৈতন্য বিশেষরূপে মনোজগতে স্ফুর্ত্তি পাইয়া থাকে। এই অনুধ্যানক্রিয়াই উপাসনা নামে পণ্ডিতগণ সংসারে মানবের পক্ষে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যেমন ভ্রমরের অনুধ্যানে তৈলপায়ীকীট ভ্রমরকৃষ্ণত্ব লাভ করিয়া থাকে, কোন খুনী ব্যক্তির হৃদয়ে হত ব্যক্তির চিত্র অনুধ্যান-বলে বহুকাল চিত্রিত থাকায়, তাহার চিহ্ন যেমন চক্ষে ও ললাটে দেখা যায়। সেইরূপ আত্মবস্তুর অনুধ্যানে আত্মা হৃদয়ে দিবানিশি বিকশিত থাকেন।

যেমন মলিন ও কম্পিত জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পতিত থাকিলেও সুগোচর হয় না; সেইরূপ বিষয় হিল্লোলে ও ভোগপঙ্কে মলিন হৃদয় সলিলে আত্মচৈতন্য সদা বর্ত্তমান থাকিতেও বোধ হয় না। যেমন বিশুদ্ধ, স্বচ্ছ ও প্রশস্ত সরোবরে চন্দ্রের সুন্দর মূর্ত্তি সুন্দররূপে দেখা যায়, সেইরূপ উপাসনায় বিধৃত পবিত্র হৃদয়ে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিগুলি স্ফুর্ত্তিশীল থাকে বলিয়া আত্মদর্শনে জীব মুক্ত হইয়া থাকে।

অথ লিঙ্গ বা সূক্ষ্মশরীরতত্ত্ব।

ইতিপূর্ব্বে আমরা মানবদেহের উৎকর্ষ দেখাইয়াছি। কর্ম্ম ও আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন কি, তাহাও দেখাইয়াছি। উপাসনায় অধিকার বুঝিবার জন্য যে সকল অবস্থার বিশেষ আলোচনা আবশ্যক, যে সকল তত্ত্ববোধ ব্যতীত উপাসনার সম্যক্ ফললাভ অসম্ভব এ কথা

বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি। এই প্রস্তাব হইতে আমরা সাধন-মার্গের কথা বলিতে আরম্ভ করিব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ;—কাল, কর্ম্ম, স্বভাব, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া ; এই সূক্ষ্ম অবস্থাগুলি একত্র হইলে তবে একটি জান্তবদেহ সংসারে প্রকটিত হয়। যে শক্তির দ্বারা কর্ম্মাদি পাঁচটি সংকলিত হইয়া ভৌতিক দেহ প্রকটিত হয় তাহাকে কাল কহে। পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত অদৃষ্টভোগকে কর্ম্ম কহে। সেই কর্ম্ম তৃপ্তি বা পূর্ণ হইবার জন্য যে বৃত্তি মনাদি প্রাপ্ত হয়, যথা মৎস জলে থাকিতে, পক্ষী আকাশে উড়িতে, মানবে দুঃখ নাশ করিতে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, নিদ্রা ইত্যাদিকে চরিতার্থ করিতে যে বৃত্তি স্বতঃ অন্তরে বিকশিত থাকে তাহাকে স্বভাব কহে। ভৌতিক উপাদানকে দ্রব্য কহে। স্বভাব অনুসারে অবিদ্যা অর্থাৎ বিশ্বের ভোগপ্রদানকারিণী মায়াশক্তি যে ভাবে, জীবের মনাদিকে গঠন করে; সেই সত্ব, রজো ও তমোভাবকে গুণ কহে। ইন্দ্রিয় শক্তি-গুলিকে ক্রিয়া কহে। এই ছয় সূক্ষ্ম অর্থাৎ ভৌতিক নহে অথচ নিত্য চৈতন্যসংশ্লিষ্ট, জন্মের কারণস্বরূপ, অবস্থা কয়টি দেহের মধ্যে সম্মি-লিত হইলে উহাদের সাহায্যে দেহের অন্তরে যে প্রকৃত ও ক্রিয়মান্ গঠন প্রকাশ হয় তাহাকে সূক্ষ্মশরীর কহে। স্থূল অনুভবের নহে, দৃষ্টি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে, কেবল সূক্ষ্ম মনের গোচর হয় মাত্র। এই জন্য দেহান্তরে ক্রিয়মান্ এই অবস্থাকে সূক্ষ্ম শরীর কহে।

ইহার আর একটি নাম লিঙ্গ শরীর হইতেছে। লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন বা জ্ঞান ; ঐ সূক্ষ্ম অবস্থার পরীক্ষায় বা জ্ঞানে আত্মার, কর্ম্ম, জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ ইত্যাদি বোধ হয় বলিয়া উহাকে লিঙ্গ শরীর কহে। এই লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীরই ভোগের কারণ হইতেছে অর্থাৎ জীবজন্মের প্রধান উপাদান। কর্ম্মানুসারে ইহাদের স্ফূর্ত্তি ঘটিয়া থাকে। সেই কর্ম্ম ও স্বভাবকে বিশুদ্ধ করিবার জন্যই উপাসনার প্রয়োজন হয়। যে যে আধারে ঐ কর্ম্মাদি প্রকাশ থাকে, তাহার বিশুদ্ধি সাধন করিতে পারিলেই কর্ম্ম ও স্বভাবের বিশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। যেমন স্বর্ণে

মলিনতা থাকিলে, সেই স্বর্ণকেই বারম্বার দগ্ধ করিলে স্বর্ণ থাকে, মালিন্য দূর হয়। যেমন পারদে অন্য ধাতু মিশ্রিত স্বর্ণ ও রজতাদি নিক্ষেপ করিলে ধাতুগুলি ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পরস্পর বিযুক্ত হয় এবং পরস্পর বিশুদ্ধ হয়। সেইরূপ উপাসনা দ্বারা অন্তরের বৃত্তিগুলিতে শোধন করিতে পারিলেই সেই বৃত্তিগুলির কারণস্বরূপ কর্ম্মাদি শোধিত হইয়া থাকে। আমাদের দেহভাগের প্রধান করণীব বৃত্তিগুলি সমস্তই সূক্ষ্ম অথচ দৃষ্টি ও বাহ্য গোচরীভূত নহে। সেই বৃত্তিগুলির পরিচয় প্রথমে না পাইলে সাধনতত্ত্ব প্রকাশ কালে সেই বৃত্তিগুলিকে যে সকল মন্ত্রে বা উপকরণে শোধন করিবার কথা বলা হইবে, তাহা বোধ হইবে না। এই সূক্ষ্মশরীরতত্ত্বজ্ঞানে দুইটি উপকার হইয়া থাকে, প্রথমতঃ লিঙ্গশরীর মধ্যে যে ভাবে বৃত্তিগুলি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে ব্যাপৃত আছে তাহা বোধ হয়, তাহা বোধে এমন একটি ধারণা হয় যে, ভোগটি আর কিছুই নহে, কেবল কতকগুলি অন্তরেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া মাত্র। বাহ্যদেহও ক্রিয়মান্ এবং অন্তর্দ্দেহও ক্রিয়মান্, এই উপায়ে সকল অবস্থাকে ক্রিয়মান্ বোধ হইলে দেহবাদ বোধ হয়। এই অবস্থায় ক্রিয়মান্ অবস্থা ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয় ও চৈতন্যময় অবস্থা অনুভব করিবার জন্য স্পৃহা জন্মায়। চৈতন্যাবস্থা অনুভবে স্পৃহা হইলেই বৈরাগ্য ও বিবেক আপনি উপস্থিত হয়। তদুদয়ে বিশুদ্ধি ঘটিলে চিত্ত স্থির হইয়া থাকে।

লিঙ্গশরীরজ্ঞানের দ্বিতীয় উপকার এই যে;—মনাদি, ইন্দ্রিয়াদির কারণ; ভূতাদির গতি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয় ও কামাদির আবৃত্তি বোধ হইলে, তাহা হইতে রোগ, শোক ও মোহাদি কেমন করিয়া উদয় হয়, তাহা অনুভব হইয়া থাকে। অতএব লিঙ্গশরীরজ্ঞান সকলেরই প্রয়োজনীয় হইতেছে। কি বৈরাগী, কি মহাভোগী সংসারী, লিঙ্গ শরীরজ্ঞানে সকলেরই উপকার হইয়া থাকে।

এই সূক্ষ্ম শরীর পরিজ্ঞানের জন্য তত্ত্ববিৎ সাধুগণে বহু উপায় দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র ও পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেই

এই কয় অবস্থাকে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। অষ্ট পুরী, সপ্তদশ অবয়ব, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব এই কয়টিই কর্ম্ম ও স্বভাবাদ দ্বারা এই ভৌতিক দেহের কারণ রূপে বর্ত্তমান। ইহাতে যোলটি বিকার আছে, আটটি প্রকৃতি আছে, দশটি কোষ আছে, চারিটি অবস্থা বা পরিবর্ত্তন আছে। পুরী, অবয়ব, তত্ত্ব, বিকৃতি, প্রকৃতি, কোষ ও অবস্থা কয়টি পরিজ্ঞাত হইলেই সূক্ষ্ম শরীরের সমস্ত অর্থাৎ প্রধানতঃ সমস্ত পরিজ্ঞান হইয়া থাকে। ইহা কেবল মানব দেহে পূর্ণ আছে। যাঁহারা কেবল মাত্র অষ্টপুরীকে সূক্ষ্ম কহেন তাহাদের কথা এই যথাঃ—

"খংবায়ৃগ্ন্যম্বুরিত্র্যশ্চ ভূতসূক্ষ্মানি পঞ্চ চ।
অবিদ্যাকামকর্ম্মাণি লিঙ্গং পুর্য্যষ্টকং বিদুঃ ॥"

অর্থঃ—আকাশ বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এই পঞ্চ ভূতের সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রা। অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ এবং অবিদ্যা, কাম অর্থাৎ বাসনা ও কর্ম্ম এই তিন একত্রে সংযুক্ত অষ্ট স্বভাবে যে পুরী নির্ম্মাণ করে তাহাকে অষ্টপুরী সংযুক্ত লিঙ্গদেহ কহে।

সুরেশ্বরাচার্য্য নামে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে এক যোগী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বেদান্তের সপ্তদশাবয়বকে সহজ করিয়া শিষ্যশিক্ষার্থে এইরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তন্ত্রেব কোন কোন স্থলেও ইহা দেখা যায়। এই ভূতসূক্ষ্মপঞ্চকের সহিত বেদান্তের বিরোধ নাই। অবিদ্যা অর্থাৎ মায়ায় জড়শক্তি হইতেই ভূতশক্তি ও মনোশক্তির আবির্ভাব। কর্ম্ম ব্যতীত মনাদির বিকাশ হয় না, মনাদি হইতে বাসনার বিকাশ। এই নিয়মে এই অষ্টপুরী বুঝিলে সূক্ষ্মদেহ বুঝা হয়। এই যে তন্মাত্রা কয়টির কথা বলা হইল, ইহাদের অগ্রে বুঝা উচিত হইতেছে। যে সকল শক্তির আবির্ভাবে ক্রমে ক্রমে স্থূলভূতের বিকাশ হয়, তাহাকে তন্মাত্রা কহে। যেমন একটী বীজ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তাহাতে বৃক্ষ বোধ হয় না। যখন সেই বীজ বৃক্ষ বা অঙ্কুরে পরিণত হয়, তখনই আমরা বৃক্ষাদি দর্শন করিয়া থাকি। সেই

বীজ কীট দষ্ট হইলে, বা কালে শক্তিক্ষীণ হইলে আর অঙ্কুরোৎপাদনে সক্ষম হয় না। এই যে আমরা বীজ হইতে অঙ্কুরশরীর বা বৃক্ষশরীর দর্শন করিলাম, উহাতে যে ভূতসম্মিলনাত্মক ভয়ঙ্কর দৃশ্যদেহ প্রতীয়মান হইল, ইহা কেমন করিয়া প্রকটিত হইল। এই তত্ত্ব আলোচনায় দেখা যায় যেঃ—বীজের মধ্যে বৃক্ষ যে জাতীয়, যেরূপ ফুল ও ফল প্রসব করিবে ইহার সূক্ষ্ম কারণ ছিল। সেই কারণগুলিকে স্পষ্ট অর্থাৎ ব্যক্ত করিবার জন্য—ভৌতিক উপাদান প্রকাশ করিবার শক্তিও তাহার ছিল। সেই যে ভৌতিক উপাদান প্রকাশ করিবার শক্তি; তাহারই নাম তন্মাত্রা, ভূতসম্মিলন মাত্রেই সেই তন্মাত্রাশক্তি আকাশ হইতে শব্দ অর্থাৎ মূর্ত্তির আভাষ, বায়ু হইতে স্পর্শ; তেজ হইতে রূপ; জল হইতে রস এবং পৃথ্বী হইতে গন্ধ আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষের পুষ্টি ও কান্তিবিধান প্রভৃতি তাহার স্বভাব ও কর্ম্মানুসারে করিতে থাকিল।

অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন, মৃত্তিকা বা জল স্পর্শ না হইলে যখন বৃক্ষাদি বর্দ্ধিত হয় না, তখন শক্তি দ্বারা উপাদান প্রকাশ কেমনে হয়? তদুত্তর এইঃ—একটি টবে বা উদ্যানে একটি ফুল গাছ বা বৃক্ষ পুতিলেই দেখা যায়, মৃত্তিকা যেমন তেমনিই থাকে, অথচ বৃক্ষ বা গুল্ম মহা বা ক্ষুদ্র কলেবরে বর্দ্ধিত হয়। এই যে সহস্র সহস্র শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষদেহ কেমন করিয়া বিকাশ হইল, অথচ মূলস্থ ভূমি খণ্ড যেমন তেমনি থাকিল। এই পৃথ্বী ও জলের সহিত সকল ভূতগুলির বিশেষ মিলন আছে, এই জন্য জল ও পৃথ্বী, বায়ু প্রভৃতির সাহায্যে আপনিই তন্মাত্রা শক্তি মহাভূতসমষ্টিপূর্ণ দেহ বিকাশ করিয়া থাকে। এই তন্মাত্রাশক্তি হইতে অনন্ত সংসারের ভূত সমষ্টির বিকাশ হইতেছে। এই তন্মাত্রাশক্তি হইতেই মানবদেহের ভূতোপাদান সমস্ত বিকাশ হইতেছে। যেমন বৃক্ষের গঠন ও রূপ, সেইরূপ মানবের কর্ম্মানুসারে ও স্বভাবানুসারে সেই তন্মাত্রাশক্তি রূপ ও গঠন বিকাশ করিতেছে। বৃক্ষ ভূমি প্রভৃতির স্পর্শে মহা ভূতোপাদান

তন্মাত্রাশক্তির বলে লাভ করে। মানব আহারীয় দ্রব্যে, শ্বাসপ্রশ্বাসের বলে এবং চিন্তানুসারে সেই তন্মাত্রাশক্তির সাহায্যে গঠন ও কান্তিলাভ করিতেছে।

যদি কেবল শক্তি অর্থাৎ চৈতন্য অবস্থা হইতে এই সকল স্থূলাবস্থার বিকাশ না হইত তাহা হইলে পুষ্টিক্ষয় মনের উপরে নির্ভর করিবে কেন? যদি কেহ অতি পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করে, আর তাহার মনে শোক, তাপ সদা বর্ত্তমান থাকে, ঐ দ্রব্য কখন সে অবস্থায় পুষ্টদেহ ও কান্তি বিকাশে সক্ষম হয় না। সেই অবস্থায় মনাদির স্বভাব কুচিন্তাতে অভিভূত। কুচিন্তা ও রোগাদিতে তন্মাত্রাশক্তি অভিভূত হইলে তাহার সৃষ্টিতেজ ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব বহু উপায় দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সূক্ষ্ম হইতেই স্থূলের বিকাশ। স্থূলটি সূক্ষ্মের অবস্থান্তর মাত্র। সূক্ষ্ম পুষ্ট হইলেই স্থূলের বিকাশ। সূক্ষ্মের কর্ম্মই স্থূলের বিকাশ করণ। কোন উপায়ে সূক্ষ্ম অবস্থাকে যদি কর্ম্মহীন করা যায়, তাহা হইলে স্থূলের বিকাশ হয় না, অতএব দেহের বিকাশ অসম্ভব হইয়া থাকে। অতএব তন্মাত্রাতত্ত্বের অবগতি হইলে স্থূল শরীরের বোধ হয়; যে কারণে সূক্ষ্ম স্থূল হয় তাহা বোধ হইলে মানবে জন্ম ও মৃত্যু আপন ইচ্ছায় ঘটাইতে বা না ঘটাইতে পারে।

এই যে সূক্ষ্ম তন্মাত্রাশক্তির কথা কহিলাম সংসারে উহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। শব্দ বলিতে কোন একটি পদার্থ বোধক আভাষ মাত্র। বহু প্রাণীদেহের মধ্যে প্রত্যেকের গঠন ভেদে যে প্রাণীর উপলব্ধি বা বহু পদার্থের মধ্যে ভিন্ন পদার্থের উপলব্ধি যাহাতে হয়, তাহাকে শব্দ কহে। গৌণার্থে কেবল কণ্ঠের ধ্বনিকে শব্দ কহে। কারণ উহাও অন্তরের অবস্থা বিকাশক ইঙ্গিত বিশেষ মাত্র। আকাশ অর্থাৎ সকল অবস্থার আধার স্বরূপ যে মহাভূত সৃষ্টিতে বর্ত্তমান, তাহার প্রধান গুণই হইল শব্দ। এই অবস্থা ব্যতীত কোন সত্বার অস্তিত্ব প্রকাশ হইতে পারিত না, পারেও না। এই শব্দ সমন্বিত আকাশদ্বারা আমাদের দেহের আধার বিকশিত হইয়া

থাকে, অন্তরের ভাব বিকশিত হইয়া থাকে। আমরা সংসারে যাহা ভোগ করি, তাহার মধ্যে আকাশই প্রধান হইতেছে। অতএব যে শব্দে আমরা কাম্য বিষয়ে মুগ্ধ হই, আকাশতত্ত্বজ্ঞানে তাহা না হইয়া; যে ভগবানের কৃপায় এই অনন্ত বিশ্বের ভাববিকাশক শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে সেই শব্দবোধ হইলে মহানন্দে অর্থাৎ সেই ভগবত্তত্ত্বানন্দে উন্মত্ত হইব।

দ্বিতীয় তন্মাত্রার নাম স্পর্শ। উহার সাহায্যে সুখদুঃখবোধ, শীতোষ্ণাদি, ক্ষুধাতৃষ্ণাদি, গুরুলঘু প্রভৃতি সমস্তই বাহ্যান্তরের সত্বা উপলব্ধি হইয়া থাকে। সুখদুঃখাদি অবস্থাগুলি যেমন কর্ম্মানুসারে মনে উদয় হয়, অমনি স্পর্শ নামে বায়ুর তন্মাত্রা অন্তরে সদা বর্ত্তমান আছে, তৎ-সাহায্যে আমাদের অনুভব হইয়া থাকে। অতএব এত যে সুখের সংসার ভোগ তাহা আর কিছুই নহে, কেবল স্নেহ, মমতা কামাদির এবং সুখদুঃখাদির স্পর্শ সুখানুভূতি মাত্র; ইহা যখন বোধ হইবে, তখন ভোগকর্ত্তা আত্মা যে কেবল সাক্ষী অর্থাৎ স্পর্শমাত্র অবিকারী, ইহা বোধ হইবে। অতএব স্পর্শতন্মাত্রা অবগতি হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই নিয়মে যে রূপে আমরা দিবানিশি উন্মত্ত তাহা তেজস্তত্ত্বের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা বোধ হইলে বাহ্যরূপে আমাদের মন আকৃষ্ট হইবে না। এই নিয়মে যে রসের বলে আমরা বীর, করুণ, রৌদ্র, শৃঙ্গারাদি ভাবরস এবং কটুতিক্তাদি দ্রব্যরস ভোগ করিয়া থাকি, তাহা আর কিছুই নহে কেবল কফ নামে যে অপ প্রণালী আমাদের অন্তরে আছে, তাহারই অবস্থা বিশেষ বোধ হইবে। [illegible] অনুভব কালে অন্তরে যে ভাবে তেজ বর্ত্তমান থাকে, তাহার অবস্থা বিশেষে আমাদের রসের অনুভূতি হইয়া থাকে। অতিশয় তেজ প্রবল থাকিলে মনের শান্তিরসক্ষয়ে ক্রোধ নামে রৌদ্ররস উদয় হয়। বায়ু প্রবল থাকিলে ভয় নামে বীভৎসরস উদয় হয়। এই বায়ু ও তেজের মৃদুতীব্র ভাবাবেশ অনুসারে কখন করুণ, কখন শৃঙ্গার ইত্যাদি রসের অনুভব হইয়া থাকে। এই নিয়মে পিত্তাধিক্য থাকিলে মিষ্টঃক তিক্ত

এবং কফের আধিক্য থাকিলে তিক্তকে মিষ্ট অর্থাৎ স্বাদু বলিয়া বোধ হয়। এই যে ভিন্ন ভিন্ন রসবোধ, ইহা কেবল অন্তরে গৃহীত তেজ ও বায়ুতন্মাত্রায় চালনে মনের যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ঘটে তাহার নিদর্শন মাত্র। রস ভিন্ন নহে, আমাদের অবস্থাভেদে ভিন্ন বোধ করি মাত্র। এই ভূততন্মাত্রাগুলির বিশেষ স্ফুর্ত্তি না ঘটিলে আমাদের প্রকৃতির ভিন্নতা ঘটিয়া থাকে, এই জন্য আমরা শব্দে, ভিন্ন ভিন্ন সুখ দুঃখ, রূপে ভিন্ন ভিন্ন সুখ দুঃখ, রসে ভিন্ন ভিন্ন, স্পর্শে ভিন্ন ভিন্ন সুখদুঃখ, গন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন সুখদুঃখ অনুভব করিয়া থাকি। তন্মাত্রাবোধে আমাদের যখন স্থির হইবে যে, তন্মাত্রা শক্তি গুলির সহযোগেই আমাদের সুখের সংসার ভোগ হয়। তন্মাত্রা প্রকৃতি যদি অন্তরে স্ফুর্ত্তি না পায়, তবেই আমরা শব্দাদির বাহ্যভাব বোধ করিয়া মুগ্ধ হই; কিন্তু সেই অবস্থাটিকে যদি ঠিক নিয়মিত রাখিতে পারি, তাহা হইলে কখনই আমাদের ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয় না। অতএব সুখ ও দুঃখ বোধ হয় না। যে অবস্থাগুলি কেবল ভৌতিক উপভোগ মাত্র, তাহা ত্যাগ করিয়া প্রকৃত বস্তু উপভোগ করিলে কতই সুখ অনুভব হইবে। এই সকল বিবেক উপস্থিত করাইবার জন্যই সূক্ষ্মশরীর তত্ত্বের মধ্যে তন্মাত্রাতত্ত্ববোধ আমাদের আবশ্যক হইয়া থাকে।

অবিদ্যা, বাসনা ও কর্ম্ম এবং ঐ সূক্ষ্ম পঞ্চ বিষয়ের একত্রে যে অবস্থা ঘটিল তাহাকেই ভোগ প্রকাশকর্ত্তা সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ কহে। এই লিঙ্গদেহতত্ত্ব অন্যান্য পণ্ডিতেরা যেরূপ কহিয়াছেন তাহাও বলা হইতেছে।

সূক্ষ্মশরীরবাদী পণ্ডিতগণের মধ্যে অপর এক শ্রেণী সূক্ষ্মাবস্থাকে সপ্তদশাবয়ব বিশিষ্ট কহিয়াছেন। এই মত সর্ব্ববাদিসম্মত হইতেছে। এই নিয়মে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ সূক্ষ্মাবস্থাকে লিঙ্গদেহ কহে। কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে। হস্ত, পদ, বাক্য, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটীই কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতেছে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দস্পর্শাদি তন্মাত্রা পঞ্চবিষয়ের জ্ঞান, বুদ্ধির সহযোগ হয় বলিয়া উহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে। আর মনের সংকল্প ও বিকল্পানুসারে কার্য্যে নিযুক্ত হয় বলিয়া পরস্থ পাঁচটিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় কহে।

প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চবায়ু প্রণালী যাহা দেহের অন্তরে পুষ্টি ও ক্ষয়াদি কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহাকে বায়ুবৃত্তি কহে। প্রাণের ক্রিয়া শ্বাস প্রশ্বাসাদি, অপানের অন্তরের বস্তু বহির্নিসরনাদি, সমানের বিভাগাদি, উদানের উর্দ্ধ গমনাদি, ব্যানের সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্তি প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। এই পঞ্চ প্রাণ শক্তির বলে শরীরের রস, রক্ত এবং বাহ্য ধাতু গৃহীত হইয়া থাকে।

বুদ্ধি ও মনই সকল কর্ম্ম ও স্বভাবের বিকাশক হইতেছে। এই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রভৃতির কথা যাহা বলিলাম, ইহারা ভোগ করিবার শক্তি মাত্র। শব্দাদি পাঁচটি বিষয়ই ভোগ্য বস্তু। স্থূল পঞ্চভূত হইতেছে দেহের গঠন ও কান্তির উপাদান মাত্র। বুদ্ধি ও মনই ভোগ কর্ত্তা রূপে গণ্য। ইহাই সর্ব্ব তত্ত্বশাস্ত্রের একমাত্র সিদ্ধান্ত হইতেছে।

সংকল্প ও বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তির নামই মন হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে চিত্ত ও অহংকার নামে আর দুইটি সূক্ষ্ম অন্তঃকরণবৃত্তি আছে। বুদ্ধির অতি সূক্ষ্মাংশে চিত্তের অবস্থান। বুদ্ধির সহিত চিত্তের একান্ত মিলন। মনের সহিত অহংকারের মিলন আছে। উহা মনের প্রধান শক্তি মাত্র। অনুসন্ধানাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম চিত্ত হইতেছে। পূর্ব্ব জন্মের যে স্বভাব ও কর্ম্ম লইয়া আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি। সেই স্বভাব ও কর্ম্মানুসারে আমরা বিষয় ভোগ করি বলিয়া চিত্তই পূর্ব্বসংস্কার সতত বিকাশ করিয়া থাকে। যে অবস্থায় যে ভাবে পূর্ব্বসংস্কার ভোগ হইবে, চিত্ত তীব্র অনুসন্ধান দ্বারা বুদ্ধিকে সেই ভাবে পরিণত করিয়া থাকে। বুদ্ধি চিত্তের প্রসক্তি ও নিয়োগানুসারে জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সহযোগে সেই অনুকূল বিষয় ভোগ করায় বুদ্ধি পরিপূর্ণ জীবাত্মার সহিত কর্ম্মের সদসৎ ফল মাত্র ভোগ

করিয়া থাকে। এই ভোগ কালীন্ সুখ বা দুঃখাদিযুক্ত যে অভিমান অর্থাৎ আমি ভোগ করিলাম, এই অনুভব করিবার ক্ষমতাই অহংকার হইতেছে। মনের সহিত অহংকারের নিত্যসম্বন্ধ আছে। অহংকার মনের সূক্ষ্মাংশ বলিলেও চলে। বুদ্ধির সহিত জীব চিত্তস্থ সংস্কারানুসারে জ্ঞানেন্দ্রিয় সহযোগে যাহা ভোগ করে, সেই ভোগাভিমান, সত্বাই অহংকার, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ঐ অভিমান অর্থাৎ বিষয়াভিনিবেশ সতত মনে প্রতিফলিত হয়। ঐ প্রতিফলনেই মনের ক্রিয়া প্রকাশ হইয়া থাকে। চিত্ত হইতে বুদ্ধির ক্রিয়া, বুদ্ধি হইতে অহংভাবের উপস্থিতি, অহংভাব হইতে মনের ক্রিয়া, মন হইতে জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইয়া থাকে। জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণশক্তি বাহ্যবিষয়ভোগ সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই নিয়মে আমাদের সংসারভোগ হইয়া থাকে। যেমন একটি শিশু জন্মাইলে, জন্মাইবার পরক্ষণেই মাতৃস্তনপানজনিত অভ্যাস সে কোথায় পাইল? তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণে কহেন, পূর্ব্বজন্মজনিত অভ্যাস বা সংস্কার চিত্তে ছিল; যেমন মাতৃস্তন তাহার বদনে দেওয়া হইল, অমনি স্পর্শ সুখে; রস সুখে, তাহার জিহ্বা ও ত্বগেন্দ্রিয় ক্রিয়মান্ হইল। সেই জিহ্বাদির ক্রিয়া মনে অনুভূত হইল। বুদ্ধি তজ্জনিত সুখ অভিমান সহযোগে যেমন ভোগ করিল, অমনি চিত্তস্থ সংস্কার তাহাকে নিত্য ভোগ করাইবার জন্য কোন বৃত্তির বিকাশ করিল। সেই বৃত্তিই ক্রমে চুষিবার ক্ষমতায় পরিণত হইল। কোন একটি রূপ শিশু দেখিল, সেই রূপে মনোহারীত্ব বা ভীষণভাব যাহা কিছু থাকুক না, শিশুর মন, বুদ্ধির সদসৎ বিবেচনানুসারে মনোহারী ভাবের দিকে ধাবিত হয়। কেন না, তাহার চিত্তের সংস্কার শান্তি অন্বেষণ করাতে, তাহার অভিমানও সেই শান্তির দিকে সতত ধাবিত হয়। মনও তৎসংগ্রহে সতত নিরত থাকে। যে ব্যাঘ্রকে দেখিলে আমরা সতত ভীত; শিশু হইতে বৃদ্ধ সকলেই ভীত হয়। সেই ব্যাঘ্রের ভীষণ ও ক্রূর সংস্কারে ব্যাঘ্রশিশুর চিত্ত নিজ পিতামাতার গর্জ্জন ও মূর্ত্তিকে ভীষণ, বলিয়

বোধ করে না, সে হয়ত হরিণ দেখিলে ভীত হয় কিন্তু ব্যাঘ্র দেখিলে আনন্দিত হইয়া থাকে।

এই নিয়মে তত্ত্বজ্ঞ সাধুগণে কহেন যেঃ—পূর্ব্বাভ্যাসানুসারে মন যখন সংসারে বিশেষ পরিচিত হয়, তখন ইহাকে পরীক্ষা করিলে দুইটি অবস্থায় ক্রিয়মান্ দেখা যায় এবং বুদ্ধিকেও দুইটি ক্রিয়ায় ক্রিয়মান্ দেখা যায়। মনের দুইটি ক্রিয়ার নাম সংকল্প ও বিকল্প। বুদ্ধির দুইটি ক্রিয়ার নাম সৎ ও অসতের নিশ্চয়তা। পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে চিত্তে যে কর্ম্ম ও স্বভাব সূত্র আছে; সেই স্বভাবসূত্র বিশেষ পরিতৃপ্ত করিতে ইহ জন্মে ভোগ ব্যাপারে চিত্ত যাহাতে প্রশান্ত হয় তাহাকেই বুদ্ধি সৎ বলিয়া ধারণা করিবে, মন তাহাতেই নিরত ও সুখী হইবে। এই অবস্থার বিষয়ভোগকে মনের সংকল্পাবস্থা কহে। চিত্ত যাহাতে প্রশান্ত হয় না, সেই বিষয় ভোগ যদি ঘটে, তাহা হইলে বুদ্ধি তাহাতে অসৎ ভাবে পরিণত হয়; তাহাকে অসৎ বলিয়া নিশ্চয় করে। সেই অসৎ ভোগই মনের বিকল্পাবস্থা প্রকাশ করে। অভিমান নামে অনুভূতির প্রধান অবস্থা মনের সংকল্পে, বুদ্ধির সন্নিশ্চয়ে এবং এবং চিত্তের শান্তিতে সুখভাবে মুগ্ধ হয়। ভোগ্য বিষয়ে, মনের বিকল্পে, বুদ্ধির অসন্নিশ্চয়ে এবং চিত্তের অপ্রশন্নতায় অভিমান দুঃখভাবে মুগ্ধ হইয়া থাকে।

এখন সহজে আমাদের ভোগ্য বিষয়, ভোগ করিবার শক্তি ও ভোগানুভূতির অবস্থাগুলির পরিচয় দেওয়া হইল। এই সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট ভোগাবস্থাই সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর হইতেছে। যেমন স্থূল শরীর ভূতাদির সমাবেশে প্রণীত হয়, সূক্ষ্ম শরীর কেবল চৈতন্য স্পর্শে পূর্ব্ব কর্ম্ম ও স্বভাব দ্বারা প্রকটিত হইয়া থাকে। কারণ উহাতে ভূতোপাদান নাই, কেবল শক্তি অর্থাৎ চৈতন্যের অবস্থা বিশেষে প্রকটিত হইয়া থাকে। যেমন আকাশ অতি স্বচ্ছ ও বর্ণাদি বিহীন কিন্তু মেঘ ও সূর্য্য প্রভায় ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে মণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ এই মনাদি শক্তিগুলি স্বয়ং বিশুদ্ধ থাকিলেও কর্ম্ম দ্বারা অনুরঞ্জিত

থাকাতে সতত তন্ময় থাকে। যতক্ষণ কর্ম্ম ততক্ষণ উহাদের ক্রিয়া, মন কর্ম্মচ্যুত হইলে আর উহাদের ক্রিয়া থাকে না। এ কথা ভোগতত্ত্বে প্রকাশ করা যাইবে। এক্ষণে লিঙ্গশরীরের মধ্যে আর আর যে কিছু তত্ত্ব আছে, তাহার আলোচনা করা হউক। পূর্ব্বে যে ভূতগণ, তন্মাত্রাগণ, মন, চিত্ত, বুদ্ধি, অহংকার, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চপ্রাণের কথা বলিয়াছি, উহারাই প্রধান শক্তি ও উপাদান সম্বন্ধীভূত এই দেহের অবস্থা হইতেছে। এই স্বাধীন অবস্থাগুলি দেহের মধ্যে প্রকটিত হইয়া, মিশ্রিত হইয়া, তিনটি অবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে। এই তিন অবস্থায় নাম; প্রকৃতি, বিকৃতি ও বিকার হয় হইতেছে।

দেহসত্ত্বার মধ্যে যে উপাদান শক্তিগুলি স্বাধীন, তাহদের প্রকৃতি কহে। প্রকৃষ্টরূপে বিশুদ্ধ আত্মাকে জন্মমরণ ও ভোগে ক্রিয়মান্ করে বলিয়া উহাকে প্রকৃতি বলে। পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই আটটিকে প্রকৃতি কহে। ইহাই বেদান্তবাদীগণের যুক্তি হইতেছে। তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চভূত, অহংতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব ও প্রধানতত্ত্ব এই আটটিকে নাপ্রকৃতি কহে। এই যে উভয় শাস্ত্রে ভেদ ইহা বিরুদ্ধ নহে। বেদান্ত কেবল জীবদেহতত্ত্বই বিশেষ বিচার করিয়াছেন, বিশ্বতত্ত্ব বিশেষ বিচার করেন নাই। কিন্তু তন্ত্র শাস্ত্র উভয়তত্ত্বই বিশেষ বিচার করিয়াছেন। এইজন্য জীবের বুদ্ধি হইতেছে প্রধান তত্ত্ব; চিত্ত সংযুক্ত মহতত্ত্ব এবং অহংকারই অহংতত্ত্ব হইতেছে। এই বিশ্ব ও জীব উভয় পক্ষের প্রকৃতি বিকৃতি ও বিকার বিচার করিতে শ্রীসারদা তন্ত্র বলিতেছেনঃ—

"দশেন্দ্রিয়ানি ভূতানি, মনসা সহষোড়শঃ।
বিকারাঃ স্যুঃ প্রকৃতয়ঃ পঞ্চভূতান্যহঙ্কৃতি॥
অব্যক্তঃ মহদিত্যষ্টৌ তন্মাত্রাশ্চ মহানপি।
সাহঙ্কারা বিকৃতয়ঃ সপ্ত তত্ত্ববিদো বিদুঃ॥

অস্যার্থঃ—দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ ভূত এবং মন একত্রে মিলিত হইলে ষোড়শবিকার নামে কথিত হয়। পঞ্চ মহাভূত, অব্যক্ত অর্থাৎ

প্রধানতত্ত্ব, মহতত্ত্ব এবং অহংতত্ত্ব এই আটটীকে প্রকৃতি কহে। পঞ্চ তন্মাত্রা, মহতত্ত্ব ও অহংতত্ত্ব ইহারা মিলিত হইলে সাতটি বিকৃতি হইয়া থাকে। ইহাই তত্ত্ববিৎ জনমাত্রেই জ্ঞাত আছেন।

পঞ্চভূত ও প্রধান, মহৎ ও অহং এই তিন তত্ত্ব একত্রে অষ্ট প্রকৃতি হইল। ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয় অবস্থা হইতে জগৎ ও জীব প্রকটিত হইবার জন্য প্রথম যে অবস্থার বিকাশ হইয়াছিল তাহার নাম প্রধানাপ্রকৃতি। এই অবস্থায় চৈতন্য, শক্তি ও উপাদান সমূহ অতি সূক্ষ্ম ভাবে মিশ্রিত থাকে। যেমন বীজের অংকুরোদ্গম অবস্থা। ঐ অবস্থা কাল সহযোগে যখন আরো স্ফুট হইয়া চৈতন্য, শক্তি ও উপাদান পৃথক ভাব ধারণ করে, সেই অবস্থাকে মহাপ্রকৃতি কহে। এই অবস্থা ক্রমে কাল, কর্ম্ম, স্বভাব; প্রভৃতিতে মিশ্রিত হইলে অহং প্রকৃতিতে পরিণত থাকে। এই অবস্থায় উপাদান, শক্তি ও চৈতন্য পৃথক হইয়া পড়ে। উপাদান হইতে ভূতাদি, শক্তি হইতে ইন্দ্রিয়াদি, চৈতন্য হইতে মনাদির বিকাশ ঘটিয়া থাকে। এই তিন প্রকৃতি আর পঞ্চভূত সমস্ত সংসারের আদি কারণ, কর্ত্তা ও উপাদানরূপে ভোগ হইতে স্বাধীন ভাবে বর্ত্তমান আছে। ভোগ করিবার জন্য জীবের ঐ অবস্থা গুলির প্রয়োজন হয় বলিয়া উহারা স্বাধীন অবস্থায় বর্ত্তমান। এইজন্য উহাদের প্রকৃতি কহে।

স্বাধীন অবস্থাগুলি ভোগ্যরূপে পরিণত হইলে তাহাকে বিকৃতি কহে। অর্থাৎ এই অবস্থাভোগে বিশুদ্ধ আত্মার ভ্রান্তি ভোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। পঞ্চতন্মাত্রা, মহান্ ও অহংকারকে সপ্ত বিকৃতি কহে। শব্দাদি পঞ্চ বিষয়কে তন্মাত্রা কহে। এস্থলে পূর্ব্ব সংস্কারীভূত চিত্তকে মহত্তত্ত্ব কহে। সুখদুঃখ ভোগানুভূতিকে অহংকার কহে। বিষয়, মহান্ ও অহংকার ইহারা সকলেই জীবের ভ্রান্তি উপভোগ করায় বলিয়া উহাদের বিকৃতি বলিয়া শাস্ত্রকর্ত্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যে অবস্থাগুলি জীবের সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহে পরিণত হইয়া ভোগের

সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয় তাহাকে বিকার কহে। দশটি ইন্দ্রিয় শক্তি, মন ও পাঁচটি মহাভূত; ইহারা একত্রে মিলিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহাধার-রূপে বর্ত্তমান আছে। শৈশব, কৌমার, যৌবন, জরা, ব্যাধি, শোক, তাপ, জন্ম ও মৃত্যুতে ইহাদের সদা পরিবর্ত্তন ঘটে বলিয়া ইহাদের দেহাবস্থায় বিকার কহে। দশেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চভূত একত্র মিশ্রণে যোড়শ সংখ্যায় বিকার গণিত হইয়া থাকে।

প্রকৃতি, বিকৃতি ও বিকারের সামান্য পরিচয় দেখান হইল, সূক্ষ্মশরীরতত্ত্বে আর একটি বিষয় জানা উচিত; তাহার নাম হইতেছে তত্ত্ব। যাহা লইয়া আমরা ভোগ করি, ভোগ্য পাই এবং ভোগ করিবার উপযুক্ত হই। তাহাকে জীবদেহের তত্ত্ব কহে। সূক্ষ্মাবস্থা মাত্রকেই তত্ত্ব কহে। আমাদের জীবশ্রেণীর অন্তর্বাহ্য আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণে কহিয়াছেন, ইহাতে চতুর্ব্বিংশতি সূক্ষ্ম কারণ অর্থাৎ তত্ত্ব বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বে যে ষোলটী বিকারের ও সাতটী বিকৃতির পরিচয় দিয়াছি। জীবাত্মার ভোগ্যদেহের পক্ষে ঐ ত্রয়োবিংশতিটিই কারণ বা তত্ত্ব হইতেছে। ঐ ত্রয়োবিংশতির সহিত আত্মাকে জীব-ভাবে আকর্ষিত রাখিবার জন্য একটি প্রকৃতি আছে; তাহার পরিচয় শ্রীগীতা দিতেছেন;—

"অপরেয়ং ইতস্ত্বন্যাং বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

অস্যার্থ—হে অর্জ্জুন, হে মহাবাহো! আমার পঞ্চভূতাদি সংযুক্তা প্রকৃতির নাম অপরা প্রকৃতি হইতেছে। উহার অতীত আমার আর একটি প্রকৃতি আছে, তাহাকে পরা বলিয়া জানিবে। সেই পরা প্রকৃতির সাহায্যে আত্মা জীবভূত হইয়া থাকেন। আমার সেই প্রকৃতিই এই জগৎকে আধারীভূত করিয়া আছে। পুনশ্চ বায়ু সংহিতায় বলা হইয়াছে—

"ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বেভ্য পরা প্রকৃতিরুচ্যতে।
প্রকৃতেস্তু পরং প্রাহুঃ পুরুষং পঞ্চবিংশকং।"

অস্যার্থঃ—পূর্ব্বোক্ত ষোড়শবিকার এবং সপ্তবিকৃতির একত্রে এয়োবিংশতিতত্ত্ব হইয়া থাকে। এই তত্ত্ব হইতে পরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা বলিয়া (জীবভাবিয়া) প্রকৃতিকে পরা কহে। ইহার মিলনে চতুর্ব্বিংশতি ঘটে, ঐ প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া অন্তর্যামীপুরুষ অর্থাৎ আত্মাই (জীবরূপে) পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব দ্বারা জীব সংসারগৃহে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া ফল লাভ করেন। এই জন্য সূক্ষ্মশরীরের মধ্যে এই প্রস্তাব বিশেষ করিয়া বোধ করা উচিত হইতেছে। এই পঞ্চবিংশতি অবস্থার মিলনই জীব সংসার। ইহার বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিলেই সংসার ক্ষয় হয়। ইহাই মানব জন্মের উদ্দেশ্য, এই জন্য উপাসনতত্ত্বে এই সকল বিষয় বোধ করা চাই।

ঐ সকল অবস্থার অতীত সূক্ষ্ম শরীরে কোষ নামে একটি অবস্থা আছে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। যেমন একটি ত্বগাবরণের মধ্যে বীজের সার থাকে; যেমন আবরণের মধ্যে তলবার থাকে; যেমন গুটিপোকা আবরণমধ্যে থাকে। সেইরূপ জীবদেহের মধ্যে পাঁচটি আবরণের মধ্যে আত্মা পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব ভোগ করিয়া থাকেন। সেই পাঁচটি আবরণের নাম পঞ্চ কোষ হইতেছে। কুষ্‌-ধাতু হইতে কোষ শব্দের বুৎপত্তি হইতেছে। কুষ্‌ ধাতুর অর্থ স্থির হওয়া। আত্মা সর্ব্বব্যাপী অন্তর্যামী হইতেছেন, তিনি বিশুদ্ধ, কাহারো সহিত তাঁহার মিলন নাই, ঐ চতুর্বিংশতিতত্ত্বের দ্বারা জীবভাবে কর্ম্ম ভোগে স্থির হয়েন বলিয়া তাঁহার ভোগায়তনজনিত আবরণকে কোষ কহে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় এই পাঁচটিই সেই কোষপঞ্চক হইতেছে। এই পঞ্চকোষ লইয়া সাধন তত্ত্বজ্ঞগণের মধ্যে তন্ত্রে ও বেদান্তে দুইটি পৃথক মত বর্ত্তমান আছে। তন্ত্র শাস্ত্রে দশটি কোষের কল্পনা করা হইয়াছে। প্রপঞ্চসার তন্ত্রে যথাঃ—

"মজাস্থি স্নায়বঃ শুক্রাদ্রক্তাত্বঙ্মাংস্ শোনিতং।
ইতি ষাটকৌষিকো নাম দেহো ভবতি দেহীনাং॥"

অস্যার্থঃ—মজ্জা, অস্থি ও স্নায়ুমণ্ডলী এক শুক্র হইতে জন্মাইয়া থাকে এবং মাতার শোণিত হইতে ত্বক্, মাংস ও রুধির জন্মাইয়া থাকে। এই ছয়টি কোষ আবরণে আবৃত হইয়া দেহীগণের দেহ প্রকটিত হইয়া থাকে।

এই ছয়টি কোষ যাহা তন্ত্রশাস্ত্রে পৃথক দেখান হইল, বেদান্ত শাস্ত্রে ঐ ছয়টিকেই এক অন্নময় কোষের মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকে। তন্ত্রের ছয় কোষ এবং বেদান্তের ও তন্ত্রের স্বীকৃত প্রাণ মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ এই চারিকোষ, একত্রে দশটি কোষ অর্থাৎ আবরণ এই দেহে বর্ত্তমান আছে।

পূর্ব্বোক্ত মজ্জাস্থি, স্নায়ু,ত্বক্,মাংস, রুধির এবং অন্যান্য স্থূল দেহের উপকরণ অন্নাদি সহযোগে বা আহার দ্বারা পুষ্ট হয, এবং অন্নাদি গ্রহণ না করিলে ক্ষয় হয়, এই জন্য প্রধানতঃ অন্নই এই কোষের আশ্রয় হইতেছে বলিয়া ইহাকে অন্নময় কোষ কহে। এই কোষতত্ত্বজ্ঞানে আত্মাই সত্য এই প্রতীতি হইয়া থাকে, এই দৃশ্য স্থূলদেহ মিথ্যা, ইহা প্রমাণ হইয়া থাকে। কোন কোন নাস্তিক মতে অন্ন ব্যতীত দেহ রক্ষা হয় না, শোনিত ব্যতীত দেহ রক্ষা হয় না বলিয়া, ঐ অন্ন ও রক্তা দিকেই আত্মা কহে। এই অন্নময় কোষপরিজ্ঞানে এই নাস্তিক্য খণ্ডন হইয়া যায়। ব্রহ্মবস্তুতে স্থির শ্রদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এই জন্য উপাসনাতত্ত্বে এই অন্নময়াদি কোষের আলোচনা প্রয়োজন হইয়া থাকে। যে মজ্জা শোনিতাদি শুক্র ও শোনিতাদি হইতে জন্মায় যাহা সতত ক্ষয় ও পুষ্ট হয়। মন দুঃখী হইলে ক্ষয় হয়, ব্যাধি হইলে ক্ষয় পায় ; যাহার সতত ক্ষয় বর্ত্তমান, তাহা কখনই নিত্য হইতে পারে না। যাহা নিত্য নহে তাহা কখন আত্মা নামে পরিচিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয় কোষের নাম প্রাণময় হইতেছে। বেদান্তশাস্ত্রে ও তন্ত্রে ইহার একই পরিচয় আছে। পূর্ব্বে যে পাঁচটি প্রাণ বায়ুর কথা বলা হইয়াছে, সেই প্রাণ, অপান, সমান উদান ও ব্যান নামে এই পঞ্চবায়ু

পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিয়া দেহের ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে থাকে, এই জন্য এই অবস্থাকে প্রাণময়কোষ কহে। এই প্রাণাদি পঞ্চবায়ু কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইযা দেহকে সবল ও কর্ম্মক্ষম রাখে, ক্ষয হইলে পুষ্ট করে। এই অবস্থা ব্যতীত দেহ রক্ষা হয না, এই জন্য ইহাকে প্রাণ বা জীবনী শক্তি কহে। এই প্রাণাদি ব্যতীত দেহ রক্ষা হয না বলিয়া, কোন কোন নাস্তিক শাস্ত্রে প্রাণকেই আত্মা কহে। আত্মা স্থির, অচল, অটল, তাঁহার ক্ষয় বা বৃদ্ধি নাই, তাঁহার গমন ও আগমন নাই, চির নিত্য হইতেছেন। কিন্তু প্রাণাদি বায়ু বাহিব হইতে নাসা দ্বাবা গৃহীত ও নির্গত হয়। বিকৃত ও বিশুদ্ধ হয়। ইহাতে সতত কর্ম্ম বর্ত্তমান। দেহেব অন্নময় কোষ যতক্ষণ বর্ত্তমান ততক্ষণই প্রাণাদির ক্রিয়া থাকে। দেহ ক্ষয় হইলে আর উহাদের কোন ক্রিয়া উপলব্ধি হয় না, এই জন্য ইহা আত্মা হইতে পাবে না। এই জন্য এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে অন্নাদি হইতে অতীত আত্মা বোধ হয় এবং সেই আত্ম বস্তুতে শ্রদ্ধা উপজিত হইয়া থাকে।

এই প্রাণবায়ুঃ—নাসাবিবর, হৃদয়ের মধ্য, নাভির মধ্য এবং উভয় পাদাঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত থাকিয়া শরীর পুষ্ট করিতে থাকে। আহাব বা পান করিবার পরে সেই ভুক্ত অন্নাদিব রস অপান বায়ুব দ্বারা সারভাগ শুক্রশোনিতরূপে, অসার ভাগ মূত্রবিষ্ঠারূপে পরিণত ও বহির্গত হইযা থাকে। এই বায়ু মেঢ়দেশে, গুহ্য, লিঙ্গ ও পায়ুতে, চক্ষে ও জানুতে সতত বর্ত্তমান আছে। ব্যান নামে বায়ু সমস্ত দেহে থাকিয়া তাহার ক্ষয বোধ করাইয়া আহাব জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করে। এই ব্যানবায়ু উভয় চক্ষে, কর্ণে, কটি, পাদগ্রন্থি ও ঘ্রাণশক্তিতে, গলে, অধরোষ্ঠে এবং সর্ব্বগাত্র কম্পনে ব্যাপ্ত আছে। উদান নামক বায়ু দ্বারা উত্থান ও উপবেশনাদি কার্য্য হয় এবং যে কিছু অধো বা ঊর্দ্ধ বায়ুর কার্য্য তাহা উদান বায়ুতে সাধিত হয়। ইহা সর্ব্ব দেহ-সন্ধিস্থলে এবং হস্ত ও পদে সতত বর্ত্তমান আছে। সমান নামক বায়ু ভক্ষিত অন্নপানীয়াদিকে রক্ত, পিত্ত কফ ও বায়ুতে পরিণত করিয়া

থাকে। ইহার প্রধান স্থান নাভি কিন্তু ইহা সর্ব্বশরীর ব্যাপী হইয়া বর্ত্তমান আছে।

এই পঞ্চবায়ু বলিতে কেহ যে কেবল বাহ্য বায়ুর ন্যায় বুঝিবেন তাহা নহে। এই পাঁচটি শক্তি বিশেষ। বহন কার্য্যে নিরত বলিয়া বিশ্ব ব্যাপী বায়ুভূতকে বায়ু কহে এবং অন্তরের রস, রক্ত ও উপাদান সংগ্রহ ও বহনকারী শক্তিগুলিকে সেই অর্থে বায়ু কহে। এই প্রাণাদি বায়ু দেহের যে যে স্থানে থাকে, সেই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে। বাহ্য বায়ু একই কর্ম্মে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছে। এতদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে ক্রিয়মান বায়ু ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে শরীর স্থানে বর্ত্তমান আছে। প্রাণবায়ুর বর্ণ রক্তবর্ণ। শরীরস্থ রস হৃদয়ে প্রাণের সহিত মিলিলেই সেই জন্য রক্তবর্ণতা ধারণ করিয়া থাকে। অপান বায়ুর বর্ণ কিছু লঘু লোহিত অর্থাৎ ফিকে লাল হইতেছে। ব্যান বায়ুর বর্ণ মহারজত বর্ণ অর্থাৎ অত্যন্ত শ্বেত সেই জন্য ঘর্ম্ম শুক্র প্রভৃতি শ্বেতবর্ণময় হইতেছে। উদানের বর্ণ বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় এবং সমানের বর্ণ দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত হইতেছে। এই প্রাণাদি পঞ্চবায়ু শরীরের কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত থাকিয়া, আত্মার কর্ম্মাবরণ ঘটায় বলিয়া, ইহাকে প্রাণময় কোষ কহে।

তৃতীয় কোষের নাম মনোময়। এই আবরণকোষটি আমাদের সকল দুঃখের ও সুখের মূল হইতেছে। জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মন মিলিত হইলে এই কোষ প্রকটিত হইয়া থাকে। মনের সহিত অহংকারের মিলন থাকাতে এবং মনের সংকল্পশক্তি থাকাতে, জ্ঞানেন্দ্রিয় সহযোগে যে বাহ্য বিষয় ভিতরে অনুভব হয়, মন তাহাতেই অভিমানী হইয়া থাকে। সুকৃতি দুষ্কৃতি, সমস্তই মনের দ্বারা ভোগ হইয়া থাকে। মনের যখন কোন বিষয় ভোগ করিতে অন্তরে বাসনা হয়; সেই বাসনা চরিতার্থ করিতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযুক্ত মনই বিষয় ভোগ করিতে অভিলাষী। বিষয় ভোগান্তে সুখ ও দুঃখ যে ফল লাভ হয় তাহাই অহংকার যোগে

অনুভব হয়। নিত্য ঐ সকল ভাব অনুভব করিতে করিতে এমন একটি সংস্কার হইয়া যায় যে, সেই ভাব দুঃখের বা সুখের যাহারই হউক, মন তাহাতে উন্মত্ত ও মুগ্ধ হইয়া থাকে। এই উন্মত্ততাকেই সংসার ভোগ কহে। এই মনোময় কোষে মন, বাসনা ও অহংকার তিনটি সচেতন অবস্থা বিষয় ভোগ করিতে বর্ত্তমান আছে এবং অচেতন জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ সেই সকল বিষয়ভোগে যন্ত্ররূপে বর্ত্তমান আছে। একটি ক্রোধ জনিত বাসনা উপস্থিত হইলে, জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং অহংকার তিনেরই সাহায্যে সেই অবস্থার চরিতার্থ ঘটে। ভোগ বিষয়ে আমার যে অভিমান বা অহংকার ছিল, সেই অভিমান অর্থাৎ কেহ কামভোগে সুখলাভ করিয়া তাহাতে অভিমানী ও মুগ্ধ আছে, তাহার বাসনা সতত কামস্পৃহাই উত্তেজিত করিয়া থাকে। তাহার কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের কামভোগ সংকল্পই পূর্ণ করিতে সতত ব্যস্ত থাকে। এই অবস্থায় সেই কাম্যবস্তু বা রমণী যদি অন্য কর্ত্তৃক ভুক্ত হয়, তাহা হইলে মনের সংকল্প বিচ্ছেদ হওয়াতে যে প্রতিহিংসাপর বৃত্তির উদয় হয় তাহাকে ক্রোধ কহে। সেই ক্রোধ চরিতার্থ করিতে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা আঘাত, জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা কামব্যাঘাতী ব্যক্তির নিদর্শন প্রভৃতি কর্ম্ম সাধিত হয়। এই প্রকারে কি আহার কি বিহার যে কোন ভোগ্যাবস্থায় ভোগ প্রয়োজন ঘটে, তাহা মন অহংকার, বাসনা এবং জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা সংসাধন করে বলিয়া এই ভোগ্য অবস্থাকে মনোময় কোষ বা আত্মার আবরণ কহে।

এই মন ব্যতীত ভোগের কার্য্য প্রকাশ হয় না বলিয়া কোন নাস্তিক শাস্ত্রে মনকেই দেহের কর্ত্তা আত্মা বলিয়া স্বীকার করে। বেদান্ততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণে কহেন; এই মন জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থা পর্য্যন্ত ক্রিয়মান্ থাকে, নিদ্রাবস্থায় একেবারে লয় পাইয়া থাকে। দেহ থাকিতেও অবস্থাভেদে, রোগভেদে যখন উহার লয়প্রকাশ ঘটিয়া উঠে, তখন উহাকে নিত্য ও সত্যস্বরূপ আত্মা বলা মূর্খের

মুক্তিমাত্র বুঝিতে হইবে। এই মনস্তত্ত্ব জ্ঞানে মনের অতীত যে আত্মা তাহার বোধ হইয়া তাঁহাতে শ্রদ্ধা ও ও ভক্তির আবেশ হয়। বিশেষতঃ সকল সুখ ও দুঃখভোগের কারণ মনই হইতেছে। কারণ মনশূন্য ইন্দ্রিয় কোন কার্য্যকারী হয় না। ইন্দ্রিয়গণ কার্য্যকারী না হইলে, বাসনার বিকাশ না থাকিলে, কর্ম্মের বিকাশ অর্থাৎ নূতন ভোগ হয় না, রিপু প্রভৃতির বিকাশ থাকে না। অতএব কর্ম্মশূন্য হইলে দুঃখভোগ হয় না। বুদ্ধিস্মৃতি বিশুদ্ধ থাকে। দুঃখ ক্ষয় ও বুদ্ধিস্মৃতির বিশুদ্ধি ঘটিলেই ভোগ ক্ষয় হইল। ভোগ ক্ষয় হইলেই আসক্তি ক্ষয় হইল। আসক্তিশূন্য পূর্ণবিজ্ঞানময় অবস্থাই মুক্তির পরিচায়ক হইতেছে। অতএব সংসারে উন্মত্ত ও আবদ্ধ হওন কেবল মনের সংকল্পিত ও বিকল্পিত কর্ম্মানুসারে ঘটিয়া থাকে; ইহা বুঝিতে পারিলে তাহা নষ্ট করিতে মানবের চেষ্টা হয়। এ বিষয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন।

"সুষুপ্তিকালে মনসি প্রলীনে
নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ সকল প্রসিদ্ধেঃ।
অতো মনঃ কল্পিত এব পুংসঃ
সংসার এতস্য ন বস্তুতোঽস্তি॥
বায়ুনা নীয়তে মেঘঃ পুনস্তেনৈব লীয়তে।
মনসা কল্পিতো বন্ধো মোক্ষস্তেনৈব কল্প্যতে॥"

অস্যার্থঃ—যতক্ষণ আমরা জাগৃত থাকি ততক্ষণ মনের উপভোগানুসারে বিশ্বস্থ বস্তুতে আমাদের আসক্তির উদয় হইয়া থাকে। যখন ঘোর নিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হয় তখন মন প্রলীন অর্থাৎ কর্ম্মশূন্য তিরোহিত অবস্থায় থাকাতে জগতের কিছুই স্মৃতি পথে বর্ত্তমান থাকে না। এই প্রমাণে সত্য মীমাংসিত হইল যেঃ—এই ঘোর সংসারভোগ কেবল মনের প্রসক্তি অনুসারে জীবের ভোগ হইয়া থাকে। মনের প্রসক্তি ক্ষয় হইলে এই ভোগকে ভ্রান্তি বলিয়া স্থির হয়।

যেমন এক বায়ুই গতি ভেদে মেঘের সঞ্চার করে এবং উড়াইয়া

দিয়া থাকে তদ্রূপ মন প্রসক্তি বলে বন্ধন বা ভোগের উদয় করে, আবার বিশুদ্ধ হইলেই মনই মোক্ষ উদয় করিয়া থাকে।

পূর্ব্বতত্ত্বানুসারে বলা হইল যে,মনই বন্ধন ও মোক্ষের কারণ, অতএব সেই মনোময় কোষবিজ্ঞানে,জীব কেন মায়াতে আবদ্ধ এবং কি উপায়ে বা মায়া হইতে মুক্ত হইতে পারে, এই অবস্থা বোধ হইয়া থাকে। এই জন্য মনোময় কোষজ্ঞান, কি বৈরাগী কি ঘোর সংসারী সকলেরই প্রয়োজনীয় হইতেছে।

চতুর্থ কোষের নাম বিজ্ঞানময় হইতেছে। বুদ্ধির সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি মিলিত হইয়া মনঃকল্পিত ভোগ্য বিষয়ে সুখদুঃখানুভব করে বলিয়া ইহাকে বিজ্ঞানময় কহে। বিশেষ বিষয় ভোগ জনিত অনুভব যাহাতে জন্মে তাহাকে বিজ্ঞান কহে। বুদ্ধির সহিত চিত্তের মিলন আছে। চিত্তের মধ্যে পূর্ব্ব সংস্কাব বর্ত্তমান। সেই সংস্কারানুসারে মনোময় কোষে যে বিষয় অনুভূত হইল, তাহা সুখের কি দুঃখেব এই সদসৎ নিশ্চয় করিবার ক্ষমতা একমাত্র বুদ্ধির আছে। সেই নিশ্চয় করণই হইল ভোগ। আমাব চিত্তে বা স্মৃতিস্থলে যতদূব সৌন্দর্য্য সংস্কার আছে, কোন একটি সুন্দর বিষয় চক্ষু নামক জ্ঞানেন্দ্রিয় যোগে মনের অনুভূতির সহিত বুদ্ধির নিকটে যখন বস্থ ছিল, বুদ্ধি তৎক্ষণাৎ সেই সৌন্দর্য্যকে চিত্তস্থ সৌন্দর্য্যসংস্কারের সহিত তুলনা করিয়া উত্তম কি মধ্যম স্থির করিয়া দিল। এই নিশ্চয়ের নামই হইতেছে ভোগ। এই উপায় দ্বারা চক্ষে রূপ, কর্ণে শব্দ, রসনায় রস, ত্বকে স্পর্শ নাসায় গন্ধ উপভোগ হইয়া থাকে। এই উপভোগে মন যতক্ষণ মুগ্ধ থাকে ততক্ষণেই বুদ্ধি সেই ভোগ নিশ্চয়ে উন্মত্ত থাকে। মনেব বিশুদ্ধি ঘটিলেই বুদ্ধিব বিশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলে আত্মাব ভোগ জনিত আবরণ লয় হয়।

এই যে বুদ্ধি ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযুক্ত আবরণ, ইহাই আত্মার প্রধান আবরণ হইতেছে, আত্মা এই আবরণে আবৃত থাকিয়া ভোগের অধীন থাকেন। ভোগের অধীন বলিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি,

শোক, তাপ প্রভৃতির সাক্ষী হইয়া মায়ার অধীন হইয়া থাকেন। শরীরের বায়ু, পিত্ত, কফ প্রভৃতি অতি সামান্য অংশ বিকৃত হইলে যদি ব্যাধি উপস্থিত হয়, সেই ব্যাধিতে সমস্ত দেহ অভিভূত হইয়া পড়ে। তদ্রূপ মায়া আত্মার শক্তি হইলেও ভোগাদিতে সেই শক্তি বিকৃত হইয়া আত্মাকে অভিভূত করিয়া থাকে। এই জন্য এই বিজ্ঞানময়কোষাবৃত আত্মাবস্থাকে জীব কহে। এই জীবভাবই লিঙ্গশরীরের সহিত স্থূল দেহ ক্ষয়ে পরকালে বর্ত্তমান থাকে এবং ইহকালে সকল দুঃখ ও সুখভোগের সাক্ষী থাকে। যে জীবত্ব লইয়া চরাচর বর্ত্তমান, যাহার অভিমানে আমরা পরমাত্মা ভুলিয়া আছি, তাহা আর কিছুই নহে, কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় সহযোগে আত্মচৈতন্য-সত্বার উপভোগাবস্থা মাত্র। পূর্ণচৈতন্য নহে, চৈতন্যের ভোগাবস্থা মাত্র। যখন ভোগসম্পন্ন অপূর্ণ চৈতন্যের সত্বাতেই, আমরা ভোগকালে জরা, মৃত্যু প্রভৃতির ভয় রাখিনা, তখন পূর্ণচৈতন্য যদি আমাদের অনুভব হয়, তবে আমরা যে কতদূর নির্ভয় ও স্বাধীন হইতে পারি, তাহা বাক্যাতীত হইতেছে। অতএব বিজ্ঞানময় কোষজ্ঞানে আমাদের জীবাবস্থা বোধ হয়। এ বিষয়ে ঋক্শ্রুতি বলিতেছেন ;—

"স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি
ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি।"

অস্যার্থঃ—সেই আত্মা এক হইয়াও জীব ভাবে ইহ ও পরলোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। বিষয়ধ্যান করিতেছেন (এই ভ্রান্তির ন্যায়) বিষয়ভোগজাত লীলাও করিয়া থাকেন।

এ বিষয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন ;—

"যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদিস্ফুরত্যয়ং জ্যোতিঃ।
কূটস্থঃ সন্নাত্মা, ভোক্তা, কর্ত্তা, ভবত্যুপাধিস্থঃ॥"

অস্যার্থঃ—সেই আত্মা যিনি বিজ্ঞানময় কোষে মণ্ডিত হয়েন, তিনি প্রাণাদি পঞ্চবায়ু যোগে হৃদয়ে আকর্ষিত হইয়া, তথায় চৈতন্যজ্যোতিঃ প্রকাশপূর্ব্বক বিরাজিত হয়েন। তিনিই বিশুদ্ধ হইয়া সাক্ষীরূপে

কর্ত্তা ও ভোক্তা প্রভৃতি উপাধিতে উপাধিভূত হইয়া থাকেন।

এই জীবভাবীয় অবস্থাটি শাক্তনন্দতন্ত্রে ও যোগীযাজ্ঞবল্ক্যে বিশেষ বর্ণনা করিয়াছে, তাহার একটি পরিচয় এই যথা—

"প্রদীপকলিকাকারো জীবোহৃদি সদাস্থিতঃ।
রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ।
গুণবদ্ধস্তথা জীবঃ প্রাণাপানেন কৃষ্যতে॥

অস্যার্থঃ—এই দেহের হৃদয়দেশে জীবভাবটি দীপকলিকার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া বর্ত্তমান আছে। একটি দীর্ঘ রজ্জুতে শ্যেন পক্ষীকে বাঁধিলে সে যদি উড়িয়া যায়, পুনরায় রজ্জুর আকর্ষণে তাহাকে যেমন পুনরায় পূর্ব্ব স্থানে আনা যায়; তদ্রূপ ভোগজাত বিষয়গুণে বদ্ধজীব, প্রাণ ও অপানাদি বায়ুর আকর্ষণে বারম্বার জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে।

এই সকল তত্ত্বালোচনায় বেশ বোধ হইল যেঃ—বিজ্ঞানময় কোষমধ্যগত জীব প্রাণাপানবায়ুময় হইয়া অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। এই সূক্ষ্ম বায়ুময় অবস্থা দেহ ধারণেও বোধ হয় না, দেহ ক্ষয়েও বোধ হয় না। পুনর্দ্দেহ গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বকালে যে ভাবে প্রাণময় জীবভাব থাকে, তদ্বিষয়ে চণ্ডিকাতন্ত্র বলিতেছেঃ—

"মায়াদেহঃ পরেশাণি বায়ুরূপো ন চান্যথা।
বায়ুরূপো যতো দেহ আকাশস্থো নিরাশ্রয়ঃ॥

অস্যার্থঃ—মায়া ভোগ জনিত উপাধিগ্রস্থ জীবের যে সূক্ষ্ম দেহ; হে পরেশানি! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তাহা বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য হইতেছে। বায়ুর ন্যায় সেই দেহ সূক্ষ্ম বলিয়া স্থূল দেহ ত্যাগে কোন প্রকার স্থূলাধার বিহীন হইয়াও বায়ুর ন্যায় আকাশে বর্ত্তমান থাকে।

এই প্রাণাদি বায়ুতে মণ্ডিত বলিয়া পুত্রাদিতে সেই জীবের শক্তি সম্বন্ধ থাকায়, পরকালেও পুত্রাদির সাধন বলে ও শ্রাদ্ধাদিতে পূর্ব্বজীবের কর্ম্মশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। একথা শ্রাদ্ধতত্ত্বে প্রকাশ করা

যাইবে। এই বিজ্ঞানময় কোষ জ্ঞানে জীবের ভোগ ও মোক্ষতত্ত্ব এবং আত্মার জীবভাব বিশেষ বোধ হইয়া থাকে। কোন কোন নাস্তিক শাস্ত্রে এই বিজ্ঞানময় কোষসমন্বিত জীবভাবকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করে। এই জীবভাবের অতীত যে বিশুদ্ধ মায়াতীত পরমাত্ম-ভাব আছে, তাহা স্বীকার করে না। আত্মবাদী আর্য্যশাস্ত্রকারগণ তাহাদের যুক্তিকে এই দোষ দেখাইয়া খণ্ডন করেন:—তাঁহারা বলেন; আত্মা সকল অবস্থাতেই নিত্য ও বিকৃত নহেন; এই বিজ্ঞানময় কোষ অর্থাৎ সুখদুঃখ নিশ্চয়াত্মক অবস্থা কখন নিত্য হইতে পারে না। কারণ জাগরণ ও স্বপ্ন এই উভয় অবস্থাতেই জীবের সুখ ও দুঃখ নিশ্চয় হইয়া থাকে; পূর্ণ নিদ্রাবস্থায় যখন তদনুভব হয় না, তখন এই ভোগাবস্থা সংযুক্ত চৈতন্য বা জীবাবস্থাকে নিত্য বলা যায় না, এবং আত্মাও বলা যায় না। তবে সত্য বলিয়া কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বে অভিমান দেখা যায় কেন? তদ্বিষয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন:—

"উপাধিসম্বন্ধবশাৎ পরাত্মাপ্যুপাধি ধর্ম্মানুভাতি তদ্গুণঃ।
অয়োবিকারঃ ন বিকারি বহ্নিবৎ সদেকরূপোঽপি পরঃ স্বভাবাৎ॥

অস্যার্থঃ—এই যে জীব ও আত্মা ইহারা একই বস্তু। সুখ দুঃখাদি, গুণোপাধিতে সম্বন্ধীভূত হইয়া সেই আত্মাই জীবরূপে কল্পিত হইয়াছেন। ইহাতে আত্মার বিকার ঘটিতে পারে না!! যেমন লৌহের সহিত অগ্নির সম্মিলন ঘটিলে সেই লৌহ দাহাদি কার্য্য অগ্নি তেজে করিয়া থাকে, কিন্তু অগ্নি কি কখন লৌহ মিলনে মলিন হয়? যতক্ষণ লৌহ সংস্রব ততক্ষণ অগ্নি লৌহ উপাধি বিশিষ্ট থাকে। তদ্রূপ আত্মা যতক্ষণ বিজ্ঞানাদি কোষে আবৃত, ততক্ষণ কর্ত্তা, ভোক্তা অর্থাৎ প্রাণাদির শক্তিবিধাতা মাত্র। অন্নপ্রাণাদি কোষক্ষয়ে আত্মা যেমন বিশুদ্ধ তেমনিই থাকেন। পঞ্চমকোষের নাম আনন্দময় হইতেছে। সুষুপ্তি কালেতে অন্ন, প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানময় কোষ চতুষ্টয়ের যখন বিরতি ঘটে; তখন আত্মা কর্ম্ম হইতে বিরতি লাভ করিয়া যে নিজ সুখাবস্থা অনুভব করেন; এই আনন্দানুভূতিই আনন্দ-

কোষ নামে অভিহিত। স্বভাব বিকৃত না হইলে, পুণ্যাদি কার্য্য করিলে, জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থায়ও এই আনন্দ কিছু কিছু উপভোগ হয়। যদিও আনন্দটি সকলের সুখপ্রদায়ী বটে। কিন্তু তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ কহেন; অন্যান্য কোষের দ্বারা জাগরন ও স্বপ্নাবস্থায় যে সকল সুখ ও দুঃখ ভোগে জীব কষ্ট অনুভব করেন; নিদ্রাবস্থায় রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি; আসক্তি প্রভৃতি সকল ক্রিয়াই মন ও বুদ্ধির ক্ষয়ে অনুভূত হয় না বলিয়া কষ্টের বিরতি মাত্র ঘটে। সেই দুঃখবিরতির অনুভূতি মাত্র এই আনন্দময় কোষে অনুভব হয়। আবার জাগরণে, স্বপ্নে তাহার হানি ঘটিয়া থাকে। পুণ্যাদি কর্ম্মে আসক্তির ক্ষয় হয় বলিয়া, জাগরণ ও স্বপ্নে কিছু সুখ বোধ হইয়া থাকে। ইহাতে বিশেষ করিয়া বলা হইল যে, আনন্দময় অবস্থাটি যদিও সুখকর ও অভীপ্সিত বটে তাহা ভোগীর পক্ষে। ভোগী এই অবস্থা পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া ভোগ করিতে সক্ষম হইলে তাহার দুঃখ হানি হয়। এই অবস্থায় উন্নত হইলে, বুদ্ধি প্রভৃতির ক্ষয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য হয় না, অতএব উষ্ণ, শৈত্য, মিষ্টতিক্ত, সুখদুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব কখনই জীবকে অভিভূত করিতে পারে না। কিন্তু জীবের স্বভাব হইতেছে চিদানন্দময়ে থাকা। জীব নিজ স্বভাবরূপী নিজ চৈতন্যের অনুভব নিদ্রায় করে বলিয়া এই আনন্দ লাভ করে। যখন সেই জীব পূর্ণ চৈতন্য মণ্ডিত অর্থাৎ আত্মভাব পূর্ণ থাকিবে তখন অক্ষয় আনন্দলাভ করিবেই করিবে। মুমুক্ষু ব্যক্তির এই অবস্থাই অভিপ্রেত হইতেছে। এই জন্য শ্রী জনকাদি রাজর্ষিগণ ভোগের শেষ সীমা ভোগ করিয়া আনন্দময় কোষের উন্নতি একদিকে করিয়াছিলেন, অন্যদিকে মুক্তিকে অর্থাৎ পূর্ণচৈতন্যে মিশ্রিত থাকিয়া আনন্দভোগকে করামলকবৎ নিকটবর্ত্তী রাখিয়া অন্তে তাহাতে পর্য্যবসিত হইয়াছিলেন। এই অবস্থাতে সকল দুঃখ ক্ষয় হইয়া পরমানন্দ ভোগ হয় বলিয়া, ভক্তে সেবা প্রভৃতি ভিন্ন সহজে মুক্তি লইতে চাহেন না। এ কথা পরে বিচার হইবে। যদিও এই কোষ সুখকর বটে, কিন্তু কখন না কখন

অনন্তাসহেতু ক্ষয় ঘটে; এই জন্য সাধুগণে এই কোষকেও ক্ষয় করিতে বিধান দিয়াছেন। কোন কোন নাস্তিক শাস্ত্রে এই আনন্দময় উপাধিকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু আত্মবাদী আর্য্যঋষিগণ তাঁহাদের যুক্তিতে এই দোষ প্রদর্শন করেন। তাঁহারা বলেনযে যেঃ—আনন্দময় অবস্থাটি দেহ ভোগ হইবার অবস্থা বিশেষে অর্থাৎ নিদ্রাদিতে অনুভব হয়, সুকৃতি লাভ জন্য পুণ্যকর্ম্মে অনুভূত হয়; নিদ্রাক্ষয়ে বা পাপ কর্ম্মে প্রকাশ থাকে না। তখন সে অবস্থা সদা প্রকাশমান নহে। যাহা সদা প্রকাশমান নহে, তাহা আত্মা হইতে পারে না। উহা আত্মার অবস্থা বিশেষমাত্র হইতেছে। শ্রীশঙ্করা-চার্য্য এ বিষয়ে বলিতেছেনঃ—

"নৈবায়মানন্দময়ঃ পরাত্মা সোপাধিকত্বাৎ প্রকৃতের্ব্বিকারাৎ।
কার্য্যত্বহেতো সুকৃতিক্রিয়ায়া বিকারসংঘাতসমাহিতত্বাৎ॥"

অস্যার্থঃ—প্রকৃতি ও বিকারাদির অবস্থা ভেদে উপাধি বিশেষে যখন নিদ্রাদিকালে আনন্দময় অবস্থাটির অনুভব হয়, সুকৃতিসঞ্জাত ক্রিয়াফল বিশেষ অনুভূত হইলে যাহা অনুভব হয় মাত্র, তখন সেই আনন্দময় অবস্থাটি কখনই প্রকৃতির অতীত আত্মা হইতে পারে না। (কারণ নিদ্রাদি অবস্থা প্রকৃতি ও বিকারষোড়শের অবস্থা বিশেষে ঘটিতেছে।)

আনন্দটি কি এ বিষয়ে প্রপঞ্চসারতন্ত্র বলিতেছেনঃ—

"পুণ্যভোগে ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে।
কাচিদন্তর্মুখাবৃত্তিরানন্দপ্রতিবিম্বভাক্॥

অস্যার্থঃ—(জীবের ভোগাবস্থায় আনন্দময় কোষ হইতে যে আনন্দ অনুভব হয় তাহা এই যথাঃ—) পুণ্য কার্য্য ভোগ করিলে যে ফললাভ হয়, তদ্বারা চিত্তের যে বৃত্তিটি অন্তরের অনুভবের জন্য বর্ত্তমান আছে, তাহা বিশুদ্ধ হওয়াতে (চন্দ্রবিম্বপতনের ন্যায়) আত্মার আনন্দময় প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হয়। সেই প্রতিবিম্ব ভোগ করিয়া যে তৃপ্তি সেই চিত্তবৃত্তি লাভ করে, তাহাকেই জীবানন্দ কহে।

এই সকল যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা হইল যে, আনন্দময়কোষটিও ভোগের জন্য বর্ত্তমান। এই শেষ তত্ত্ব বোধ হইলে আত্মাকেই আনন্দস্বরূপ বোধ হয়, এবং তাঁহাতে নিষ্ঠা উপস্থিত হইয়া থাকে। অত-এব মানবমাত্রেরই এই কোষতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওন নিতান্ত আবশ্যকীয় হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সূক্ষ্ম দেহে জাগরণ, স্বপ্ন ও নিদ্রা এই তিনটি অবস্থা ভোগ হইয়া থাকে। একে একে প্রধান প্রধান বৃত্তিগুলির পরিচয় দিয়া সূক্ষ্ম দেহতত্ত্ববিষয়ের পরিচয় দেওয়া হইল। উপাসনার অনুষ্ঠানে এই তত্ত্বজ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। সকলেরই এই বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক হইতেছে।

অথ ভোগতত্ত্ব।

এই যে দেহ পাইয়াছি, ইহার স্থূল গঠন ও সূক্ষ্ম গঠনের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময় কোষাচ্ছাদিত আত্মা; যাঁহার জীব সংজ্ঞা ইহ সংসারে বর্ত্তমান আছে। তিনি চৈতন্য প্রদান করিলেই পূর্ব্বকর্ম্ম ও স্বভাবানুসারে সূক্ষ্মে ও স্থূলে বহুতর ক্রিয়া প্রকাশ হইয়া থাকে। স্থূল ও সূক্ষ্মের যন্ত্রগুলি যে ভাবে গঠিত, তাহাতে যে যে স্বভাব আছে, পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে তাহারা সক্রিয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ চক্ষের রূপ দেখা স্বভাব, জিহ্বার রস আস্বাদন স্বভাব, হস্তের গ্রহণ, পদের গমন ইত্যাদি নিত্য স্বভাব হইতেছে। পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে মানবদেহে পূর্ব্বস্বভাব যে ইন্দ্রিয়ের যেমন আছে; আত্মার জীবরূপে অবস্থিতিকালে উহারা সেই সেই স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। এই স্বভাব প্রকাশাত্মক ক্রিয়া হইতে যে ফলানুভূতি জীবাত্মা বিজ্ঞানময় কোষ সহকারে করেন; তাহাকেই ভোগ কহে।

যেমন শিশু জড়পিণ্ডবৎ জন্মাইবার অব্যবহিত পরে, জিহ্বায়

গুন্যরস স্পর্শন যেমন পাইল, অমনি জিহ্বা স্বভাবানুসারে রসাস্বাদনের ক্রিয়া করিতে থাকিল, সেই আস্বাদন হইতে যে তৃপ্তিরূপী ফল হইল, এই ফল জীবাত্মা অনুভব করিলেন। এই অনুভূতিকেই ভোগ কহে।

ইন্দ্রিয় প্রণালী, মনাদি সূক্ষ্ম শক্তি প্রভৃতির মধ্যে যাহার যাহা স্বভাব, তাহা জীবাত্মার স্পর্শকাল হইতে পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে প্রকাশ হইয়া থাকে। জীবাত্মা স্পর্শ না করিলে মৃতদেহে ঐ সকল ইন্দ্রিয় প্রণালী থাকিলেও ক্রিয়ার বিকাশ হয় না। যতক্ষণ বিজ্ঞানময় কোষে বুদ্ধির সাক্ষী হইয়া জীবচৈতন্য বর্ত্তমান, ততক্ষণ, সকলের স্বভাব প্রকাশক ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়।

পূর্ব্বে কর্ম্মতত্ত্বে বলা হইয়াছে, ত্রিবিধ উপায়ে সেই কর্ম্মভোগ জীবদেহে প্রকটিত হইয়া থাকে। প্রথমের নাম প্রারব্ধ, দ্বিতীযের নাম ক্রিয়মান্ বা আগামী, তৃতায়ের নাম সঞ্চিত হইতেছে। ঐ প্রারব্ধভোগই ক্রমে ক্রমে আর দুই কর্ম্মের বিকাশ করিয়া থাকে। প্রারব্ধানুসারে আমরা মানব দেহ পাইয়াছি। প্রারব্ধ অনুসারে আমাদের সূক্ষ্ম দেহ এবং স্থূল দেহ গঠিত হইয়াছে। প্রারব্ধ অনুসারে আমাদের বাহ্য ও অন্তরের ইন্দ্রিয় ও ক্রিযাশক্তিগুলি স্বভাব লাভ করিয়াছে। অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন কর্ম্ম ও স্বভাবের পার্থক্য কি আছে? তদুত্তর এই যথাঃ—কর্ম্মানুসারে জীবে দেহ লাভ করে। তন্মধ্যে পক্ষীগণের পক্ষ আকাশে উড়িবার স্বভাব পাইয়াছে; তাহাদের মুখ আমাদের হস্তের ন্যায় গ্রহণের ক্ষমতা পাইয়াছে। বানরের উল্লম্ফন, পক্ষীর আকাশে গমন, মীনের সন্তরণ ইত্যাদিই স্বভাব হইতেছে। যাহার যেরূপ প্রারব্ধ, তাহার সেইরূপ গঠন হয়, এবং সেই গঠনের যন্ত্রগুলি পূর্ব্বকর্ম্ম নিস্পাদনেরই স্বভাব পাইয়া থাকে। প্রত্যেক জন্মের দেহজাত যন্ত্রগুলির স্বভাব নিস্পাদন জন্য একটি পরিণাম আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই পরিণাম হইতে হয় সুখ না হয় দুঃখ উভয় অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। জীব তাহা অনুভব করেন। জীবের ঐ অনুভব-কেই ভোগ কহে।

যে ভোগের তত্ত্ব আমরা না বুঝিয়া দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও পশু হইতেছি, যে ভোগে উন্মত্ত হইয়া আমরা হিতাহিত বিবেকশূন্য হইতেছি। যে ভোগে বাধা পড়িবে বলিয়া আমরা বৈরাগ্য চাহি না। যে ভোগ ক্ষয় হইবে বলিয়া আমরা আত্মজ্ঞান চাহি না। আত্মজ্ঞান চাহি না বলিয়া কত শত লোকে আত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্ম প্রভৃতির সত্ত্বা স্বীকারও করে না। যে ভোগে বাধা পড়িবে বলিয়া অনন্ত নরকভোগ অস্বীকার করি। জন্মান্তর অস্বীকার করিয়া থাকি। ভোগের জন্যই আমরা অসত্য দেহাদিকে সত্য বলি। স্নেহ, মায়া, মমতাদি ভ্রান্তি হইলেও উহাদের সমাদর করিয়া থাকি। যে ভোগের জন্য ভ্রান্ত হইয়া অনন্ত দুঃখ, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতিতে নিপীড়িত হইয়াও আমরা শান্তির দিকে দৃক্‌পাতও করি না। সেই ভোগতত্ত্ব জানা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইতেছে।

মানবদেহে এই ভোগ বহু উপায়ে ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। প্রথম কর্ম্ম ভোগ। দ্বিতীয় কর্ম্মফল অর্থাৎ সুখদুঃখ ভোগ। তৃতীয় পাপ-পুণ্য ভোগ। চতুর্থ বিষয়ভোগ। পঞ্চম রিপুভোগ। ষষ্ঠ সংসার ভোগ। একই কর্ম্মভোগ এই ছয় উপায়ে আমাদের দ্বারা ভুক্ত হইয়া থাকে।

প্রথমে আমাদের কর্ম্মভোগ বুঝা উচিত হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইল যে; প্রারব্ধ, আগামী এবং সঞ্চিত এই ত্রিবিধ উপায়ে আমাদের কর্ম্ম ভোগ হয়। যে কর্ম্মটিকে আশ্রয় করিয়া আমাদের সূক্ষ্মদেহ ও স্থুলদেহ গঠিত হইয়াছে, এবং ঐ দেহ কি কার্য্য করিবে এরূপ স্বভাব পাইয়াছে, তাহাকে প্রারব্ধ কর্ম্ম কহে। এই প্রারব্ধক্রিয়া প্রকাশ হইতে সংসারের সহিত অন্যান্য কর্ম্মীজীবের সম্মিলনে যে একটি নূতন কর্ম্মাবস্থার অভ্যাস হয়, তাহাকে আগামী বা ক্রিয়মান্ কর্ম্ম কহে। আর ঐ দুই কর্ম্ম ইহ দেহে জীবকর্তৃক ভুক্ত হইলে যে সংস্কারটি থাকিয়া গেল,তাহাকে সঞ্চিত কহে। তাহাই পর জন্মের প্রারব্ধ হইবে। এই প্রারব্ধ কর্ম্মই বিজ্ঞানময় কোষসংযুক্ত জীবাত্মাকে জন্ম, মৃত্যু,

সুখ ও দুঃখাদির অধিকারী করিয়া থাকে। এই তিনকে প্রকৃতিজাত কর্ম্ম কহে। এই সকল কর্ম্মের ক্ষয় অর্থাৎ নাশ করিবার কৌশল আছে। সেই কৌশলের নামই উপাসনা হইতেছে। সঞ্চিত কর্ম্মকে অর্থাৎ ভোগ করিতে করিতে পরিণাম সংস্কার যাহা চিত্তে থাকিয়া যায়, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত বা ঔষধাদির দ্বারা ক্ষয় করা যায়। যেমন এক জন মদ্যপান করিতে করিতে তৎসংস্কারীভূত হইয়া গিয়াছে, তাহার পরিণাম অর্থাৎ সঞ্চিত উন্মাদ বা রোগগ্রস্থ অবস্থাভোগকে সঞ্চিত ভোগ কহে। প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ মনাদি বৃত্তির শোধনে বা ঔষধে ইহার বিশুদ্ধি ঘটাইতে পারা যায়। আগামী অর্থাৎ যে কর্ম্মাবস্থা ক্ষণে ক্ষণে ভোগ হইতেছে, যাহার ফল রোগ, শোক, তাপ, জ্বরা প্রভৃতি; তাহাকে তপস্যা অর্থাৎ ব্রতনিয়ম ও আত্মজ্ঞানাদির সহযোগে নাশ করা যাইতে পারে। প্রারব্ধ অর্থাৎ যাহার জন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ করিতে হয়, জন্মভোগে বাসনা ক্ষয় করিতে না পারিলে, ইহার ক্ষয় হয় না। এই প্রারব্ধাদি সকল কর্ম্মভোগই সুখ ও দুঃখ প্রকাশক হইতেছে। ঐ সকলের ভোগে দুঃখই সর্ব্বদা লাভ হয়, কোন কৌশলে দুঃখের কিঞ্চিৎ অবসান যদি হয়, তবেই সুখের অনুভূতি হয়। সুখ বলিতে দুঃখের ক্ষণবিরতি মাত্র। যেমন ক্ষুধা অতিশয় দুঃখ, আহার মাত্রে ক্ষুধার তৃপ্তি হইলে, সুখ বটে। আবার ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইলে পুনরায় ক্ষুধারূপী দুঃখের উদয় হয়। এইরূপ খের কিঞ্চিৎ বিরতিকে সুখ কহে।

যদি বলেন যেঃ—জন্মাদি কাল হইতে বা গর্ভাবস্থা হইতে, কোন অনুভব বা ভোগ যখন হইল না; তখন কর্ম্ম জন্য দুঃখাদি ভোগ কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে!! দুঃখভোগরূপী ফলটি বাহ্য ও অন্তরের লক্ষণ দ্বারা বোধ হইয়া থাকে। বাগাদি ইন্দ্রিয়ের স্ফূর্ত্তি থাকিলে শব্দাদিতে ও অঙ্গবৈকল্যে দুঃখ প্রকাশ হয়।

বাগাদি ইন্দ্রিয়ের স্ফূর্ত্তি যে অবস্থায় থাকেনা, তখন কেবল অঙ্গ-বৈকল্য দর্শনে ক্লেশের অনুভূতি হইয়া থাকে। আমাদের গর্ভাবস্থায়

ইন্দ্রিয়াদি প্রকাশিত অর্থাৎ কার্য্যক্ষম থাকে না, কেবল দেহগঠন মাত্র প্রকটিত থাকে। সেই অবস্থায় অঙ্গের লক্ষণ দেখিলে, গর্ভস্থ বালকের অন্তর সুখ কি দুঃখ ভোগ করিতেছে,ইহা বোধ হইয়া থাকে। গর্ভতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণে কহেন এবং আমরা বর্ত্তমানে চক্ষেও দেখিতে পাই :—গর্ভস্থ শিশুর ললাট কুঞ্চিত থাকে, করদ্বয় সংযুক্ত থাকে। পদদ্বয় বক্র ও পৃষ্ঠদেশ বক্র থাকে। এইরূপে ক্রমে তাহার শরীরে যত চৈতন্যের অধিক বিকাশ হয়, ততই তাহার ঐ সকল চিহ্ন দেহে অধিক বিকাশ পাইয়া থাকে। এই বিষয়টী বুঝাইতে সারদাতিলক তন্ত্র বলিতেছেনঃ—

"ইত্থংভূতস্তদা গর্ভে পূর্ব্বজন্ম শুভাশুভং।
স্মরং তিষ্ঠতি, দুঃখাত্মা, ছন্নদেহো জরায়ুনা ॥

অস্যার্থঃ—জীব এইরূপে গর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক (দেহ পাইয়া) জরায়ুতেজদ্বারা পূর্ব্ব জন্মের শুভাশুভ কর্ম্ম স্মরণ করিতে করিতে অতি দুঃখিত ও ক্লেশপূর্ণ দেহাচ্ছন্ন হইয়া থাকে।

গর্ভের ক্লেশাবস্থা বর্ণনা করিতে শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী তন্ত্র-বলিতেছেনঃ—

"কৃতাঞ্জলির্ললাটেঽসৌ মাতৃপৃষ্ঠমভিশ্রিতঃ।
অধ্যাস্তে সংকুচদ্গাত্রো, গর্ভে দক্ষিণপার্শ্বগঃ ॥
পূর্ব্বার্জ্জিতং কর্ম্মফলং পূর্ব্বপূর্ব্বতরার্জ্জিতং।
জীব প্রবেশনং কুর্য্যাৎ পূর্ব্ব কর্ম্ম বুভুক্ষয়া ॥
সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চৈব যৎকৃতং পূর্ব্বজন্মনি।
তৎসর্ব্বং সফলং জ্ঞাত্বা ঊর্দ্ধপাদস্ত্বধোমুখঃ ॥"

অস্যার্থঃ—জীব গর্ভের মধ্যে উভয় হস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া ললাটে রক্ষা পূর্ব্বক মাতার পৃষ্ঠভাগে লুকাইতে চেষ্টা করে। গর্ভের দক্ষিণভাগে যাইয়া, পূর্ব্ব কর্ম্ম স্মরণে কাতর হইয়া অঙ্গগুলিকে সংকোচ করিয়া থাকে। বহু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য, জীব গর্ভে আসিয়া প্রবেশ করে। যেরূপ সুকৃতি বা দুষ্কৃতি ভাব সম্পন্ন কার্য্য পূর্ব্বজন্মে করা হইয়াছে, তাহা ইহ জন্মে সফল অর্থাৎ

ভোগ হইবে ভাবিয়া ভয়ে ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে জরায়ু মধ্যে (গড়াইয়া পড়ে)।”

পাশ্চাত্য গর্ভতত্ত্ব শাস্ত্রে এই ঊর্দ্ধপদ ও অধোমুখাবস্থার স্বীকার আছে, কিন্তু সেই সেই শাস্ত্রকর্ত্তা পণ্ডিতগণ গর্ভাবস্থায় জীবের অনুভূতি উপস্থিত হয় এই কথা স্বীকার করেন মাত্র। ঐ অনুভূতি ক্লেশ জন্য কি না? তাহার বিশেষ কথা বলেন না। এবং অধোমুখ ও হস্তপদাদির কুঞ্চনাবস্থা কেন ঘটে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের ব্যাখ্যা এই—ক্রমে ক্রমে রসভারে গর্ভস্থ দেহের শিরোদেশ গুরু হয় বলিয়া, নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হয়, আর শক্তিহীন বলিয়া কুঞ্চনাদি ঘটিয়া থাকে। এই যুক্তি অতিশয় ভ্রমাত্মক। দেহের সর্ব্বাঙ্গ একদিকে, আর মস্তক অন্যদিকে। দেহের সর্ব্বাঙ্গ হইতে মস্তক গুরু, এ কথা কোন্ বুদ্ধিমানে স্বীকার করিতে পারেন? আর শক্তি ক্ষীণ থাকিলে অঙ্গ কৃশ ও পলিতই হইবে। ললাটে জোড় করে থাকিবার, ক্রমে পশ্চাতে মুখ ফিরাইবার প্রয়োজন কি!! ভীত ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ কুঞ্চিত করিবার প্রয়োজন কি? তাঁহারা গর্ভের মধ্যে অনুভূতি স্বীকার করেন, কিন্তু সেই অনুভূতি যখন সর্ব্বাঙ্গ লক্ষণে প্রকাশ পাইল এবং তাহা দুঃখের লক্ষণে লক্ষিত হইল, তখন গর্ভাবস্থায় জীব দুঃখ স্মরণ করে এ বিষয় স্বীকার করিতে হানি কি? এই অবস্থাটি স্বীকার করিলে জন্মান্তর স্বীকার করিতে হয়। তাঁহাদের উপাসনা ধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটে। এই কৌশল সংস্থাপন জন্য এই অবস্থাটি দুঃখের বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই বুঝিতে হইবে।

ক্রমে ক্রমে বহুদুঃখ ভোগ করিতে করিতে গর্ভেই পূর্ব্ব স্মৃতি ক্ষয় হয়, কিন্তু সংস্কার থাকিয়া যায়। যেমন ভীষণ শোকে, ভীষণ আঘাতে লোকের স্মৃতি ক্ষয় হয়। অতি দুঃখের জন্য স্মৃতি ক্ষয় হয়। সেইরূপ গর্ভ জন্য অতি দুঃখে পূর্ব্বস্মৃতি ক্ষয় হয়। দৈবাৎ দুই এক জনের স্মৃতি জন্মাইবার পরেও বর্ত্তমান থাকে। স্মৃতি লুপ্ত হইল বটে, কিন্তু কোন কর্ম্মের স্মৃতি না থাকিলে তাহার সংস্কার কখন প্রকাশ হইতে পারে না। যেমন কোন একটি ব্যক্তি জাগরণে যে সকল কার্য্য করিয়াছিল,

ভীষণ ব্যাধি জনিত বিকারে যখন তাহার স্মৃতি ক্ষয় হয়, তখন পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে যে দুষ্ট লোক থাকে সে মারিতে ধরিতে উঠে, যে জজ থাকে সে হয়তো রায় লেখার কথা বলে। এইরূপ প্রমাণে দেখা যায় যে; পূর্ব্বাভ্যস্ত কর্ম্ম হইতে স্মৃতির উৎপত্তি হয়, সেই স্মৃতি অনুসারে আমরা কার্য্য নির্ব্বাহ করি। কোন উৎকট দুঃখে স্মৃতি ক্ষয় হইলে তাহার সংস্কার থাকিয়া যায়। সেই সংস্কারই আবার কর্ম্মের প্রকাশক হইয়া থাকে। এই নিয়মে গর্ভস্থ শিশুদেহে যে স্মৃতি, অভি ক্লেশানুভবে ক্ষয় হয়, তাহার সংস্কার থাকে। জন্মের অব্যবহিত পরেই শিশু সেই অভ্যস্ত সংস্কারানুসারে সুখে দুঃখে হাসিতে কাঁদিতে থাকে। দুঃখানুভূতি যে ক্রন্দনে ও অঙ্গ বৈকল্যে প্রকাশ হয় এ অভ্যাস শিশুর জন্মের পরক্ষণে কোথা হইতে আসিল? পূর্ব্ব স্মৃতি জনিত সংস্কার অনুসারে লাভ হইয়া থাকে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, আমরা গর্ভে যখন দুঃখের চিহ্নগুলি ধারণ করি এবং জন্মাইবার পরেই ক্রন্দনাদিতে দুঃখ প্রকাশ করিতে পারি, তখন আমরা ঘোর দুঃখ জনিত প্রারব্ধ পাইয়া এই দেহ গ্রহণ করিয়াছি। এই বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়া শ্রীমনু মহর্ষি বলিয়াছেনঃ—

"যাদৃশেনতু ভাবেন যদযৎ কর্ম্ম নিষেবেত।
তাদৃশেন শরীরেণ তত্তৎ ফলমশ্নুতে॥"

অন্বার্থঃ—পূর্ব্বজন্মে বা ইহ জন্মে যেরূপ ভাবে কর্ম্ম সম্পন্ন করা হয়, সেই অনুরূপ কর্ম্মগুলির ফলভোগ করিবার জন্য জীবে অনুরূপ শরীর লাভ করিয়া থাকে।

এই মনু বচনের সহিত এবং পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবচন ও প্রমাণ সিদ্ধান্তাদিদ্বারা ইহা স্থির হইল যে, আমরা যখন গর্ভ হইতে চির জন্ম দুঃখই অনুভব করিয়া থাকি; তখন আমাদের প্রারব্ধ যে, অত্যন্ত দুঃখময় তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই দুঃখপ্রারব্ধ ক্ষয় করিবার জন্য মানব দেহ হইতেছে, মানব দেহতত্ত্বে বিশেষ বিবৃত হইয়াছে। যেমন সঞ্চিত ও ক্রিয়মান্ বা আগামী কর্ম্মফল ভোগ; প্রায়শ্চিত্ত, ঔষধ, তপস্যা ও আয়

জ্ঞানাদিতে ক্ষয় হয়। সেইরূপ এই প্রারব্ধ কর্ম্মফলভোগ, দেহ সংযোগে চিত্তের বিশুদ্ধি ঘটাইয়া বাসনার ক্ষয় করিতে পারিলেই ক্ষয় হইয়া থাকে। এই জন্য শাক্তানন্দতরঙ্গিনী তন্ত্র বলিতেছেন:—

"প্রারব্ধস্য ভোগ্যং বিনা ন গত্যন্তরমস্তিহি।"

অস্যার্থঃ—স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর সংযোগে বিষয়াদি ভোগ ব্যতীত জীবাত্মার,প্রারব্ধ ক্ষয় হইবার অন্য উপায় নিশ্চয়ই সংসারে বর্ত্তমান নাই" অতএব আমরা সেই দেহ পাইয়াছি। প্রারব্ধ, আগামী ও সঞ্চিত কর্ম্ম-ফলভোগ জন্যই আমাদের এই দেহ ধারণের প্রয়োজন হইতেছে। এই প্রারব্ধ কর্ম্মফল হইতেই সমস্ত ভোগের প্রকাশ, এই জন্য অগ্রে ইহার পরিচয় দিলাম। দুঃখভোগ, পাপপুণ্য ভোগ, বিষয়ভোগ, রিপুভোগ ও সংসারভোগের কথা পরে পরে বলিব। এক্ষণে ভোগ কেমন করিয়া সংসাধিত হয় তাহার মীমাংসা অগ্রে করা হউক। ইতিপূর্ব্বে সূক্ষ্মদেহতত্ত্বে বলা হইয়াছে যেঃ—ভগবানের মায়া নামে যে মহাশক্তি আছে, তাহার নামই প্রকৃতি হইতেছে। সমস্ত সংসারের মূল সত্বাই এই মায়াদেবী হইতেছেন। ইনি আত্মাকে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত করেন, এবং একই ব্রহ্মের শক্তি হইয়া আপনি ও ব্রহ্ম বস্তুকে জগৎ, জীব, স্থূল, সূক্ষ্ম, সকল ব্যাপারেই পরিণত করেন এবং হয়েন। অর্থাৎ মায়া বুঝিতে হইলে ইহাই স্থির জানিতে হইবে যেঃ—ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি। তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারিণী। তিনিই চৈতন্যকে জড়ভাবে পরিণত করেন, তিনি আপনি সকল কার্য্য ও কারণরূপী"—হইতেছেন। তাহার বহু অবস্থা আছে। যে অবস্থাদ্বারা নিষ্ক্রিয় ও বিশুদ্ধ আত্মাকে জীবভাবে পরিণত করা হইয়াছে; সেই অবস্থাকে পরা প্রকৃতি কহে। একথা সূক্ষ্ম দেহ তত্ত্বে দেখান হইয়াছে। সেই আত্মার জীবভাব ঘটনাকারিণী পরা প্রকৃতির দুইটি অবস্থা আছে। একটির নাম আবরণ, আর একটির নাম বিক্ষেপ হইতেছে। ঐ পরা প্রকৃতিতে সম্বন্ধীভূত জীব বিজ্ঞানময় কোষের অনুভূত বিষয়গুলি ভোগ করিয়া আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি

বলে নিজ স্বাধীনতা হারাইয়া ভোগের অধীন হইয়া পড়ে। যে শক্তির দ্বারা স্বরূপজ্ঞান আবৃত হয়, তাহাকে মায়ার আবরণ শক্তি পরা কহে। যেমন সূর্য্যের একদেশ মেঘে ঢাকিলে আমার দৃষ্টির অতীত বলিয় সূর্য্য মেঘে আবৃত হইল আমরা বুঝিয়া থাকি। যেমন রজ্জুবুদ্ধিতে অন্ধকার নিশায় ভ্রান্তি ঘটাইয়া সর্পত্বে আরোপ করে, সেই আরোপিত সর্পবুদ্ধিতে ভ্রান্ত হইয়া আমরা ভীত হইয়া থাকি। এই প্রকৃত জ্ঞান আবরণকারিণী অবস্থাকে আবরণ শক্তি কহে। আত্মা স্বয়ং বিশুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ ও সকল সুখদুঃখাতীত হইলেও এই অবস্থার সহযোগে ভোগ্য বিষয়গুলি অনুভব করিতে করিতে পূর্ব্বজ্ঞান আবৃত হইয়া যায়, এই অবস্থায় জীব আমি ভোক্তা বলিয়া স্থির করিয়া থাকে। আবরণ শক্তিতে জ্ঞানাবৃত হইলে অবস্তুতে যে বস্তু বুদ্ধি উপস্থিত হয় তাহাকে বিক্ষেপ শক্তি কহে। যেমন সর্প নহে অথচ রজ্জুতে সর্প বুদ্ধি, যেমন বর্ণ মধ্যে নীল পীত লোহিতাদি কিছুই নহে কেবল তেজের প্রতিফলন মাত্র, তথাপি তাহাতে বর্ণবুদ্ধি হইয়া থাকে। সেইরূপ জীব এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ভ্রান্তিবশতঃ স্বীকার পূর্ব্বক ভোগ করিয়া থাকেন। এই আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া আত্মা নিজ স্বাধীনতা হারাইয়া চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে যখন ভ্রান্ত হয়েন, তখন তত্ত্বভোগেচ্ছা প্রকাশ হয়। তাহাকেই বাসনা কহে। আত্মার বাসনা তৃপ্তিকেই তত্ত্বশাস্ত্রজ্ঞেরা ভোগ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে স্থির হইল এই যে—আত্মা জীবভাবে যতক্ষণ পরিণত থাকেন, ততক্ষণ আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিবলে অসত্য চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বভোগের ইচ্ছা তাঁহার হয়। সেই তত্ত্ব সংগ্রহার্থ যে চেষ্টা তাহাকেই ভোগ কহে। আত্মা জীব ভাবে ভোক্তা, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব ভোগ্যবস্তু; আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি জীবের ভোগ সংযোজন কারিণী হইতেছেন। এই ভোগ চরিতার্থ হইবার জন্য প্রারব্ধাদি কর্ম্ম বর্ত্তমান আছে। সেই প্রারব্ধানুসারে জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ ঘটিয়া থাকে। সেই দেহ সহযোগে জীব আপন বাসনা চরিতার্থ করিতে অন্ন, প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানময় কোষ চতুষ্টয়ে

আবদ্ধ আছেন। জাগ্রদাদি অবস্থায় ঐ তত্ত্বসমূহ সত্য বলিয়া ভ্রান্তি বশে ভোগ করিতেছেন। যে প্রারব্ধ পাইলাম তাহা দুঃখের; যে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব ভোগ্য বস্তু পাইলাম, তাহা অসৎ ও দুঃখমূলক; যে অন্নপ্রাণাদি কোষ পাইলাম তাহাও ক্ষয় ও বর্দ্ধনে সতত পরিণত অতএব দুঃখের; যে জাগ্রদাদি অবস্থা পাইলাম, তাহার সদা পরিবর্ত্তন, অতএব দুঃখের; ইহ জন্মের সকল বস্তুই হইল দুঃখের; আনন্দের কিছুই পাইলাম না। অতএব পদার্থ প্রপঞ্চে আনন্দ নাই, এবং কর্ম্ম প্রপঞ্চে আনন্দ নাই, ইহাই স্থির হইল। কারণ যদি তাহাতে আনন্দ থাকিত, আমরা আনন্দ ভোগ করিতে পাইতাম। এই ভোগতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া সকল ভোগফল যখন দুঃখের বলিয়া স্থির হইল; তখন আনন্দের সত্বা ভোগে নাই মোক্ষে বর্ত্তমান আছে; এই বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব ভোগতত্ত্ব বিশেষ বোধ হইলে বৈরাগ্য স্বভাবতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জন্য উপাসনা তত্ত্বের মধ্যে; ভোগতত্ত্ব বিশেষ বোধ করা প্রয়োজন হইতেছে। ভোগ শব্দটি কি এবং জীবাত্মার পক্ষে ভোগটি কেমন করিয়া ঘটে তাহাই এই প্রস্তাবে দেখান হইল, ভোগের বিচিত্রতা পরে পরে বলা হইবে।

অথ অবস্থাভোগতত্ত্ব।

আমরা জীবিতকাল পর্য্যন্ত সংসার ভোগ করিতে আসিয়া যে সময়ে যেটি ভোগ করিয়া থাকি; সেই প্রতি সময়টিকে আমাদের এক একটি ভোগাবস্থা কহে। এই অবস্থাভোগ দুই উপায়ে সংসাধিত হয়। একটি বাহ্য দেহের পরিবর্ত্তনে ঘটিয়া থাকে, আর একটি অন্তর্দে-

হের পরিবর্ত্তনে ঘটিয়া থাকে। শিশু, পোগণ্ড, কিশোর, যৌবন প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য, মুমূর্ষু প্রভৃতি সাতটি অবস্থা বাহ্যদেহের পরিবর্ত্তনে ঘটিয়া থাকে। জাগরণ, স্বপ্ন, নিদ্রা ও তুরীয় এই চারিটি অবস্থা অন্তর্দ্দেহ অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহের পরিবর্ত্তনে ঘটিয়া থাকে। আমরা যে ভোগের জন্য এত উন্মত্ত থাকি, তাহা অবস্থা বিশেষে পূর্ব্বোক্ত একাদশ উপায়ে সংসাধিত হয়। আমরা যে ভোগে উন্মত্ত হইয়া আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান হারাইয়া থাকি; তাহা কিরূপ অকিঞ্চিৎকর, ইহা বুঝাইবার জন্যই এই একাদশ অবস্থাতত্ত্ব উপাসকের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

যে অবস্থায় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের শক্তিলাভ সম্পূর্ণরূপে হয় না, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের বিশেষ বিকাশ ঘটে না, সেই অবস্থাকে শিশুভাব কহে। এ অবস্থায় জ্ঞানবুদ্ধিস্মৃতি হীন, কর্ম্মেন্দ্রিয় অক্ষম হইয়া থাকে। জন্মাবধি পঞ্চবৎসর পর্য্যন্ত শিশু কাল বলিয়া শাস্ত্রকর্ত্তারা স্থির করিয়াছেন। পঞ্চম হইতে অষ্টম, কাহারো মতে দশম বর্ষ পর্য্যন্ত পোগণ্ড কাল হইতেছে। এই অবস্থায় কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বিজ্ঞান প্রভৃতি কোষের ক্রমবিকাশ আরম্ভ হয়। অন্নময় কোষটি সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। নবম হইতে বা দশম হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত কিশোর কাল। এই অবস্থায় আনন্দময় কোষের বিকাশ আরম্ভ হয়। জ্ঞান, কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি, নব বৃক্ষের শাখা পল্লবের ন্যায় বিকসিত হইয়া বিষয় ভোগের জন্য চেষ্টা প্রকাশ করিয়া থাকে। মন, বিজ্ঞান, অন্ন, প্রাণ এই চতুর্ব্বিধ কোষই পূর্ণ বিকাশ পায়। ষোড়শ হইতে চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত যৌবন। এ অবস্থায় সমস্ত কোষপঞ্চক এবং জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির পূর্ণ বিকাশ ঘটে অথচ সকল অবস্থা গুলিই আপনাপন স্বভাব চরিতার্থ করিতে ভোগের জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকে। চতুর্ব্বিংশতি হইতে অশীতি পর্য্যন্ত প্রৌঢ় কাল। এই অবস্থায় জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি ক্রমে শক্তিহীন হইয়া আসে; এবং কোষগুলি ক্রমে বিষয়ভোগে মুগ্ধ হইয়া, জড়ভাবে পরিণত হইয়া থাকে। অশীতি হইতে শতাধিক সমস্তই মুমূর্ষু কাল। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও কোষ

সকলেই দেহ ধারণে অক্ষম হয়। বুদ্ধিস্মৃতি ক্ষীণ ও লুপ্ত হইতে থাকে। এই যে সাতটি সময় পরিবর্ত্তন দেখান হইল, ইহাতে বাহ্য দেহের অনস্তিত্ব প্রতীতি হইলে ভোগে অনাশক্তি উপস্থিত হইয়া থাকে।

আমাদের সম্পূর্ণ ভোগ কাল অতি সামান্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কেবল মাত্র ভোগের জন্যই দেহ লাভ হইয়াছে। সেই ভোগের পূর্ণতা অতি অল্প সময়ই হয়। শিশুকালে বুদ্ধি স্মৃতি এবং শক্তি-বিহনে সম্পূর্ণ ভোগ ঘটিল না; পোগণ্ডাবস্থায় ঘটিল না, কিশোরে ঘটিল না। প্রৌঢ়ে ভোগশক্তির ক্ষয় আরম্ভ হইল, চক্ষু প্রভৃতি দৃষ্টিশক্তি হারাইতে থাকিল। মুমূর্ষু অবস্থায় একেবারেই ভোগাক্ষম হইলাম। অতএব এই দুর্ল্লভ দেহ পাইয়া ভোগের স্বাধীনতা কোথায় পাইলাম? পশু, পক্ষী, কীট, সরীসৃপাদির মধ্যে বহু শ্রেণীকে অনেক ভোগ চরিতার্থ করিতে দেখা যায়। পক্ষী, সরীসৃপ, কীট প্রভৃতি জাতীয় শিশুসমূহ ডিম্বচ্যুত হইয়াই নিজে আহার বিহারাদি করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু মানবের গর্ব্ব কোথায়? মানব যৌবনের অতি অল্প কালই ভোগে সক্ষম হয়। সেই যৌবন কালও ব্যাধি ও আলস্যাদিতে বহু সময়ে নষ্ট হইয়া থাকে। ভোগের কাল নির্দ্দেশ করিতে গিয়া পণ্ডিতগণে কহিয়াছেন। শতবর্ষ পরমায়ু মানবে লাভ করিলে, অর্দ্ধেক নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। কাহারো মতে দশভাগ নিদ্রায় ক্ষয় হয়; কারণ শিশুকাল ও মুমূর্ষুকাল প্রায়ই জীবে নিদ্রিত থাকে। যাহা হউক অর্দ্ধেকও যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ৫০ বৎসর নিদ্রায় ক্ষয় হইল। শত বৎসরের হিসাবে কিশোর কাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অবিকাশে ১৬ বৎসর ক্ষয় হইলে; ৫০ বৎসরে তাহার অর্দ্ধেকে ৮ বৎসর হইল, চত্বারিংশতি হইতে শত হইল, ৬০ বৎসর। প্রৌঢ়, বৃদ্ধ ও মুমূর্ষুতে ক্ষয় হইল। উহার অর্দ্ধেক ৩০ বৎসর ক্ষয়। প্রৌঢ়াদির ত্রিশ বৎসর এবং আশৈশব কিশোরাবধির জাগৃত ৮ বৎসরে হইল ৩৮ বৎসর। শত বৎসরের নিদ্রাত্যাগে যে ৫০ বৎসর ছিল, তাহা হইতে ৩৮ বৎসর বাদ দিলে ১২ বৎসর মাত্র যৌবন

কাল জাগরণে ভোগ হইয়া থাকে। ঐ ১২ বৎসর জাগরণের মধ্যে ব্যাধি, শোক, তাপ, দুঃখ এবং আলস্যাদি আছে। অতএব প্রকৃত ভোগাবস্থা আমাদের দেহ ধারণে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বাহ্য দেহের পরিবর্ত্তনাবস্থা দেখান হইল। এক্ষণে অন্তর্দ্দেহের ভোগাবস্থা বিচার দ্বারা ভোগের প্রধান শক্তিগুলির পরিচয় গ্রহণ করিলে, ভোগে অধিক অনাস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে, অর্থাৎ মোহ হইবে না। জাগরণ, স্বপ্ন, ও নিদ্রা এবং তুরীয় এই চারিটিই অন্তর্দ্দেহের পরিবর্ত্তনাত্মক অবস্থা হইতেছে।

যে অবস্থায় কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি বাহ্য বিষয় ভোগের জন্য ব্যস্ত থাকে, সেই অবস্থাকে জাগরণাবস্থা কহে। চক্ষু বাহ্যরূপ দেখিতে, কর্ণ বাহ্য শব্দ শুনিতে, হস্তাদি গ্রহণে, পদাদি গমনে নিরত থাকে। মন বাহ্য বিষয় অনুভব করিতে, বুদ্ধি প্রভৃতি সকলেই বিষয়ভোগ ও অনুভবে ব্যাকুল থাকে। সেই কালে জীবাত্মা আপনাকে সতত ভোগী বলিয়া বিবেচনা করে। এই যে জাগরণাবস্থা; এই অবস্থাতেই জীবের সমস্ত ভ্রান্তি সংঘটন হইয়া উঠে। যদি কাহারো এরূপ সন্দেহ হয় যে:—ইন্দ্রিয়াদি সংযোগে বিষয় ভোগ করিতে করিতে জীবাত্মার যখন বিষয়ে আসক্তি উপস্থিত হইতেছে, তখন তিনি ভোগী নহেন, এ কথা কেমন করিয়া বুঝিতে পারি? এই ভোগাভোগাবস্থা বুঝাইবার জন্য তত্ত্বজ্ঞেরা এই জাগরণাদি অবস্থার বিচার করিয়াছেন। একস্থানে বহু হত্যাদি কার্য্য হইতেছে, তাহার মধ্যে কোন সাধুলোক গমন করিলে, হতব্যক্তির বা পশুর ক্লেশ নিজে অনুভব করিয়া থাকেন, অর্থাৎ চীৎকারে ও যন্ত্রণা দর্শনে সাধুর হৃদয়ও হতপদার্থের ন্যায় কষ্ট অনুভব করিতে থাকে। এই যন্ত্রণাবোধ কেন হয়? কষ্ট পাইতেছে আর এক জন, সাধুর এরূপ ঘটনা কেন হয়? এ বিষয় মীমাংসায় বেশ বুঝা যায় যে, যতক্ষণ মনাদি সূক্ষ্ম শরীরের শক্তিগুলি বাহ্য বিষয় ভোগে নিরত থাকে, সেই সময়ে জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়গৃহীত বাহ্য বিষয়ে যে রস অর্থাৎ ভীষণ, মনোহরাদি, বীর, করুণাদি যে ভাব থাকিবে

মনাদি সেই রস বা ভাব অনুভব করে মাত্র। মনাদির সংযোগ যতক্ষণ, ততক্ষণই সেই বিষয়ের অনুভব আত্মা করিয়া থাকেন।

এই জাগরণ অবস্থাটি আত্মাকে ভোগভ্রান্তিতে সতত বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। মাল্য, চন্দন, বসন, ভুষণ, গৃহ, বিত্ত, পরিবার শোক, দুঃখ, জরা, তাপ প্রভৃতি এবং সুখ ও আনন্দ এ সমস্তই জাগৃত অবস্থার জন্য ভোগ হইয়া থাকে। এই ভোগ বিষয়ে একান্ত আসক্তি উপস্থিত হওয়াতেই জীবের সংসার বন্ধন ঘটে। ভোগটিকে অনিত্য ও অতি সামান্য বুঝিতে পারিলে একমাত্র আত্মাকে সত্য বুঝিতে পারিলেই অজ্ঞান দূর হইয়া যায়।

এই জাগরণাবস্থায় ভোগ করিতে করিতে মন ক্রমে ভোগ সংস্কারীভূত হইয়া থাকে। এই সংস্কার জন্মজন্মান্তর হইতে ইহজন্ম পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া আছে। ভোগ বিষয়কে নিত্য বোধ করিতে করিতে, জাগ্রত অবস্থাকে প্রধান স্বীকার করিয়া বুদ্ধির এরূপ ভ্রম নিশ্চয় হয় যে, মৃত্যুকে ভয় থাকে না। সংসার অতি তুচ্ছ ও নশ্বর হইলেও তাহাকে প্রকৃত সত্য বলিয়া স্থির করে। এইরূপে জাগ্রত কালীন্ ভোগের যে ভ্রান্তি সংস্কার হয় স্বপ্নাবস্থায় তাহার প্রমাণ হইয়া থাকে। জাগরণের পরক্ষণ এবং নিদ্রার পূর্ব্বক্ষণ যে অবস্থায় বাহ্যচৈতন্য হ্রাস হয় তাহাকে স্বপ্নাবস্থা কহে। এই অবস্থায় কেবল বুদ্ধি সচেতন থাকে। আর আর জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি সকলেই মনের সহিত অচেতন হইয়া যায়। পূর্ব্ব তত্ত্ব বিচারে দেখান হইয়াছে যে, বুদ্ধিই বিজ্ঞানময় কোষরূপে আত্মার ভোগায়তন গঠন করিয়া থাকে। ভোগ করিতে করিতে বুদ্ধির যে সংস্কার লাভ হয়, এই স্বপ্নাবস্থায়, তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ মনাদি, অহংকার ও চিত্তাদি জাগরণাবস্থায় বহু বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে বলিয়া সে অবস্থায় বুদ্ধির কার্য্য মিশ্রিত থাকে। এই স্বপ্নাবস্থায় একা বুদ্ধি স্বাধীন ভাবে জাগৃত আছে, এ সময়ে বুদ্ধির কার্য্য দেখিলেই বুদ্ধিকে জানা যাইবে। এই অবস্থায় আমরা ইন্দ্রিয়শূন্য হইলেও স্বপ্নে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য অনুভব করি।

মহারণ্যে কথন হয়তো ব্যাঘ্রের মুখে, কথন মহাপর্ব্বতোপরে সর্পবিবরে, কথন হয়তো মহাসাগরে উর্ম্মিমালায় পতিত হইয়া ভীষণ ভীত হই। কথন হয়তো কাহাকে অসি হস্তে ছেদনকারী ভাবিয়া কাতর হইয়া থাকি। কথন রাজা, কথন দরিদ্র ইত্যাদি যে স্বপ্নে প্রতিভাত হয়, এ সমস্তই ভ্রান্তি কল্পনা হইতেছে, বরং জাগরণে ভোগের অস্তিত্ব ছিল। স্বপ্নে বুদ্ধির ভ্রান্তি সংস্কারে সকলই মিথ্যা ভোগ হইয়া থাকে, অতএব ভোগ করিতে করিতে জাগরণ ও স্বপ্ন এতদুভয়কালে যাহা কিছু ভোগ হয় তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল।

অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন, জাগরণের ভোগানুভূতি কেমন করিয়া মিথ্যা স্বীকার করা যায়? ইহার উত্তর এই যথাঃ—জাগরণেও অনুভূতি হয়, স্বপ্নেও অনুভূতি হয়। জাগরণে ইন্দ্রিয়াদি সহযোগে অনুভূত বিষয়ে যেরূপ ভাব বিকাশ হয়, স্বপ্নেও তাহাই হয়। জাগরণে ভয় দর্শনে ভীত, কাম্য দর্শনে কামী ইত্যাদি ঘটনা হয়। স্বপ্নে ঠিক তাহাই ঘটিয়া থাকে। অতএব স্বপ্নের অনুভূতিকে যখন আমরা মিথ্যা বলিয়া থাকি, তখন জাগরণের অনুভূতিকে সত্য কেন বলিব? অনুভূতি নামে যে ক্রিয়া তাহা কখন মিথ্যা বা সত্য উভয় হইতে পারে না। মিথ্যা বা সত্য বস্তুজাত অনুভূতি মাত্রেই মনাদি তাহাতে উন্মত্ত বা দুঃখিত হয়। যে সংস্কারের ফল হইল মিথ্যা, তাহার কারণ কখনই সত্য হইতে পারে না। অর্থাৎ জাগরণে ভোগ করিয়া স্বপ্নে যখন বুদ্ধির ভ্রান্তি সংস্কার হইল, তখন জাগরণের ভোগ্য প্রপঞ্চ সমস্তই ভ্রান্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

অনেকে বলিতে পারেন জাগরণে প্রকৃত শিরশ্ছেদনাদিতে যে ক্লেশানুভূতি হয়, তাহাকে মিথ্যা কেমন করিয়া বলা যায়;—তদুত্তর এই যথাঃ—যখন আমরা নিদ্রিত বা স্বপ্ন অবস্থায় থাকি, সে অবস্থায় কেহ প্রকৃত দেহচ্ছেদন করিলে আমরা পূর্ব্বাপর যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারি না। কেন অনুভব হয় না? সে সময়ে আমাদের বুদ্ধির সহিত জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ের অচেতনাবস্থা ঘটে; এই জন্য নিদ্রায় মহাকষ্টের

অনুভব হয় না। এই প্রমাণে দেখান হইল যে—যত কিছু প্রকৃত বা অপ্রাকৃত ঘটনা সমস্তই বুদ্ধি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া থাকে। বুদ্ধি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া যে অবস্থাগুলি সুখ বা দুঃখের অনুভব করায়, তাহাদের কখনই সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ সেই ভোগ্য-বস্তুগুলি ভোগীর অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ শিশুর কাছে যে ভোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যুবকের কাছে তাহা অসত্য স্থির হয়, রোগী যাহা ভাল বাসে, সুস্থ ব্যক্তি তাহা ভাল বাসে না। অতএব অবস্থাভেদে যাহাদের ভোগ বৈচিত্র ঘটে, তাহারা পার্থিব বস্তু হইলেও সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ সত্য বলিতে তাহাই বুঝিতে হইবে, যাহা জাগরণ, স্বপ্ন ও নিদ্রা তিন অবস্থায় সমান ভাব প্রতীতি হইবে। যাহা রোগী, দুঃখী ও সুস্থ সকলের কাছে সমান ভাবে আদৃত হইবে। যাহা শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সকলের কাছেই সমান ভাবে গৃহীত হইবে। এমন সত্য ভোগের মধ্যে কিছুই নাই। একমাত্র আত্মা ভিন্ন এ জগতে সর্ব্বাদৃত বস্তু আর নাই। আত্মাকে ত্যাগ করিতে শিশু, বৃদ্ধ, পশুপক্ষী কেহ চাহে না। রোগী, সুস্থ সকলেই আত্মার পরিচর্য্যা করে। এই নিয়মে শাস্ত্রকর্ত্তাগণ বলেন, যে বস্তু ব্যবহারে যে সংস্কার লাভ হয়, তাহাই তাহার গুণ হইতেছে। জন্মজন্মান্তর হইতে জাগরণ ভোগ করিয়া স্বপ্নে যখন ভ্রান্তিই লাভ হইল, তখন সকল ভোগ্য অবস্থা হইতে জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। যাহা হইতে জ্ঞান লাভ না হয় তাহা সত্য নহে।

যদি কেহ বলেন যে জাগরণ অবস্থাটিই সত্য। আর নিদ্রা ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থাই মিথ্যা, এই জন্য মিথ্যা কল্পনা হয়। এই তর্ক খণ্ডনের জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন। জাগরণ, স্বপ্ন ও নিদ্রা এই তিনটি অবস্থার মধ্যে দুইটি অবস্থা যাহাকে অস্বীকার করে, তাহা কখন সত্য হইতে পারে না। নিদ্রা ও স্বপ্নে জাগরণের কোন অবস্থা স্বীকার করে না। নিদ্রা ও জাগরণ স্বপ্নের সত্তা স্বীকার করে না। আবার জাগরণ ও স্বপ্ন নিদ্রার অবস্থা স্বীকার করে না। এই ন্যায় প্রমাণে

আমাদের তিনটি অবস্থাই অস্বীকার হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াদির সক্রিয় ও অক্রিয়াবস্থা ভেদে এই তিনটি ভাব আমরা লাভ করি মাত্র। যাহা জন্মের পূর্ব্বে অদৃশ্য ছিল, যাহা জাগরণে অদৃশ্য, যাহা স্বপ্নে অদৃশ্য, যাহা নিদ্রায় অদৃশ্য, মৃত্যুর পরেও যাহা অদৃশ্য, সকল অবস্থায় অদৃশ্য থাকিয়াও সকল অবস্থার প্রকাশক বলিয়া যাহা সকল ভাবের অতীত হইয়া বর্ত্তমান আছে, সেই চতুর্থ অবস্থাকেই শাস্ত্র তুরীয় কহেন। এই তুরীয় ভাবে কেবল আত্মার বর্ত্তমানতা মাত্র উপলব্ধি হইয়া থাকে। মৃত শরীরের কখন জাগরণাদি অবস্থা ভোগ হয় না। জাগরণাবস্থাতেও যে আত্মা চেতয়িতা, স্বপ্নেও যিনি চেতয়িতা, নিদ্রাতেও যিনি চেতয়িতা, অথচ সকল অবস্থাতেই যিনি অদৃশ্য আছেন, সেই আত্মাই নিত্য তুরীয়াবস্থার বস্তু হইতেছেন। এই অবস্থায় ভ্রান্তি ঘটে না। জাগরণে বস্তু ভোগ করিয়া ভ্রান্তি ঘটিল, স্বপ্নেও তাহাই ঘটিল, নিদ্রায় ঘোর অজ্ঞান বাড়াইয়া দিল। এইরূপ আমরা জন্মজন্মান্তর হইতে জাগরণাদি অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত শিশুত্বাদি ভাবে বিষয় ভোগ করিয়া ভ্রান্ত ও অজ্ঞানী হইয়া অসৎবস্তুতে প্রতীতি স্থাপন করিয়াছি। সৎবস্তু যাহা নিত্য ও আত্মা, তাহা অনুভব করিতে চেষ্টা করি নাই। ইহা যখন প্রমাণ হইল যে, এক আত্মা ব্যতীত সকল বস্তু অসৎ, সকল অবস্থা অসৎ, তখন আমরা সত্য বস্তু নির্দ্ধারণ না করিয়া অসত্যের দিকে ধাবিত হই কেন? এই সত্য বস্তু নির্দ্ধারণ জন্যই মানব জন্ম। মানবে যে উপায়ে সত্য বস্তু বুঝিতে এবং তাহাতে তন্ময় হইতে পারে, তাহা শিক্ষা দিবার জন্যই উপাসনাতত্ত্বের প্রযোজন সত্যাদি যুগ হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেনঃ—

"অস্তি কশ্চিৎ স্বয়ং নিত্যমহংপ্রত্যয় সংবশং।
অবস্থাত্রয়সাক্ষী সৎ পঞ্চকোষ বিলক্ষণঃ॥
যঃ পশ্যন্তি স্বয়ং সর্ব্বং যং ন পশ্যতি কশ্চনঃ।
যশ্চেতয়তি বুদ্ধ্যাদীন্ তদয়ং চেতয়ত্যয়ং॥
প্রকৃতি বিকৃতি ভিন্নঃ শুদ্ধবোধ স্বভাবঃ

সদসদিদমশেষং ভাবয়ন্নির্ব্বিশেষং।
বিলসতি পরমাত্মা জাগ্রদাদিষবস্থা।
সোঽহমিতি সাক্ষাৎ সাক্ষীরূপেন বুদ্ধেঃ॥"

অস্যার্থঃ—অহং অর্থাৎ আমি আত্মা এইরূপ প্রত্যয় জীবের উপস্থিত করিতে আত্মাকে এই ভাবে বুঝিতে হইবে, যথা—তিনি জাগ্রদাদি তিন অবস্থার সাক্ষী আছেন। পঞ্চকোষের অন্তরে চেতয়িতা হইয়া বর্ত্তমান আছেন। যিনি সকল অবস্থা, কোষ প্রভৃতি চেতনা করেন, তাঁহাকে ঐ সকল অবস্থা চৈতন্য প্রদানে সক্ষম নহে। যিনি বুদ্ধিকে চেতনা দিয়া থাকেন, এবং যাঁহার স্পর্শে বুদ্ধি অচেতন ভূতাদিকে চেতন করাইয়া থাকে। যিনি প্রকৃতি বিকৃতি হইতে অতীত, নিত্য শুদ্ধ স্বভাব ধারণ করেন, যাঁহার সত্বায় জগতের সৎ ও অসৎ বস্তু-বিবেক হইয়া থাকে, যিনি জাগ্রদাদি সকল অবস্থাতে পরমাত্মা-রূপে বুদ্ধির সাক্ষী হইয়া বর্ত্তমান আছেন, আমি সেই আত্মা; (এই-রূপ চিন্তায় অজ্ঞান ক্ষয় হইয়া জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে।)

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের এবং অন্যান্য সকল জ্ঞানশাস্ত্রের প্রমাণ এইরূপ হইতেছে; এই অবস্থাদি তত্ত্বানুভবে সমস্ত জাগতিক বস্তুতে মোহ ক্ষয় হইয়া এক আত্মাতে জ্ঞান দৃঢ় হইয়া থাকে। এই ভাব্য চিন্তাতে এবং অনুষ্ঠানে লাভ হইয়া থাকে। অতএব উপাসনা বলে পূর্ণবিজ্ঞান-ভাবময় হইয়া জীবে সকল কষ্ট ও অজ্ঞান হইতে উদ্ধার হইয়া থাকে।

অথ প্রকৃতিজাতগুণতত্ত্ব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যেঃ—প্রধান, মহান্, অহং এবং পঞ্চভূত এই আট অবস্থা মিলিত হইয়া বিশ্বপ্রকৃতির ঘটনা হইয়াছে। এই প্রকৃতি জীবাবস্থায় পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি ও অহংকার নামে পরিণত হইয়াছে। এই সকল প্রকৃতির পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। অগ্রে আরো বলা হইয়াছে যেঃ—প্রকৃষ্ট ভাবে জীবকে সুখের উপাদান ও দুঃখের ভ্রান্তি প্রদান করেন বলিয়া এই শক্তির নাম প্রকৃতি হইয়াছে। এই বিশ্ব চরাচর সকলেই এই প্রকৃতির অধীন। জীবাত্মা একান্ত অধীন। পরমাত্মা স্বাধীন অথচ এক ভাবে অবস্থিত আছেন। উভয়ে পুরুষ ও শক্তিরূপে এই সংসারের সৃষ্টি, সংহার ও পালনাদি করিতেছেন। এক কথায় বলিতে গেলে প্রকৃতি ভিন্ন সংসারে আর কিছুই নাই। জীব প্রকৃতিতে গঠিত হয়,প্রকৃতিকেই জীব ভোগ করিয়া থাকে। অদ্য আমাদের জীবভাবেরই আলোচনা হইতেছে। অতএব জীবের সহিত প্রকৃতির যে সম্বন্ধ তাহাই এই স্থলে আলোচনা হইতেছে। এই প্রকৃতি জীব সংসারের যখন ভোগ্যা হয়েন, তখন ইহার তিনটি অবস্থা বিচারে নির্ণীত হয়। একটির অবলম্বনে জীব একেবারে অজ্ঞান ভাবে পূর্ণ থাকে। দ্বিতীয়টির অবলম্বনে জীব কষ্টে ব্যস্ত হয়। তৃতীয়টির অবলম্বনে জীব কিছু কিছু শান্তি লাভ করিয়া থাকে। এই তিন অবস্থা যাহা জীবের ভোগ হয় তাহাকে প্রকৃতির গুণ কহে। জন্ম মাত্রেই জীবকে এই তিনভাব ভোগ করিতে হয়ই হয়। তমোগুণ অধিকাংশেই ভোগ হয়। রজো গুণ তাহাপেক্ষা অল্প ভোগ হয়। সত্বগুণ অতি সামান্য কেবল মনুষ্য জন্মে ভোগ হইয়া থাকে। কিন্তু এই গুণ ভোগ হইবার জন্যই মানব জন্ম গ্রহণ হইয়াছে। এই কথা বুঝাইতে শ্রীগীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেনঃ—

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতেহ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্ব প্রকৃতিজৈগুর্ণৈঃ॥"

অন্বার্থঃ—হে অর্জ্জুন! এই সংসারে জীবজন্ম গ্রহণ করিবা মাত্র, কেহই এক নিমেষের জন্য কর্ম্মশূন্য হইয়া জীবিত থাকিতে পারে না। সেই কর্ম্ম প্রকৃতিজ গুণের সাহায্যে সকল প্রাণীকে বশীভূত করিয়া কার্য্যে আবদ্ধ করিয়া থাকে।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

অন্বার্থঃ—হে অর্জ্জুন! সকলে প্রকৃতিজাত গুণবশে ইহ সংসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সেই প্রকৃতি অনুসারে প্রবৃত্তি বশেই অহংকারী অর্থাৎ অভিমানী হইয়া জীবে আমি কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে।

গীতা বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত এই হইল যেঃ—প্রকৃতিজাত সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাহায্যে পূর্ব্বসংস্কার চিত্তে যাহার যেরূপ থাকে, সেইরূপ স্বভাব বিকাশ হইয়া থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মে যদি পুণভাব থাকে, প্রকৃতির সত্বগুণ তাহাতে অধিক ভাবে ক্রিয়মাণ হইবে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মে যদি মিশ্রিত পাপপুণ্য থাকে, ইহদেহে প্রকৃতির রজোগুণ সংযুক্ত স্বভাব প্রকাশ হইবে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মে যদি পরিপূর্ণ পাপ বা দুঃখ থাকে, ইহ জন্মে প্রকৃতির তমোগুণের সহিত তাহার স্বভাবের স্ফূর্ত্তি ঘটিবে। তম্ ধাতু হইতে তমোশব্দের বুৎপত্তি। তম্ ধাতুর অর্থ আবরণ করা। যেপ্রকৃতিস্বভাব একান্ত জ্ঞান চেষ্টার আবরণকারী তাহাকে তমোগুণ কহে। এই অবস্থায় মানবে অজ্ঞান, আলস্য, জড়তা, নিদ্রা, প্রমাদ, মূঢ়ত্ব প্রভৃতি দোষে চিত্তকে অভিভূত করিয়া থাকে। জ্ঞানের কোন কার্য্যই হয় না, সতত জড় ও নিদ্রালুভাবে পরিণত থাকে। এ বিষয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন ;—

"অজ্ঞানমালস্য জড়ত্ব নিদ্রা প্রমাদ মূঢ়ত্বমুখাস্তমোগুণাঃ।
এতৈঃ প্রযুক্তো নহি বেত্তি কিঞ্চিৎ নিদ্রালুবৎ স্তম্ভবদেব তিষ্ঠতি"

অস্যার্থঃ—অজ্ঞান, আলস্য, নিদ্রা, প্রমাদ, মূঢ়তা যে সকল দোষে জীবে জড়ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাই তমোপ্রকৃতির গুণ হইতেছে। জীব ইহাতে অভিভূত হইলে একেবারে জ্ঞান হারাইয়া নিদ্রালু বা স্তম্ভবৎ হইয়া থাকে।

এই প্রমাণে বলা হইল যেঃ—তমোগুণের কার্য্য হইতেছে সচেতন জ্ঞানময় অবস্থাকে ক্রমে অচেতন বা জড়ত্বে পরিণত করা। বিশ্বপক্ষে এই তমোগুণ চৈতন্যাবস্থাকে ক্রমে স্থূলভূতে ও স্থূলদেহে পরিণত করিয়া থাকে। আমরা যখন জন্মমাত্রেই ভূতের ও স্থূলদেহের অধীন, তখন জন্মমাত্রেই তমোগুণের অধীন হইয়া আছি। তমোগুণের অধীন বলিয়া আমরা সকলেই অগ্রে অজ্ঞান হইয়া থাকি। আমরা এই দেহে পঞ্চভূতীয়া প্রকৃতি লাভ করিয়া তমোগুণজাত কার্য্যই অধিক পরিমাণে ভোগ করিয়া থাকি। পঞ্চভূতভোগ হইতে আমরা যে যে স্বভাব লাভ করি তদ্বিষয়ে ব্রহ্মজ্ঞান তন্ত্র বলিতেছেনঃ—

"অস্থিমাংসনখাশ্চৈব নাড়ীত্বক্ চেতি পঞ্চঃ।
পৃথ্বীপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাবিতং॥
মলং মূত্রং তথা শুক্রং শ্লেষ্মা শোনিতমেবচ।
তোয় পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাবিতং॥
হাসোনিদ্রা ক্ষুধাশ্চৈব ভ্রান্তিরালস্যমেবচ।
তেজঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাবিতং॥
ধাবণং চালনং ক্ষেপং সঙ্কোচপ্রসবস্তথা।
বায়ু পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাবিতং॥
কামক্রোধস্তথালোভভয়মোহশ্চ পঞ্চমঃ।
নভঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাবিতং॥"

অস্যার্থঃ- অস্থি, মাংস, নখ, নাড়ী, ত্বক্, ব্রহ্মজ্ঞানযোগে এই পাঁচটিকে পৃথ্বীগুণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। মল, মূত্র, শুক্র, শ্লেষ্মা ও শোণিত, ব্রহ্মজ্ঞানযোগে এই পাঁচটিকে তোয়ের গুণ বলিয়া

স্বীকার করা হইয়াছে। হাস্য, নিদ্রা, ক্ষুধা, ভ্রান্তি ও আলস্য, ব্রহ্মজ্ঞান যোগে এই পাঁচটিকে তেজের গুণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। ধারণ, চালন, ক্ষেপন, সঙ্কোচন ও প্রসরণ, ব্রহ্মজ্ঞানযোগে এই পাঁচটিকে বায়ুর গুণ বলিয়া স্থির হইয়াছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ও অহংকারকে ব্রহ্মজ্ঞানযোগে আকাশের গুণ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

এই সকল প্রমাণে স্থির হইল যে আমরা ভৌতিক দেহ সংযোগে প্রকৃতির তমোগুণ কেমন করিয়া ভোগ করিয়া থাকি। এই সকল ভোগে যত আমরা উন্মত্ত হইব ততই আমাদের জড়তা অধিক আসিবে। আমরা ক্রমে জ্ঞানশূন্য পশুবৃক্ষাদির ন্যায় স্থূলাবস্থা প্রাপ্ত হইব। এক্ষণে রজোগুণের পরিচয় লওয়া হউক। যেমন তমোগুণ একেবারে জ্ঞানকে আবরণ করে; রজোগুণ সেইরূপ জ্ঞানকে বিষয়াসক্তিতে উন্মত্ত করিয়া থাকে। রন্জ ধাতু হইতে রজোশব্দের ব্যুৎপত্তি। ঐ ধাতুর অর্থ অনুরক্ত করা; অর্থাৎ জীবের পূর্ব্ব কর্ম্ম যেরূপ ছিল, সেইরূপ স্বভাব ইহদেহে প্রকাশ করিয়া; সেই সেই স্বভাব বা প্রকৃতিতে জ্ঞান, মন ও বুদ্ধিকে যে শক্তি অনুরক্ত করে তাহাকে রজোগুণ কহে। তমোগুণবলে জীবের বিজ্ঞানময় কোষ জড়তা লাভ করে মাত্র, কিন্তু রজোগুণ দ্বারা সংসারে আসক্ত হইয়া ক্রমে জ্ঞান হারাইয়া থাকে। শ্রীগীতায় অর্জ্জুনকে ভগবান বলিতেছেনঃ—

"রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্ভবং।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয়! কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনং॥

অস্যার্থঃ—হে কৌন্তেয়! রজোগুণকেই সংসারে অনুরাগ জন্মাইবার কারণ বলিয়া জানিবে। যাহা পাই নাই এমন ভোগের তৃষ্ণা, প্রাপ্তভোগে একান্ত অনুরক্তি জনিত সঙ্গ প্রভৃতি হইতেই এই রজোগুণের প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহার ক্ষমতাতেই দেহী জীব কর্ম্ম সঙ্গে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই গুণের পরিচয় দিতেছেনঃ—

"কামক্রোধোলোভদম্ভাদ্যসূয়াহঙ্কারের্ষ্যামৎসরাদ্যাস্ত ঘোরাঃ।
ধর্ম্মা এতে রাজসাপুং প্রবৃত্তি র্যস্মাদেষা তদ্রজো বন্ধ হেতুঃ॥

অস্যার্থঃ—এই যে কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, অসূয়া, অহঙ্কার, ঈর্ষা, মৎসর প্রভৃতি ঘোরা প্রবৃত্তিগুলি এক রজোগুণের ধর্ম্ম অর্থাৎ স্বভাব হইতেছে। জীবে এই সকল প্রবৃত্তিপূর্ণ হইলে সংসারে আশক্ত হয়; এই জন্য সাধুগণে রজোগুণকেই বন্ধনেব হেতু বলিয়া থাকেন।

এই উভয় প্রমাণ দ্বারা বুঝান এই হইল যে, রজোগুণ দ্বারা জীবের বিজ্ঞানময় কোষ ও চিত্তাদি একেবারে আসক্ত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে তমোগুণ ব্যাখ্যাকালে কামাদিকে আকাশের গুণ বলা হইয়াছে। এক্ষণে রজোগুণের ধর্ম্ম বলা হইতেছে ইহাতে অনেকের সন্দেহ হইতে পারে। যেমন পুষ্পের সৌরভ তৈলের সঙ্গে মিসিলে আমাদের সদা ব্যবহারোপযোগী হয়; সেইরূপ তমোগুণজাত আকাশতত্ত্ব হইতে কামাদির জন্ম মাত্র; এই রজোগুণস্পর্শে উহাদের ক্রিয়া এই জীব সংসারে প্রকাশ হয় বলিয়া, রজোগুণের ধর্ম্ম কহে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি বিনা রজোগুণাবলম্বন সংসারে প্রকাশ হইতে পারে না, এবং ঐ গুলি ব্যতীত রজোগুণেরও আসক্তি বা বন্ধনজনিত ক্রিয়াও সংসারে প্রকাশ হয় না। এইজন্য ইহারা পরস্পরে পরস্পরের প্রকাশক ও ধর্ম্ম হইতেছে। পূর্ব্বকর্ম্মস্বভাব ইহ সংসারে প্রকাশ হইবার জন্য জীব শিশুকাল হইতে যত ইন্দ্রিয়াদিকে শক্তিমান্ বোধ করে, ততই তাহাদের ভোগস্পৃহা বৃদ্ধি পায়। এই ভোগস্পৃহা বর্দ্ধনই রজোগুণ ভোগ হইতেছে। এই বিষয়ে গীতা বলিতেছেনঃ—

"লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মনামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥"

অস্যার্থঃ—হে ভরতর্ষভ! যে সময়ে রজোগুণ দেহে বর্দ্ধিত হয়, তখন প্রথমে লোভের প্রকাশ হয়, লোভের সহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তির আরম্ভ হয়। ক্রমে সেই সেই কর্ম্মভোগে এমন স্পৃহা জন্মায় যে, তাহাকে আর কোন ক্রমে ধৈর্য্যাব লম্বন করা যায় না।

এই রজোগুণতত্ত্ব দ্বারা আমাদের ভোগেচ্ছা প্রকাশের কারণ বোধ হইল। প্রকৃতি নামে মহাশক্তি আত্মাকে যে তিনগুণ দ্বারা জীবভাবে আকর্ষণ করেন, তাহার মধ্যে তমোগুণে তাঁহার ভোগোপাদান স্বরূপ চতুর্বিংশতিতত্ত্ব ও তাহার গুণ প্রকাশ করেন। রজোগুণে সেই তমোভাবীয় গুণগুলিকে উপহার দিয়া জীবের বিজ্ঞানাদি কোষকে আবৃত করেন। এইরূপে সংসার ভোগ হয়। এই ভোগের কারণ জানিলে ভোগক্ষয় করিতে সক্ষম হওয়া যায়। এই জন্য উপাসনাতত্ত্বে ইহা আলোচনার প্রয়োজন হইতেছে।

অতঃপর—সত্বগুণের আলোচনা করা যাইতেছে। সত্ব শব্দের অর্থ সকলের সার। প্রকৃতি ভোগাবস্থার সারের নামই হইতেছে সত্ব গুণ। অর্থাৎ জীব এই অবস্থায় ভোগী হইলে ভোগজনিত সুখ এবং জ্ঞান ভোগ করিয়া থাকে। এই সত্বের পরিচয় শ্রীগীতা দিতেছেনঃ—

"তত্র সত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকং অনাময়ং।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥"

অস্যার্থঃ—হে নিষ্পাপ! সত্বগুণ অতি নির্ম্মল ও স্ফূর্ত্তিশীল বলিযা জীব যখন ইহার আশ্রয় লাভ করে তখন এই গুণ তাহাকে সুখ ও জ্ঞানে আবদ্ধ করিয়া থাকে।

এই সত্বগুণ প্রকৃতির অন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া কেবল মানব জন্মে পুণ্যভোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব কার্য্যের বিশুদ্ধি বা ইহা জন্মের শুদ্ধ কার্য্যে আসক্তি জন্মাইলে এই সাত্বিকী প্রকৃতি জীবের ভোগ হইয়া থাকে। ইহার আশ্রয় মাত্রে জীব দুঃখ অর্থাৎ রজো ও তমোগুণজাত উপদ্রব হইতে নিস্তার পায়, এবং জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ কর্ম্ম করিতে করিতে যখন জীবের হৃদয়ে এই সত্বভাবের বিকাশ হয়, তখনি জীবের পুণ্যকর্ম্মে একান্ত ইচ্ছা ও পাপ কার্য্যে একান্ত বিরতি ঘটিয়া থাকে। দয়া, দাক্ষিণ্যাদি সমস্ত সৎগুণ এই অবস্থায় ভোগ হইয়া থাকে। এই অবস্থাটিই মানব

জন্মের প্রধান ভোগ্য বলিয়া সাধুগণে স্থির করিয়াছেন। এই অবস্থা যখন হৃদয়ে উপভুক্ত হয় বা সংস্কারাবদ্ধ হয়, তখন জীবে পরম সুখী হইয়া থাকে। এই বিষয়ে গীতা বলিতেছেনঃ—

"সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥"

অস্যার্থঃ—হে অর্জ্জুন। (পুণ্য কার্য্য করিতে করিতে) দেহের সকল ইন্দ্রিয়দ্বারযোগে যখন জ্ঞানের প্রকাশ হইবে; তখনই অন্তরে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া জানিবে।

এই প্রমাণে বোধ হইল যেঃ—সত্ত্বগুণের আশ্রয় বা সংস্কার পাইলে হৃদয়ে যে প্রবৃত্তির উদয় হয় তাহাতে আসক্তি জন্মায় না। অর্থাৎ চক্ষে রূপ দেখিয়া তাহাতে আসক্তি ঘটে না, কর্ণে মধুরাদি শব্দে আসক্তি ঘটে না। বাসনার প্রাধান্য থাকে না। অতএব কামাদি রজোগুণশক্তির বিকাশ হয় না। এই প্রমাণে সত্ত্বগুণই আমাদের জীবনের প্রধান উপাদান হইতেছে। এই সাধারণ সত্ত্বগুণের বলে আমাদের অজ্ঞান ক্ষয় হয়, কামাদির প্রাধান্য থাকে না। এই সত্ত্বগুণ যত বর্দ্ধিত হয় ততই হৃদয় ধর্ম্মপথে ধাবিত হয়; হৃদয় ততই মুক্তির জন্য লালায়িত হইয়া থাকে। ইহার বিশেষ বিকাশ হইলে; ইহা দুই ভাগে বিভাজিত হইয়া উন্নতি বিধায়ক হইয়া থাকে। ঐ দুই অবস্থার নাম মিশ্রসত্ত্ব ও বিশুদ্ধসত্ত্ব হইতেছে। যখন বিষয় ব্যাপারে একান্ত বিরক্তি আসিতে থাকে তখনই জীবের ভোগ জনিত আসক্তি ক্ষয় হয়। আত্মদর্শনের জন্য বিজ্ঞানময় কোষ, সর্ব্বদা আনন্দপথে ধাবিত হইতে থাকে। এই অবস্থাকে শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং জলবত্তথাপি তাভ্যাং মিলিত্বা শরণায় কল্প্যতে।
যত্রাত্মবিম্বঃ প্রতিবিম্বিতঃ সন্ প্রকাশয়ত্যর্কইবাখিলজড়ং॥"

অস্যার্থঃ—সত্ত্বগুণ বিশুদ্ধ জলের ন্যায় সকল তত্ত্বপ্রকাশক হইতেছে। ইহার সহিত রজঃ ও তমো মিলিত হইলে মলিন জলের ন্যায় রূপ ধারণ করে। শুদ্ধ জলে যেমন সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হইলে

তাহার মধ্যস্থ মালিন্য দেখা যায় সেইরূপ সত্ত্বগুণে আত্মা প্রতিবিম্বিত হইলে, রজ ও তমোজাত উপদ্রবগুলি অনুভব হইয়া থাকে।

অতএব রজ ও তমোগুণজাত কামাদি ও অজ্ঞান কেমনে বাসনাকে অভিভূত করিয়া জীবকে ভোগপর ও প্রবৃত্তিপর করে; জীবে সত্ত্বগুণ লাভ করিলে তৎসাহায্যে জ্ঞানযোগে আপনার দুঃখের সেই নিদান বোধ করিতে পারে। এই বিশুদ্ধ অবস্থায় হৃদয়ে চৈতন্যময় আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি হইয়া আনন্দের উদ্রেক করে। অতএব সেই আনন্দ ত্যাগ করিয়া ঘোর দুঃখমূলক প্রবৃত্তির উপরে আর স্পৃহা থাকে না। এই জন্য সত্ত্বগুণের উদ্রেকে বৈরাগ্য উদয় হইয়া থাকে। যখন আত্মাতে অনুরক্তি আসিবার জন্য প্রয়াশ অধিক হয়; তখন জীবের ভোগের সহিত মুক্তির ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই অবস্থাকে মিশ্রসত্ত্বাবস্থা কহে। এই অবস্থায় শ্রদ্ধা, ভক্তি, মুমুক্ষুতা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই অবস্থার পরিচয় শ্রীশঙ্করাচার্য্য দিতেছেনঃ—

"মিশ্রস্য সত্ত্বস্য ভবন্তি ধর্ম্মাস্ত্বমানিতাদ্যানিয়মাযমাদ্যাঃ।
শ্রদ্ধাচ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতাচ, দৈবী চ সম্পত্তিরসন্নিবৃত্তিঃ॥
বিশুদ্ধসত্ত্বস্য গুণঃ প্রসাদঃ স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ।
তৃপ্তিঃ প্রহর্ষ্য পরমাত্মনিষ্ঠা যয়া সদানন্দরসং সমৃচ্ছতি॥"

অস্যার্থঃ—এই মিশ্রসত্ত্বগুণের উদয়ে জীবের হৃদয়ে অভিমান দম্ভাদির নাশ হয়। যম, নিয়ম শ্রদ্ধা, ভক্তি মুমুক্ষুতা প্রভৃতি দৈবী শক্তি যাহার সাহায্যে অজ্ঞান ও দুঃখাদি ক্ষয় হয়, তাহাদের উদয় হইয়া থাকে। যখন ঐ অবস্থার উন্নতিতে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদয় হয়, তখন জীবে প্রকৃত আত্মানন্দানুভূতি লাভ করে। দুঃখের একান্ত শান্তি হয়। সর্ব্বদা মন প্রসন্ন থাকে। সকল ভোগ তৃপ্ত হইয়া যায়। সদানন্দ হৃদয়ে বিরাজ করে। একান্ত মুক্ত থাকা যায়। এমন প্রেমরস যে অবস্থা হইতে লাভ হয়, তাহাতেই পরমাত্মনিষ্ঠার উদয় হইয়া থাকে।

এই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবসম্পন্ন হওয়াই মনুষ্যের আয়ত্বাধীন। এই একান্ত সুখানন্দভোগজন্যই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে। এই জন্য

আমাদের সকল বৃত্তি ভোগে দুঃখভোগ হয়, একমাত্র জ্ঞানলাভেই আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। উপাসনাতত্ত্বের মধ্যে এই অবস্থা উদ্ভাবন করিবার জন্যই এই গুণভোগ অবস্থার আলোচনা হইল। এই গুণ-ভোগ-তত্ত্ব বোধে জীবের ভোগস্পৃহা ক্ষয় হইয়া থাকে।

অথ কর্ম্মফল বা সুখদুঃখভোগতত্ত্ব।

এই যে অনন্ত ও অসীম সংসার; যাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা চিরবিমুগ্ধ হইয়া আছি। রবির কিরণ, সুধাংশুর ছটা, নক্ষত্রের শোভা, ফল ফুল, জল, অনল অনিল, বৃক্ষ, লতা, কীট, পশুপক্ষী প্রভৃতি যাহার সর্ব্বত্র শোভা পাইতেছে; যাহার অন্তরে স্নেহ, মায়া, দয়া, দাক্ষিণ্য, ভক্তি, প্রেম বিরাজ করিতেছে; যাহার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ছলনা, প্রবঞ্চনা, শোক, মোহ, তাপ, মৃত্যু বিরাজ করিতেছে; যাহার শীর্ষদেশে পিতা, মাতা, আত্মীয়, কন্যা, পুত্র, পত্নী, গৃহ, বিত্তাদি বিরাজ করিতেছে। যাহা দেখিতে এত সুন্দর সেই সংসারই দুঃখের জনক হইতেছে। ইহ জীবনে যাহা কিছু দেখি, যাহাকে বাহিরে সুন্দর বলিয়া মনে হয়, যাহাকে আশ্রয় করিলে তৃপ্ত হইব বলিয়া আশ্রয় মাত্রে চিরদুঃখানলে দগ্ধ হই। তাহাকেই কর্ম্মফলভোগস্থান সংসার কহে। এই সংসারে কর্ম্মফল ভোগ করিতে গিয়া যে ফল বা পরিণাম লাভ হয়, তাহাতে দুঃখ বা দুঃখের কিঞ্চিৎ বিরতিরূপী সুখভোগ হইয়া থাকে। সংসার শব্দের অর্থ শাস্ত্রকারেরা এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—(সং দুঃখং অনুসরতীতি সংসারঃ) যে অবস্থায় সদাসর্ব্বদা দুঃখই অনুসরণ করে তাহাকে সংসার কহে।

পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে;—প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগের জন্যই

এই জীব সংসার বর্ত্তমান। বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু ও মানবাদি সকলেই সেই প্রারব্ধ ভোগের জন্য সংসারে আসিয়াছে। যেমন তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ, পিপাসায় কাতর হইয়া উত্তপ্ত বালুকাতোজোপূর্ণ মরীচিকাকে জলাশয় মনে করিয়া থাকে, সেইরূপ চিরদুঃখাত্মক প্রারব্ধভোগে অত্যন্ত ক্লেশে ব্যগ্র হইয়া জীবে দুঃখের উপশম করিবে ভাবিয়া এই আপাতঃমনোহর সংসারে আসিয়া প্রবেশ করে। যেমন অগ্নিদাহের যাতনা উষ্ণজলে শান্ত হয় না বরং অধিক যাতনা দেয়, সেইরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া জীব সংসারে প্রবেশ করে বটে, কিন্তু ইহা যে উষ্ণবারির ন্যায় অন্তরে দুঃখ সংকুল, অজ্ঞানময়, এ কথা পূর্ব্বে বোধ করে না। জীব আসিল শান্ত হইতে.কিন্তু বারম্বার দুঃখেই অভিভূত হইতে থাকিল। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তবে কি কেবল দুঃখের জন্যই সংসারের সৃষ্টি? তবে ঈশ্বর কেমন করিয়া দয়াময় হইলেন? তাহার উত্তর এইঃ—ঈশ্বর অতি কৃপাময়!! যেমন মহারোগী ব্যক্তিকে বৈদ্য কষায়, তিক্ত, কটু প্রভৃতি রস সংযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে রোগ শান্ত করেন, সেইরূপ সেই দয়াল হরি জীবের বহু বহু জন্মজাত দুস্কৃতিরোগ ক্ষয় করিবার জন্যই এই বহু দুঃখরস সংযুক্ত সংসারের অবতারণা করিয়াছেন। যেমন কুপথ্য ও নিয়মিত ঔষধ ব্যবহার না করিলে রোগের আধিক্য হয়, তদ্রূপ উপযুক্ত ভাবে সংসার ভোগ না করিলে দুঃখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ঘোর নরক লাভ হয়। যেমন নিয়মিত ঔষধ সেবনে রোগ আরোগ্য হইলে আর কেহ ঔষধ ব্যবহার করে না, তদ্রূপ প্রারব্ধ জনিত দুঃখ নিয়মিত ভাবে সংসারভোগে ক্ষয় করিয়া সংসারকে সাধুগণে ত্যাগ করিয়া থাকেন।

গর্ভ যন্ত্রণায় প্রারব্ধজন্য যে স্মৃতি তাহা জীবের ক্ষীণ হইলে, সেই পূর্ব্ব কর্ম্মসংস্কার থাকিয়া যায়, সেই সংস্কারই ইহজন্মের কর্ম্ম প্রকাশ করাইয়া ফলভোগ করায়, এ কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। আমরা সেই সংস্কারবশে যখন ভূমিষ্ট হইলাম তখন হতচেতন, হতবুদ্ধি,

হতেন্দ্রিয়শক্তি ছিলাম। সেই অবস্থায় আমাদের কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে যে অপূর্ব্বা মায়াশক্তি সাহায্য করিয়াছিলে, সেই অবিদ্যা অর্থাৎ, কর্ম্মপরা জীব ভাবীয়া মায়াশক্তির বিলাসস্থলকে সংসার কহে। ইহাতে কেবল সুখ ও দুঃখ বর্ত্তমান আছে। জন্মাইবার পরে জড়ভাবে যখন ছিলাম তখন ভোগক্ষমতার অভাবে ঘোর দুঃখী ছিলাম। যখন ইন্দ্রিয় শক্তি পাইলাম, তখন যে দিকে চক্ষু, কর্ণ, নাসা, ত্বক্, রসনা ধাবিত হয়; সেই দিকেই যেটিকে সুন্দর দেখি চক্ষুকে তাঁহাতেই মুগ্ধ করি। যাহা কুদৃশ্য বোধ হয় তাহা দেখি না। সুন্দর ভাবিয়া প্রথমে জননীর রূপ শিশুকালে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কিশোর কালে বয়স্তগণের রূপ দেখিলাম, তাঁহাতে মুগ্ধ হইলাম, যৌবনে কামিনী, কাঞ্চন, বসন, ভূষণ, পুত্র, কন্যা, গৃহ আত্মীয় প্রভৃতি সকলেব রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। এই সকল প্রথম দর্শনে তৃপ্ত হইব ভাবিয়াছিলাম, যত কষ্ট পাইয়াছি, তাহার উপশম হইবে নিশ্চয় করিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ যে মুগ্ধ হইলাম, সেই মোহই আমার সুখের পরিণাম দুঃখে আবৃত করিল। ঘোর আসক্তি ও প্রবৃত্তিবলে বার্দ্ধক্যে উহাদের সেবা করিয়া জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ, অজ্ঞান প্রভৃতি লাভ করিলাম। অতএব সংসার দেখিতে সুখদুঃখময়। যাহা সুখের বলিয়া অনুমিত হয়, ব্যবহার করিতে না জানিলে তাহা হইতে দুঃখ উদয় হইয়া থাকে। যেমন মাতৃস্তন হইতে শিশুর মুখে সুরস দুগ্ধ প্রকাশ হয়। জলৌকার বদনে রক্ত লাভ হয়। সেইরূপ সংসার যে ভোগ করিতে শিক্ষা করে তাহার পক্ষে দুঃখই কর্ম্ম ক্ষয় করাইয়া পরমানন্দের বিকাশ করে। এক্ষণে আমরা বুঝিলাম এই যেঃ—প্রারব্ধ নামক কর্ম্মের ফলভোগ যে প্রকৃতিতে পূর্ণ হয় তাহাকে সংসার কহে। সেই সংসার অবস্থা ভোগ হইতে হইতে যে অনুভূতি পরিণামে লাভ হয় তাহাতে কষ্ট হইলে আমরা দুঃখ বলি, তাহাতে কিছু তৃপ্তি হইলে সুখ বলা যায়। এই দুঃখ ও সুখ একই কথা। যে অবস্থায় সংস্কার জনিত ভোগ্যবিষয় ভোগ

করিয়া পরিণামে বিজ্ঞানময় কোষের সংকোচন ঘটে অর্থাৎ অস্ফুরণ বা অপ্রকাশ ঘটে তাহাকে দুঃখ কহে। যে অবস্থার পরিণামে ঐ কোষের বিকাশ বা স্ফূর্ত্তি ঘটে তাহাকে দুঃখের বিরতি বা সুখ কহে। যেমন কামভোগেচ্ছা প্রবল হইলে অত্যন্ত ক্লেশ বা দুঃখ হয়, কোন উপায়ে তদুপভোগমাত্রেই সেই দুঃখের কিছু শান্তি হইলে, যে একটু তৃপ্তিলাভ হয় তাহাকে সুখ কহে। বিশেষ করিয়া বুঝান এই হইল যে:—যতক্ষণ মন কর্ম্মের আয়োজনে ইন্দ্রিয়াদিকে ব্যাপৃত রাখে, বা তাহার চিন্তায় তৃষ্ণার্ত্ত থাকে, ততক্ষণ যে ক্লেশাবস্থা অনুভব হয় তাহাকে দুঃখ কহে। যখন সেই কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়; তাহাতে যে তৃপ্তি উপস্থিত হয় তাহাকে সুখ কহে। এই দুঃখ ও সুখ প্রবৃত্তিপূর্ণ সংসারের সকল কার্য্যেই লাভ হয়। দান, পুণ্য, ব্রত, নিয়মাদি হইতে ছলনা, প্রবঞ্চনা, চুরি, ডাকাইতি, হত্যা প্রভৃতি সকল উত্তমাধম কর্ম্মে এই দুই অবস্থা সংসারে ভোগ হইয়া থাকে। পূর্ব্বসংস্কার ভিন্ন উত্তম বা অধম কোন কর্ম্মই সংসারে প্রকাশ হয় না। এ কথা পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে। সেই নিয়মে আমাদের প্রারব্ধের উত্তম বা অধম সংস্কার আমরা লাভ করিয়া থাকি। উত্তম সংস্কারে আমাদের উত্তম স্বভাবধারী জন্ম লাভ হয়। সেই জন্মে ও দেহে সংসারে দান পুণ্যাদি উত্তম কার্য্য বিকাশ হইয়া থাকে। এই দান পুণ্যাদি কার্য্যও সুখদুঃখের অধিকারী হইতেছে। কারণ আয়োজনে দুঃখ নিষ্পাদনে সুখ বা তৃপ্তি লাভ হয়। আমরা যদি মন্দ সংস্কার লাভ করি তাহা হইলে আমাদের দেহ লাভ মাত্রেই মন্দ কার্য্য প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রবঞ্চনা প্রভৃতি মন্দ কার্য্যেও সেইরূপ সুখদুঃখ লাভ হইয়া থাকে। অতএব সৎ ও অসৎ উভয় কার্য্যেই সংসারে সুখ দুঃখ লাভ হয়। এই জন্য সুখ ও দুঃখকে কর্ম্মফল কহে।

এই ভীষণ সংসারে সকল প্রাণীগণের মধ্যে সুখদুঃখাতীত হইবার জন্যই কেবল মানব জন্ম লাভ হইয়াছে। অন্য কোন জীবজন্মে সুখ ও দুঃখের চরিতার্থ হয় না। অঘটনঘটনা পটীয়সী অবিদ্যাশক্তি সেই

অনন্ত প্রাণী বর্গকে দুঃখে অভিভূত রাখিয়া এমন স্মৃতিশূন্য ও মুগ্ধ রাখিয়াছেন, যে তাহারা দুঃখানুভবেও সক্ষম সহজে হয় না। কেবল মানব জন্ম দুঃখানুভবে ব্যাকুল হইয়া সুখ ভোগের জন্য সতত স্পৃহান্বিত থাকে। যে দুঃখহানিটি মানব জন্ম ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য, সেই দুঃখ তত্ত্ব বোধ করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যকীয় হইতেছে। এই দুঃখ হানি করিবার জন্যই আমাদের উপাসনার প্রয়োজন, এই জন্য উপাসনা তত্ত্বে দুঃখতত্ত্ব আলোচনার আবশ্যক হইয়াছে।

সাংখ্য শাস্ত্রে মানব জীবন পরীক্ষিত হইয়া প্রমাণিত হইয়াছে যেঃ— সংসার ভোগে মানবের তিনটি প্রধান দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। এই জন্য সাংখ্য শাস্ত্রের আদিভাগেই বলা হইয়াছেঃ—

"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরূপপরমপুরুষার্থঃ ॥"

অস্যার্থঃ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ একান্ত নষ্ট হইলেই জীবের পরম পুরুষার্থের উদয় হইয়া থাকে।

এই সূত্রে যে অত্যন্ত নিবৃত্তির কথা বলা হইল; অত্যন্ত বলিবার তাৎপর্য্যে সুখের পর্য্যন্ত নিবৃত্তি বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ আহারাদি যতক্ষণ হয় না ততক্ষণ ক্ষুধা জনিত দুঃখ হয়। আহার জন্য তৃপ্তি মাত্রেই সুখ সমুদিত হইয়া থাকে। এই যে তৃপ্তি ইহা হইতে পুনরায় আহারেচ্ছা উদয় হয়। এই আহারেচ্ছা জন্য আবার ক্ষুধা হউক এরূপ দুঃখ ভোগেচ্ছা মনে করিয়া থাকি। এই প্রমাণে দেখান হইল যে সুখটি দুঃখের বিরতিতে উদয় হয়, কিন্তু পুনরায় দুঃখের উদ্রেককারী হইতেছে। যেমন অগ্নিময় কাষ্ঠ জ্বলিতে থাকে কিন্তু জ্বলন নাশে যে অগ্নিময় অঙ্গার থাকে তাহার সাহায্যেই পুনরায় কাষ্ঠ জ্বালান যায়। এই অগ্নিপূর্ণ বিকাশ অর্থাৎ শিখা বা স্তিমিত অবস্থা উভয়ই গুরু লঘু ভেদ মাত্র হইতেছে। ঠিক ইহার অনুরূপই সুখ ও দুঃখ। এই জন্য দার্শনিকেরা এক দুঃখ শব্দকে সুখে ও দুঃখে একার্থ বাচক করিয়া ব্যবহার করেন। এই সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত ত্রিবিধ দুঃখের নাম আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক হইতেছে। আত্মা অর্থাৎ মনকে

অধিকার করিয়া যে দুঃখ বর্ত্তমান থাকে তাহাকে আধ্যাত্মিক দুঃখ কহে। দৈব বিপদকে অধিকার করিয়া যে দুঃখ জীবের ভোগ হয় তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ কহে। সমস্ত প্রাণিবর্গ বা ভূতসম্বন্ধ হইতে যে দুঃখ জীবের লাভ হয় তাহাকে আধিভৌতিক কহে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ, রোগ, শোক, প্রভৃতি যাবতীয় দুঃখ যাহা মনের অনুভূতিতে উদিত হইয়া জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহকে ক্লিষ্ট করে, তাহাকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বজ্রাঘাৎ, গ্রহ-পীড়া প্রভৃতি দৈববিপদ হইতে আধিদৈবিক দুঃখের প্রকাশ হয়। সর্প ব্যাঘ্রাদি প্রাণিভয় ও বায়ুপিত্তকফাদির বিকাবে, ভৌতিক রোগ জনিত দুঃখকে আধিভৌতিক দুঃখ কহে।' [এই যে ত্রিবিধ দুঃখ শ্রেণীর কথা বলা হইল, ইহাতেই সকল জীবে অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। এই সকল অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে পারিলেই মানব জন্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন হইয়া থাকে। অতএব কোন উপায়ে এই সকল দুঃখ হানি হয়, তাহার চেষ্টা করাই মানব জীবনের প্রকৃত আলোচনীয় হইতেছে।

যোগশাস্ত্রকর্ত্তা মহর্ষি পতঞ্জলি এই দুঃখতত্ত্ব বোধ করাইতে বলিয়াছেন যে, চিত্তের বৃত্তিগুলি পূর্ব্বসংস্কারানুসারে মলিন থাকায় জীবে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যেমন চক্ষু থাকিতেও চক্ষে যদি কখন তন্দ্রাবস্থার আবরণ বা তদ্রূপ জড়তা আসিয়া অধিকার করে, সে অবস্থায় চক্ষু দৃষ্টিশক্তি রাখিতে পারে না, সে অবস্থায় চক্ষু থাকিতেও গমনে পথে বহুদুর্দ্দশা ঘটে; দর্শনে ভ্রান্তি দৃষ্টি হয়। সেইরূপ মলিন বৃত্তিমান্ চিত্তসংস্কার জীবের প্রকৃত জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। সেই চিত্তমালিন্যকেই জীবের ক্লেশ বা দুঃখসমূহ বলা হইতেছে। সেই মলিন বৃত্তিগুলিই মনের সহযোগে জীব পাঁচ উপায়ে ভোগ করিয়া থাকেন। যোগশাস্ত্র তাহাদের পরিচয় এইরূপ দিয়া থাকেন।

"অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ।"

অস্যার্থঃ—(চিত্তের কুসংস্কারে এই পাঁচটি মালিন্য উপস্থিত হয়)

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এই পাঁচটিই পাঁচটি ক্লেশ নামে অভিহিত হইতেছে। যে বস্তুতে সুখ হইবে না, সেই বস্তুতে সুখস্পৃহাজনিত ভ্রান্তি হইতে যে অনিশ্চয়াত্মিকা অজ্ঞানের জন্ম হয়, তাহাকে অবিদ্যা কহে। সংসারের সকল বস্তুই অসৎ ইহা বুঝিয়া তাহাতে অনুরক্ত হওয়া কেবল এই অবিদ্যাযোগেই ঘটিয়া থাকে। এ অবিদ্যা চিত্তমালিন্য, ইহা মায়ার অবস্থা বিশেষ নহে। এই যে পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতাদিতে আমারা মুগ্ধ হইয়া থাকি। কেন থাকি? হয়তো অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন; কি ভয়ানক কথা! জনক, জননী, পুত্র, পত্নি, বিত্তাদি সংসারের পরম পদার্থ, তাহাতে অসদ্বুদ্ধি করা কি কখন সম্ভব হইতে পারে! ঘোর নিষ্ঠুর না হইলে এ কার্য্য হয় না। কিন্তু বাস্তবিক বুঝিয়া দেখিলে আমরা জনকাদিকে পরম পদার্থ বোধ করি না, মূর্খ ও অজ্ঞান জন্তুর ন্যায় তাঁহাদের যত্নে ও মমতায় মুগ্ধ হই মাত্র। যদি কেহ একটি বিড়াল বা কুকুরকে বিশেষ স্নেহ করে, উদ্বিড়ালকে সর্ব্বদা যত্ন করে; সেই জন্তুগুলি কি তাহার সমাদর কর্ত্তকে ভাল বাসে না? উদ্বিড়াল কি মৎস্য ধরিয়া তাহার প্রভুকে দেয় না? আমরা অজ্ঞানবশে যে পিতৃমাতৃসেবা করি তাহা উদ্বিড়ালাদির ন্যায় হইতেছে। প্রকৃত সম্মান কোথায়? যখন সেই পুত্র, কন্যা, পত্নি, পিতামাতা প্রাণশূন্য জড়বৎ হয়েন, তখন সকলে কেন দগ্ধ করেন? সেই পিতা, সেই মাতা, সেই পুত্র, কন্যা, পত্নি সমস্তই বর্ত্তমান আছেন। সেই রূপ, লাবণ্য, দেহ বর্ত্তমান আছে, তবে কিসের অভাবে শববৎ বস্তুর সমাদর করি না? বিশেষ করিয়া বুঝিলে, দেখা যায় যে, এক আত্মারূপে হরি যতক্ষণ পিতার দেহে ছিলেন ততক্ষণ পিতার সমাদর। যতক্ষণ জননীর দেহে ছিলেন ততক্ষণই জননী আমাদের উপাস্যদেবতা। পুত্র, কন্যা, রমণী সকলের মধ্যে সেই হরি যতক্ষণ অনন্ত রমণীয়ালীলা দেখান, ততক্ষণই আমরা তাঁহাদের জন্য মুগ্ধ থাকি। মুগ্ধ হইয়া সেই হরির অনন্তলীলা যদি পিতৃমাতৃ, পুত্র, কন্যা পত্নিমূর্ত্তিতে অবলোকন করি, তাঁহার অনন্ত করুণা বহু অবস্থার

যদি অনুভব করি !! আমি যখন জড়শিশু তখন যিনি জননীরূপে স্নেহ ও বক্ষের শোণিত দিয়া পুষ্ট করেন ; পিতারূপে সেই হরি আমার জীবনের গঠন, দেহের পোষণ, প্রভৃতি, সম্পাদন করেন, পত্নীরূপে যৌবনের সহায়, পুত্ররূপে বার্দ্ধক্যের সহায় সেই হরিই হইতেছেন। এই বুদ্ধি যখনই আমাদের হইবে, তখনই মোহ দূর হইয়া সংসারের সকল সুখ বা আনন্দ আমরা উপভোগ করিতে পাইব। সকল অসৎ হইতে সৎ অর্থাৎ হরির অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া, অনন্ত জ্ঞানে মণ্ডিত হইব। এইভাবে সংসার ভোগ না করিয়া আমরা যে ভাবে ভোগ করিতেছি, ইহা পশুদের সমান হইতেছে। এই জন্য দুঃখ পদে পদে বোধ হয়। সংসারের সকল বস্তুতে ভগবৎপ্রীতি আকর্ষণের উপায়কে আবৃত করিয়া অজ্ঞানের উদয় করাইতে চিত্তের এই যে মলিন ভাব বর্ত্তমান আছে, তাহাকে অবিদ্যা বা অসতে সদ্ভাব সংঘটনকারী ক্লেশ কহে।

ঐ অসৎ ভোগ করিতে করিতে বহু দুঃখ ভোগ করিয়াও অভ্যাস হেতু সেই দুঃখকে সুখ ভাবিয়া তাহাতে যে অভিমান জন্মায়। অর্থাৎ আমি ভোগ করিতেছি, আমার ভোগ্য এই বস্তু ; অন্যদ্বারা ইহা কখন ভুক্ত হইতে পারে না, এই যে স্বার্থপর অভিমান, ইহাকে অস্মিতা নামে চিত্তস্থ ক্লেশ বা দুঃখ কহে।

একবার দুঃখভোগের তৃপ্তি হইলে, বারম্বার সেই তৃপ্তিটুক ভোগ করিবার জন্য যে স্পৃহা জন্মায়, তাহাকে রাগ বা অনুরাগ নামে চিত্তের মালিন্য বা ক্লেশ কহে। যেমন আমি সুশীতল বারি পানমাত্রে তৃষ্ণানামে দুঃখের ক্ষণিক তৃপ্তি হইল বলিয়া, বারম্বার সেই তৃপ্তি ভোগ করিতে যে স্পৃহা জন্মায়, তাহাকে অনুরাগ কহে। ইহা হইতে বারম্বার দুঃখের উদ্ভব হইয়া থাকে।

যে কার্য্যে, পূর্ব্বোক্ত অনুরাগের ক্ষয় হয়, তাহাকে দ্বেষ কহে। অর্থাৎ বারম্বার যে কার্য্যদ্বারা দুঃখ উপস্থিত হয় সেই কার্য্য প্রকাশ হইলে তদ্ভোগে মনের যে গ্লানি উপস্থিত হয়, তাহাকে দ্বেষ কহে।

যেমন একজন বালক পাঠাভ্যাসে ইচ্ছা করে না, কারণ তদভ্যাসে তাহার ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। সেই ক্লেশ বারম্বার অনুভব করিবার পরে, যদি সে পুনরায় কাহারো অনুরোধে সেই কার্য্যে নিযুক্ত হয়, এই অবস্থায় অনুরোধকারীর প্রতি যে বিরক্তির প্রকাশ হয় তদনুরূপ ভাবকে দ্বেষ নামে চিত্তমালিন্য কহে। যে বৃত্তি ভোগ করিতে করিতে সমস্ত ভোগ্য বিষয়ে এবং অসৎ দেহের উপরে এত আসক্তি জন্মায় যে ক্ষণবিধ্বংশি শরীরকেও ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া বোধ হয় না, নিত্য জরা মৃত্যুর ভোগ হইলেও ভোগ অবিনাশী বলিয়া তদ্বিষয়ে অভিমানী হওয়া যায়, তাহাকে অভিনিবেশ কহে। এইটি চিত্তের অন্তর্গত ভীষণ অপকারী বৃত্তি হইতেছে। এই বৃত্তিভোগ দ্বারা সহস্র দুঃখে পতিত থাকিয়াও আমাদের দুঃখানুভবে ক্লেশ হয় না। এই বৃত্তিই জীবকে একেবারে জ্ঞানহারা করিয়া মহাদুঃখী করিয়া থাকে।

যোগ শাস্ত্রানুসারে এই পাঁচটি চিত্তবৃত্তিই প্রধান দুঃখ বলিয়া গণ্য হইতেছে। ইহারা ভোগকালে স্থূল উপায়ে এবং সূক্ষ্ম উপায়ে ভোগ হইয়া থাকে। এই অবিদ্যা, অস্মিতা প্রভৃতিগুলি যখন কেবল মনে চিন্তিত হয়, কার্য্যে পরিণত না হয়, সেই অবস্থাকে ইহাদের সূক্ষ্মাবস্থা কহে। এই অবস্থায় ইহারা বাসনার অন্তর্গত থাকে। বাসনার পর্য্যবসিত থাকাতে আমাদের সকল ইচ্ছাই মোহের প্রকাশিকা হইয়া সংসারে প্রকাশ হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অনিত্য বস্তুতে নিত্য জ্ঞানের নাম অবিদ্যা হইতেছে। এই অবস্থা যখন কোন কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত না হয়, তখন কেবল বাসনাতেই থাকে, তখন ইহার সূক্ষ্মভোগ হইয়া উঠে। যখন আমাদের দৃশ্য বস্তুর সৌন্দর্য্য দেখিয়াই তাহার নিত্যানিত্য বোধ না করিয়া তাহাকে সমাদর করিতে ইচ্ছা মাত্র করি, পরিণাম ভাবি না, তখনই অবিদ্যার সূক্ষ্ম সংস্কারের কার্য্য হয়। যখন ঐ ভাবটি সহযোগে দৃশ্য অনিত্য বস্তুকে ভোগ করিয়া মুগ্ধ হই; অর্থাৎ বহু দুঃখ পাইলেও তাহাকে ত্যাগ করিনা, সেই অবস্থাকেই স্থূলভোগ কহে। অর্থাৎ সূক্ষ্মে কেবল মোহের কল্পনা হয়, স্থূলে

মোহ ভোগ হইয়া থাকে। যোগশাস্ত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি স্থির করিয়াছেন যে;—এই সকল ক্লেশে চিত্তাদি অভিনিবিষ্ট ও মলিন থাকাতে জীবের অনিত্য ভোগে প্রবৃত্তি হয়, নিত্য বোধ হয় না। অতএব অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া প্রকৃত যে আত্মতত্ত্ব তাহা বোধ হয় না। জ্ঞানের জ্যোতিঃ না দেখিলে দুঃখহানি করিতে ইচ্ছাও হয় না। এই অবস্থায় পতিত জীবকে দেখিলেই তাঁহাদের পূর্ব্ব সংস্কার যে ঘোর অজ্ঞানমূলক ছিল ইহা স্থির হইয়া থাকে। এ বিষয়ে যোগশাস্ত্র বলিতেছেন ;—

"ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্ম বেদনীয়ঃ ॥ ১২ ॥"

"সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥" সাধনপাদঃ।

অর্থঃ—এই ক্লেশমূলক কর্ম্মেচ্ছা অর্থাৎ বাসনা, সংসারের মধ্যে জীবের অন্তর হইতে প্রকাশ হইলেই, তাহার পূর্ব্বাদৃষ্ট এবং বর্ত্তমান প্রারব্ধসংস্কার সমস্তই বোধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইহ জন্মে ক্লেশাদি ক্ষয় করিয়া যখন বহুলোকে বিশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, একথা পুরাণেতিহাসে দেখা যায়, তখন ক্লেশভোগ দ্বারা অবনতি এবং দুঃখভোগে স্পৃহা জন্মাইয়া থাকে। কোন উপায়ে ক্লেশ ক্ষয় হইলে পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। ১২।

ঐ পঞ্চবিধ ক্লেশ জনিত কর্ম্মের পরিপাক হইবার জন্যই প্রাণিগণে দুঃখের ও অজ্ঞানের তারতম্যানুসারে নানাবিধ জাতি, আয়ু ও ভোগশক্তি লাভ করিয়া থাকে। ১৩।

অতএব এই যোগসূত্রদ্বয় দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যেঃ—দুঃখ ফলভোগের জন্যই আপনাপন বাসনানুসারে বহুপ্রাণীর বহুগঠন, জাতি, আয়ু ও কর্ম্মভোগস্পৃহা সংসারে বিকাশ হইয়াছে। অর্থাৎ কেহ পশু, কেহ মনুষ্য। আবার মনুষ্যের মধ্যে কেহ মূর্খ, কেহ বিদ্বান্, কেহ শূদ্র, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ চণ্ডাল হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং তদনুযায়িক বৃত্তি পাইয়া দুঃখভোগ করিতেছে। আবার সাধনবলে দুঃখ ও ক্লেশকে ক্ষয় করিয়া এক জন্মেই বিশুদ্ধ ও আত্ম-

জ্ঞানী হইয়া মানব জন্ম সার্থক করিতেছে। পাতঞ্জল শাস্ত্রেও এক কথায় বলা হইল; দুঃখ হানি করিলে ক্রমে অমৃতপদ লাভ হইয়া থাকে।

সাংখ্য শাস্ত্রে, ত্রিবিধ দুঃখ স্বীকার করিয়া, তাহাদের ক্ষয় হইলেই পরম পুরুষার্থ লাভ হইবে এই মীমাংসা করা হইয়াছে। যোগশাস্ত্রে ঐ ত্রিবিধ দুঃখ এবং চিত্তভূমির পাঁচটি মলিন বৃত্তিরূপ জ্ঞানপ্রতি-রোধী ক্লেশ একত্রে অষ্টবিধ দুঃখহানি করিবার উপায় দেখাইয়া অমৃতপদবী স্থির করা হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে এই অষ্টবিধ দুঃখাতীত আর ছয়টি দুঃখ আমাদের ভোগ করিতে হয় তাহা বিচার করিয়াছেন। তন্ত্রতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণে কহেন, এই দেহের ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন দুঃখ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। প্রাণময়কোষে ক্ষুধা ও পিপাসা নামক উভয় দুঃখ উপস্থিত হয়। মনোময় কোষে শোক নামে মহাদুঃখ বর্ত্তমান আছে। স্মৃতি অর্থাৎ বিজ্ঞানময়কোষে মোহ নামে দুঃখ সংস্কার আছে। অন্নময়শরীরকোষে জরা ও মৃত্যু নামে উভয়বিধ দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। এ বিষয় সারদাতন্ত্র বলিতেছেনঃ—

"বুভুক্ষাচ পিপাসা চ প্রাণস্য মনসস্মৃতৌ।
শোকমোহৌ, শরীরস্য জরামৃত্যু ষড়ূর্ম্ময়ঃ॥"

অস্যার্থঃ—প্রাণের বুভুক্ষা ও পিপাসা, মনের শোক, স্মৃতি অর্থাৎ চিত্ত ও বুদ্ধির মোহ, স্থূল শরীরের জরা ও মৃত্যু নামে ছয়টি ঊর্ম্মি এই ভোগাবস্থায় বর্ত্তমান আছে।

দুঃখের উৎপাদন স্বভাবকে শাস্ত্রে ঊর্ম্মি কহে। সরোবরের জল যদি সর্ব্বদা ঊর্ম্মিমালায় কম্পিত হয়, তাহাতে প্রতিবিম্বিত, অটল, অচল চন্দ্রবিম্বকে যেমন কম্পিত বলিয়া ভ্রান্তিবোধ হয়। তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত ছয়টি দুঃখভোগ, দেহের স্থূলসূক্ষ্ম ও চারি অবস্থায় বর্ত্তমান থাকাতে সাক্ষীরূপী আত্মাকে ভোক্তা বলিয়া ভ্রান্তিস্থির হয়, এই জন্য ঐ দুঃখগুলিকে তন্ত্রশাস্ত্রে ঊর্ম্মি কহে। একে একে তন্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রের বিচার দ্বারা দেখান হইল যে, প্রারব্ধ কর্ম্মের সংস্কারটি

আমাদের ইহ জন্মের কর্ম্মপ্রকাশক হইতেছে। বর্ত্তমান কর্ম্মময় স্বভাব পাইয়া তাহার পরিণামে যখন আমরা বারম্বার দুঃখে অভিভূত হইতেছি, তখন কর্ম্মের ফলকে দুঃখ বলিয়া স্বীকার করিতে হইল।

এই দুঃখসমূহ ক্ষয় যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে। ঘোর সংসারী হইলেও দুঃখক্ষয়ের প্রয়োজন, ঘোর বৈরাগী হইলেও দুঃখক্ষয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতএব দুঃখক্ষয় ব্যতীত আমাদের শান্তিলাভের উপায় নাই। এই দুঃখ হানি করিবার কৌশলকেই উপাসনা কহে। ইহা পরে বিবৃত হইবে।

অথ পাপ ও পুণ্যভোগতত্ত্ব।

এক্ষণে পাপ ও পুণ্য উভয় ভোগতত্ত্বের প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে আমরা যে সংস্কার দ্বারা দুঃখভোগ করিয়া থাকি; সেই দুঃখভোগ করিতে করিতে আমাদের চিত্তের যখন এমন ভ্রান্তি ঘটে, যাহাতে আমরা একেবারে হিতাহিত বোধশূন্য হইয়া থাকি; সেই অবস্থাকে ঘোর অজ্ঞানাবস্থা বলে। সেই অবস্থায় যে সকল কার্য্য করিলে আমাদের জ্ঞানের প্রতিরোধ ঘটে; বিজ্ঞানময় কোষকে জড়তায় পূর্ণ করিয়া হিতাহিত বিবেক শূন্য হই, সেই সকল কার্য্যফলকে পাপ কহে। একথা বুঝিতে হইলে ইহাই যথেষ্ট হইবে যে:—আমরা পূর্ব্বসংস্কারানুসারে বা ইহ সংস্কার-বলে যে সকল কর্ম্ম সংযোগে জ্ঞানক্ষয়, বিবেকক্ষয়, মানবদেহের ও মনের অবনতি ঘটাইয়া থাকি, তাহার পরিণাম ফলকে পাপ কহে। এই পাপ উপস্থিত হইলে বিজ্ঞানময় অবস্থাটি জড়স্বভাবে পরিণত হয়, এই জন্য আমরা জ্ঞান হারাইয়া থাকি। পাপভারে চিত্ত অবিশুদ্ধ হইয়া থাকে, এই জন্য আমরা বিবেকশূন্য হই। পাপাচরণে আয়ুক্ষয়

হয়, এই জন্য আমরা নানারোগে আক্রান্ত হইয়া অকালমৃত্যু প্রভৃতির যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকি। পূর্ব্বে যে সকল দুঃখের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল দুঃখভোগ ফলই পাপ নামে সংসারে বর্ত্তমান। সেই পাপ বলে আমরা কি ইহ, কি পর উভয় জন্মকেই গ্লানিময় করিয়া থাকি। অতএব পাপের ন্যায় আমাদের শত্রু নাই। উপাসনা-তত্ত্বে পাপক্ষয় করিবার কৌশল বিশেষরূপে বিবৃত হইবে। পাপ কাহাকে বলে এবং তাহার শোধনের উপায় কি? এবিষয়ে শ্রীমনুমহর্ষি বলিয়াছেন :—

"অকুর্ব্বন্‌বিহিতং কর্ম্ম নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্।
প্রসজ্জংশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ॥"

অস্যার্থঃ—যে সকল কাম্যভোগকে শাস্ত্রকর্ত্তাগণ নিন্দিত ও নিষিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; ইন্দ্রিয়শক্তিগুলিকে মনের সহিত সেই বিষয়ে প্রয়োগ করিলে এবং শাস্ত্রবিহিত উপদেশ পালন না করিলে, যে সংস্কার লাভ হয়; সেই সংস্কার হইতে পবিত্র হইতে মানবের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

যে সংস্কার লাভ করিলে মানবকে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয় তাহাকেই শাস্ত্র পাপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই পাপ সংস্কার আমাদের দেহের স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় অংশই অধিকার করিয়া থাকে। তজ্জন্য পাপস্পর্শ মাত্রেই আমাদের দুঃখ ভোগানুসারী ভিন্ন ভিন্ন রোগযুক্ত দেহগঠন লাভ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে মনু মহর্ষি বলিতেছেনঃ—

"ইহ দুশ্চরিতৈঃ কেচিৎ কেচিৎ পূর্ব্বকৃতৈস্তথা।
প্রাপ্নুবন্তি দুরাত্মানো নরা রূপবিপর্য্যয়ং॥"

অস্যার্থঃ—মানবগণে ইহজন্মে ও পূর্ব্বজন্মে দুরাচারজনিত গ্লানি সূচক কর্ম্ম করিয়া যে ফল লাভ করে; তাহাতেই মানবগণের মন কুভাবে মণ্ডিত থাকে; এবং প্রাপ্ত দেহে বহু বহু অঙ্গবৈকল্য উপস্থিত হইয়া থাকে।

"শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাক্‌দেহসম্ভবং ॥
কর্ম্মজা গতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ।"

অস্যার্থঃ—মন অর্থাৎ মনসংযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ অর্থাৎ মন সংযুক্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং স্থূলদেহ, এই ত্রিবিধ অবস্থা সাহায্যে পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে যেরূপ শুভাশুভ কর্ম্ম প্রকাশ হইবার উপযুক্ত স্বভাব মানবে লাভ করে, মানবগণে তদনুরূপ কর্ম্মানুযায়ী গতিবলে; উত্তম, মধ্যম ও অধম অবস্থা সংসারে লাভ করিয়া থাকে।

এইকয় শ্লোক দ্বারা মহর্ষি মনু বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন যে, মনের মধ্যে কর্ম্ম সংস্কার যে ভাব ধারণ করিবে, ইন্দ্রিয়াদি তৎকার্য্যের উপযোগী হইবে। ইন্দ্রিয়চেষ্টা যে ভাব ধারণ করিবে, শরীরের গঠনও তদনুযায়ী হইবে। উত্তম অর্থাৎ পুণ্য বা পবিত্র সংস্কার হইলে পবিত্র ভাব সম্পন্ন দেহ, মন ও বুদ্ধি লাভ হয়। পাপপুণ্য মিশ্রিত সংস্কার হইলে মধ্যম অর্থাৎ হিতাহিত উভয়কর্ম্মপ্রবৃত্তিময় দেহ, মন ও বুদ্ধি লাভ হয়। কেবল পাপসংস্কার থাকিলে দেহ, মন ও বুদ্ধি একেবারে ঘোর অশান্তিভাব ধারণ করিয়া থাকে। ইহ সংসারে বিশেষ রূপে দেখা যায় যে:—কোন এক ব্যক্তি পুণ্যভোগ কালে মহাধনী, সুন্দর, রূপবান্ ও উত্তম গুণযুক্ত দেহ ধারণ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি পাপাচরণে বা প্রারব্ধফলে যখন দুর্ব্বুদ্ধি লাভ করিল; তখন তাহার দেহস্থ রূপ, গুণ ও বুদ্ধি প্রভৃতি সকলি গ্লানিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সুচরিত্র লোকের ও দুশ্চরিত্র লোকের মূর্ত্তি দেখিলেই বোধ হইয়া থাকে। এমন কি পশু পর্য্যন্ত এই সকল অবস্থাতে ভীত ও অভীত হইয়া থাকে। নিষ্পাপী সাধুমূর্ত্তি দেখিয়া ব্যাঘ্রও হিংসা করে না এবং দুষ্টমূর্ত্তি মনুষ্য দেখিলে কুকুরও দংশন করিতে ধাবিত হয়। অতএব যে পাপ ব্যবহার করিলে, পাপ সংস্কারে, সংসারের হেয়, আত্মীয়ের হেয়, জীবের হেয়, এমন কি কুক্কুরাদিরও ভীতিপ্রদ ও হেয় হওয়া যায়!! যাহা দেহে থাকিতে সকলের ঘৃণিত হওয়া যায়, সেই পাপকেই আমরা অজ্ঞান বশতঃ সতত দুঃখের আকর জানিয়াও সকলে

অবলম্বন করিয়া থাকি। অতএব যাহা অবলম্বন করিলে ভীষণ দুঃখ এবং ক্রমে মনুষ্য জন্ম হইতে বিচ্যুত হইতে হয়; যাহা দেহ, মন, ও প্রাণের একান্ত অহিতকর হইতেছে। যাহা জন্মজন্মান্তরেও ক্ষয় হয় না, এমন ভীষণ পাপাশ্রয় আমরা মনুষ্য এবং আর্য্য সন্তান হইয়া করিতেছি; ইহাপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি আছে?

এই যে পাপের পরিচয় দেওয়া হইল, ইহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য শাস্ত্র যে কৌশল স্থির করিয়াছেন তাহাকে পুণ্যকর্ম্ম কহে। পাপ জনিত দুঃখ প্রশান্ত করিতে পবিত্র অনুষ্ঠান যোগে যে ফল ইহ জন্মে বা পূর্ব্ব জন্মসংস্কার হইতে আমরা লাভ করি, তাহাকে পুণ্যফলভোগ কহে। ঐ পাপ ক্ষয় করিতে আমাদের অবস্থানুসারে পুণ্য আবরণ করিতে হয়। মনোবিকার শোধনের জন্য শুভ চিন্তনাদির আবশ্যক হয়। বুদ্ধির বিকার নাশ করিতে আত্মজ্ঞান বিচার করিতে হয়। দেহের বিকার নাশ করিতে ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে হয়। এক্ষণে পাপ ও পুণ্য কাহাকে বলে তাহা আমরা বলিলাম। সম্ভবতঃ কতকগুলি পাপকার্য্যের উল্লেখ করা উচিত হইতেছে এবং কোন্ পুণ্য ক্রিয়ায় তাহাদের শান্তি হয় তাহাও দেখান হইতেছে।

শ্রীমনু বলিয়াছেনঃ—

"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতক ন্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥
রেতসেকঃ স্বযোনীষু কুমারীষন্ত্যজাসু চ।
সখ্যুপুত্রস্য চ স্ত্রীষু গুরুতল্পসমং বিদুঃ॥
এবং কর্ম্ম বিশেষেণ জায়ন্তে সদ্বিগর্হিতাঃ।
জড়মূকান্ধবধিরা বিকৃতাকৃতয়স্তথা॥
চরিতব্যমতোনিত্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে।
নিন্দ্যৈর্হি লক্ষণৈর্যুক্তা জায়ন্তেহনিষ্কৃতৈনসঃ॥"

অস্যার্থঃ—ব্রহ্মহত্যা অর্থাৎ নির্দ্দোষী ব্রাহ্মণের প্রাণ বধ বা

তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক ক্লেশ প্রদান করা। সুরাপান করা, চৌর্য্যাদি কার্য্য করা, ইষ্টদেববংশীয়া, শ্রেষ্ঠ বর্ণীয়া এবং স্বজাতীয় গুরুজনের নারীর সহিত রমণাদি কার্য্যকে মহা পাপ বলিয়া শাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল পাপকারী ব্যক্তির সংস্পর্শে যাহারা থাকে তাহারাও তাদৃশ পাপসম্পর্কীভূত হইয়া থাকে

নিজ সহোদরা বা ভগ্নি সম্বন্ধীয়া কামিনী, অঋতুমতী কুমারী কন্যা, চণ্ডালী; কিম্বা নিজ বন্ধুপুত্রের বা আত্মীয় পত্নীতে যে ব্যক্তি রেতসেক করে, তাহার গুরুপত্নী হরণ সম মহাপাপ অধিকৃত হইয়া থাকে। এইরূপ বহু বহু বিশেষ বিশেষ পাপ কর্ম্মে নিরত থাকাতে মানবে সাধুগণের বিগর্হিত গঠনে ও জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। এমন কি পাপ বিশেষে তাহাদের জড়, মূক, অন্ধ, বধির, বিকৃতাঙ্গ প্রভৃতি দুঃখসংকুল আকৃতি ধারণ করিতে হয়।

এই সকল পাপাবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সতত উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ব্যবহার করা চাই। যদি তাহা না করা হয়, তবে অতি ঘৃণিত লক্ষণযুক্ত পাপ জন্ম বারম্বার মানবের লাভ হয়। সেই পাপ জনিত নরক যন্ত্রণা তাহাদের জন্ম জন্মান্তরেও ক্ষয় হয় না।

এই যে সকল পাপাচারের কথা এস্থলে বলা হইল, এই সকল পাপের অন্তর্গতই সকল পাপাচরণ হইতেছে। এই জন্য আমরা আর সকল পাপের বিশেষ পরিচয় দিলাম না। যাহাতে হৃদয়ের বিশুদ্ধি না ঘটে, যে সকল কার্য্য করিলে কাম, ক্রোধ, লোভাদির প্রকাশ সতত হয়, যে কার্য্য করিলে আয়ুক্ষয় ও পরস্প বিরোধ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে আমাদের কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমুদয় শরীর অতিশয় ঘৃণিত ভাব ধারণ করে। যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে জ্ঞান হানি হয় ও আয়ু হানি হয়; বিশেষতঃ ইহকালে সংসার ভোগ ও পরকালে বিষম দুঃখ উপস্থিত হয়। সমাজে পশু প্রভৃতির ন্যায় পরস্পর নিত্য বিরোধ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই সমস্ত কার্য্য ব্যবহার করিলে যে ফল উপস্থিত হয়, তাহকা

পাপ কহে। এই পাপ ক্ষয় করিতে যে সকল অনুষ্ঠানে শুভ ফল লাভ হয় তাহাকে পুণ্য কহে। এই পাপে আমাদের অনুষ্ঠান অনুসারে শরীরের ভূতাংশে ফলভোগ করিতে হইলে সেই অংশের শোধন করা আবশ্যক। ইন্দ্রিয়াংশে পাপ উপভুক্ত হইলে, সেই অংশের শোধন আবশ্যক। জ্ঞানেন্দ্রিয় সমন্বিত মনোময়াংশে ঐরূপ গ্লানি উপস্থিত হইলে, তাহার শোধন করা উচিত। এইরূপ শোধনার্থে যে সকল অনুষ্ঠান করা যায় তাহাই পুণ্য এবং প্রায়শ্চিত্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। এই সকল কর্ম্মভোগ বিষয়ে শ্রীমনু বলিতেছেন:—

"মানসং মনসৈবায়মুপভুঙ্‌ক্তে শুভাশুভং।
বাচাবাচা কৃতং কর্ম্ম কায়েনৈব চ কায়িকং॥"

অস্যার্থঃ—মনোকর্ত্তৃক কৃত পাপ বা পুণ্য কর্ম্মফল মনোময় অংশেই উপভুক্ত হইয়া থাকে। বাক্যের দ্বারা কৃত পাপ কর্ম্ম বা পুণ্য কর্ম্মফল বাক্যেই উপভুক্ত হয়। শরীরকৃত পাপ ও পুণ্য ফল শরীর সহযোগেই ভোগ হয়।

"পর দ্রব্যেষভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসং॥
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বন্ধ প্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধং॥
অদত্তানামুপাদানং হিংসাচৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতং॥"

অস্যার্থঃ—পরধনের উপর অন্যায় পূর্ব্বক গ্রহণ জন্য চিন্তাকরণ, পরের ও আপনার অনিষ্ট মনে চিন্তা করণ; পরলোক নাই, ঈশ্বর নাই, দেহই সর্ব্বস্ব, এইরূপ অশুভ চিন্তনকেই ত্রিবিধ মানসিক পাপচিন্তা কহে। সর্ব্বদা অপ্রিয় কথন, সর্ব্বদা মিথ্যা ভাষণ, পরোক্ষে পরদোষ কথন, নিজ হিতচিন্তা ব্যতীত পরের বিষয় লইয়া বৃথা বাক্য ব্যয় প্রভৃতিকে বাক্‌জনিত পাপ কহে। কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি সহযোগে অন্যায়ে

পরস্বগ্রহণ, অবিহিত হিংসা, পরদারোপসেবা এই সকল কার্য্যে ত্রিবিধ শারীর পাপ উপস্থিত হইয়া থাকে।

এইরূপ, পাপকার্য্যের সাহায্যে শরীরের বিকৃতি যেরূপে ঘটে, তাহা শ্রীমনু মহর্ষির আদেশানুসারে দেখান হইল। পাপে শরীরের ও মনের বিকৃতি ঘটে, বুদ্ধি অপ্রসন্ন হয়; জ্ঞান হীন হইয়া পশুবৎ হওয়া যায়। পুণ্যে ঐ সকল অবস্থা হইতে উন্নত হওয়া যায়। অতএব উপাসনা সহযোগে পাপক্ষয় ও পুণ্যাহরণ প্রয়োজন হইতেছে।

অথ বিশুদ্ধিতত্ত্ব।

আমরা এতক্ষণ যতগুলি তত্ত্বের আলোচনা করিয়া আসিলাম, তাহাতে আমাদের দুঃখের বর্ণনাই করা হইল। যে সকল অবস্থা অবলম্বন করিয়া আমরা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, সে সমস্তই দুঃখময়। তাহাদের ফল পরিণামে পাপ ও দুঃখমূলক। আমরা দুর্ল্লভ মানববংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কোথায় সুখের চরম সীমা দর্শন করিব, তাহা না করিয়া ভীষণ দুঃখে কাতর হইতে থাকিলাম; ইহাপেক্ষা শোকের কথা! বিস্ময়ের কথা! আর কি আছে? পূর্ব্বোক্ত দুঃখের কথায় দুঃখাবস্থা আলোচনা করিয়া, যাহার মন সুখের ইচ্ছায় ধাবিত হইবে। সেই ব্যক্তিই আপনাপনি নিজ কর্ম্ম ও স্বভাব বিশুদ্ধির চেষ্টা করিবে। যতক্ষণ আমাদের মন উপভুক্ত অবস্থাগুলিকে তুচ্ছ বলিয়া না বিবেচনা করিবে, যতক্ষণ তাহাদের অনর্থকরী বলিয়া স্থির না করিবে, যতক্ষণ তাহাদের পাপ ও দুঃখের উদ্রেকারী বলিয়া নিশ্চয় না করিবে, ততক্ষণ আমরা বিশুদ্ধ হইবার অধিকারী হইতে পারিব না। অতএব প্রথমে জগৎ ও দেহ এবং উপভুক্ত বিষয়গুলির তত্ত্ববিচার দ্বারা যাহাতে

ঐ সকল অবস্থার উপরে আমাদের উপেক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয়; এমন চিন্তা করা আবশ্যক, এমন উপদেশ গ্রহণ করা আবশ্যক, এমন অনুকূল বিচার করাও আবশ্যক হইতেছে। এই যে অসৎ বস্তুতে অপ্রীতির, অনাস্থার ও অভক্তির উদ্রেক এবং সৎবস্তু পরিজ্ঞানের স্পৃহা, ইহাকেই বিশুদ্ধ হইবার প্রথম সোপান বলিয়া শাস্ত্রকর্ত্তাগণ স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্বাবধি আমরা দুঃখের পরিচয়ই পাইয়াছি, এক্ষণে সেই দুঃখ হইতে উদ্ধার কি উপায়ে হওয়া যায়, কিসে পরম জ্ঞানী ও আত্মতত্ত্ব পূর্ণ হওয়া যায়। কিসে জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ, পাপ ও ব্যাধির হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ হয়, সে বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

শুদ্ধি শব্দ প্রয়োগ করিলেই চলিত; এ স্থলে বিশুদ্ধি শব্দ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন কি? ইহা বুঝাইতে বলা হইতেছে যে; কিঞ্চিৎ শোধনের নাম শুদ্ধি হইতেছে। যেমন স্নানে অঙ্গশুদ্ধি ইত্যাদি। কিন্তু যে শোধন অবলম্বন করিলে আর কখন অশুদ্ধি বা অজ্ঞান উপস্থিত হইতে পারে না, তাহাকে বিশুদ্ধি কহে। ঈশ্বর ও গুরুতে একান্ত ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে দেহ, মন, প্রাণ ও বুদ্ধিকে তন্ময় করিলে, চিত্তের যে প্রসন্নতা আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাতে প্রারব্ধ ক্ষয় হইয়া থাকে। প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে সূক্ষ্ম শরীরের যে পবিত্র আত্মভাবময় পূর্ণজ্ঞান ও প্রেমময় অবস্থার বিকাশ ঘটে, সে বিকাশ আর কখন বিলোপ হয় না, ইহাকেই বিশুদ্ধি কহে। পূর্ব্বে আমরা গুণতত্ত্ব বিচারকালে যে সত্ত্বগুণের উদ্রেক কথা বর্ণনা করিয়াছি; সেই সত্ত্বগুণ যত বর্দ্ধিত হইবে, ততই বিশুদ্ধি উপস্থিত হয়। সেই সত্ত্বগুণ যখন বিজ্ঞানমিশ্র হয় তখন বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ লাভ হয়, সেই অবস্থায় মানবের মন বিষয়ভোগস্পৃহা ত্যাগ করিয়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম ও মুমুক্ষুতার দিকে ধাবিত হইয়া থাকে।

চিত্তের অশুদ্ধি ও মালিন্য ক্ষয় করিতে যোগশাস্ত্রে যে সকল কৌশল দেখাইয়া গিয়াছেন, সেই সকল কৌশলই সাধকগণ অবলম্বন

করিয়া বহু উপায়ে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই চিত্তমালিন্য নাশের উপায় দেখাইতে শ্রীযোগশাস্ত্রে পতঞ্জলি ঋষি বলিয়াছেনঃ—

"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।"

অস্যার্থঃ—ঈশ্বর প্রণিধান সহযোগেই চিত্তের মালিন্য দূর হয় এবং যোগ সাধনোপায় সুগম হইয়া থাকে।

মনে একান্ত নিষ্ঠা করিয়া সমস্ত কর্ম্ম সেই ভগবানে অর্পণ করিতে যে একান্ত ভক্তির প্রযোজন হয়, সেই ভক্তি জনিত ভগবদুপাসনাকে ঈশ্বরপ্রণিধান কহে।• শরীরের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণাংশ দ্বারা সেই ভগবদ্বস্তু অনুভব যাহাতে হয় তাহাকেই—প্রণিধান কহে। এই প্রণিধান ও উপাসনা একই কথা। ঈশ্বরের বহুবিধ অবস্থা লক্ষীভূত করিয়া তত্ত্বজ্ঞেরা আত্মবিশুদ্ধিব জন্য প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম উপাসককেও ঈশ্বরভাবীয় অবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, ইহাই যোগ শাস্ত্রের আদেশ হইতেছে। ঈশ্বর ভাবটি কিরূপ অবস্থাসূচক, তাহা বুঝাইতে যোগ শাস্ত্র বলিতেছেন—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ।"

অস্যার্থঃ—যে পূর্ণ চৈতন্যাবস্থা সংসারে অন্তর্যামী থাকিলেও, পঞ্চ ক্লেশ যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; প্রারব্ধাদি কর্ম্মবিপাক যাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না, ভোগ্যবস্তুর মধ্যে থাকিলেও বাসনা যাঁহাতে উদয় হয় না; যিনি জীব নামে অন্তর্যামী মায়াধীন অবস্থা হইতে বিশেষ অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও পৃথক; তিনিই ঈশ্বর হইতেছেন। অর্থাৎ ইচ্ছামাত্র জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় প্রভৃতি ঘটাইতে পারেন।

এই যে যোগশাস্ত্রানুযায়ী ঈশ্বরত্ব নির্ব্বাচন, ইনিই সকল সাধক গণের স্থিরসিদ্ধান্তিত হইয়া আছেন। এই অবস্থাকে ভাবনা করিলে আমাদের চিত্তের মালিন্য দূর হইয়া যায় এবং আত্মজ্ঞান লাভ হয়। ঈশ্বরের যে অবস্থা কয়টির পরিচয় দেওয়া হইল, তাহা ভাবনা দ্বারা আমাদের চিত্তশুদ্ধি কেমন করিয়া ঘটে তাহা বিবেচনা করা উচিত হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আমাদের অভাব মোচন

করিবার জন্য তন্মোচনে সক্ষম কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সমীপস্থ হইয়া বিনীত ভাবে নিত্যাবস্থানের নাম উপাসনা। সামান্য অর্থাভিলাষে কিম্বা রোগ ও তাপ নাশের জন্য ধনীর বা বৈদ্যাদির নিকট বিনীত ভাবে উপস্থিতি প্রভৃতি উপাসনা শব্দের গৌণার্থক্রিয়া হইতেছে। আমাদের জন্ম, জরা, মরণ, আধ্যাত্মিকাদি তাপ প্রভৃতি ক্ষয় করিবার জন্য, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ও স্বভাব ক্ষয় করিবার জন্য, যে পরমাত্ম বস্তুর সন্নিহিত হওনার্থে মন্ত্রাদি ও একাগ্রতাদিযোগে সতত চেষ্টা, তাহাকেই উপাসনার মুখ্য উপায় কহে। এই মুখ্য উপায়ে চিত্তের যে পূর্ব্বোক্ত মালিন্য তাহার বিনাশ ঘটিয়া থাকে। চিত্তের মালিন্য ক্ষয়ের জন্য যোগশাস্ত্র ঈশ্বরের অবস্থা বর্ণনা করিয়া, তাঁহার প্রণিধান অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণাদি দেহ সহযোগে সেই ঈশ্বরবস্তুতে একান্ত আসক্তি স্থাপন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। পূর্ব্বে ঈশ্বরের অবস্থা নির্ণয়ার্থ যে বিশেষণগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহা কখনই অনুভব হইতে পারে না, অর্থাৎ যাঁহাতে ক্লেশ নাই, যাঁহাতে কর্ম্ম-বিপাক নাই, যাঁহাতে বাসনা নাই, এমন অবস্থাই ঈশ্বর হইতেছেন। সেই বিশেষণ ভাবদ্বারা নির্ণীত অবস্থা কেমন করিয়া অনুভব হইতে পারে? এই জন্য যোগশাস্ত্র তাঁহার বিশেষ অবস্থা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

"তাস্যবাচকঃ প্রণবঃ।
তজ্জপস্তদর্থভাবনং॥"

অস্যার্থঃ। সেই ঈশ্বর প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কারবীজদ্বারা নির্ণীত হইয়া থকেন। সেই ঈশ্বরপ্রতিপাদিত প্রণবাদির জপ এবং তাহার গুণক্রিয়াদি চিন্তন দ্বারা চিত্তের মালিন্য ক্ষয় হইয়া থাকে।

এই যে ওঙ্কার শব্দের দ্বারা ঈশ্বরের নির্ণয় করা হইল, এবং সেই শব্দের জপ ও সেই শব্দবেদ্য ঈশ্বরভাবের গুণ ও ক্রিয়াদি চিন্তার কথা বলা হইল; ইহাতো শব্দমাত্র, ইহার সাহায্যে ঈশ্বরত্ব কেমন করিয়া অনুভব হয়? এই সন্দেহ অনেকের হইয়া থাকে।

তন্নিরসনার্থে বলা হইতেছে :—এই যে ওঙ্কার শব্দ তিনটি বীজের মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া চতুর্থ হইয়াছে। অ+উ+ম=ওঁ। অকার বর্ণের অর্থ বিষ্ণু। বিষ্ণু বলিতে যিনি সমস্ত বিশ্বরূপী আত্মা হইয়া সকলকে পালন করিতেছেন। উকার বর্ণের অর্থ ব্রহ্মা অর্থাৎ যিনি বিশ্বের সৃষ্টি করিতেছেন। মকার বর্ণের অর্থ মহেশ্বর কাল অর্থাৎ যিনি সংহার করেন। এই সৃষ্টি, পালন ও সংহার যে সত্বার দ্বারা হয়, তিনি চতুর্থ অর্থাৎ সৃষ্টি, সংহার ও পালনাদির অতীত চতুর্থ ও বিশুদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান আছেন। আমরা জীব, আমাদের পক্ষে জাগ্রত, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন এই তিন অবস্থায় আমাদের সৃষ্টি, স্থিতি লয় হয়। জাগ্রতে সৃষ্ট, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয়ব্যাপারে নিযোজিত থাকিয়া ভোগ সৃষ্টি করে। স্বপ্নে ভোগ বিরত হয় এইজন্য উহাই স্থিতি বলি। নিদ্রায় সেই মন ও প্রাণাদি লয় হয় এবং শরীরের ক্ষয় ও নূতন সংস্কার হয়, এইজন্য ইহাকে সংহার কাল কহে। এই বিষয়ে মাণ্ডুক্যোপনিষৎ বলিতেছেন :—

"ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানভূতং ভবৎভবিষ্যদিতিসর্ব্ব মোঙ্কার এব। যচ্চান্যত্ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব।"

অস্যার্থ :—ওঙ্কার নামে যে অক্ষর, ইহাতে সর্ব্ববিশ্ব প্রপঞ্চ বুঝাইয়া থাকে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানাদি ত্রিকালে যাহা বর্ত্তমান ছিল, হয় ও হইবে, সে সমস্তই ওঙ্কার স্বরূপ হইতেছে এই ত্রিকালের অতীত যাহা তাহাও ওঙ্কার হইতেছে।

"সোহয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোবিমাত্রং পাদামাত্রা মাত্রাশ্চপাদা অকার উকারো মকার ইতি।"

অস্যার্থঃ—এই যে অকার, উকার, মকার নামক ত্রিপাদ অংশ এবং নাদ ও বিন্দু নামে মাত্রা বর্ত্তমান আছে, এই মাত্রা ও পাদ সম্বলিত ওঙ্কার অক্ষরই আত্মাবাচক হইতেছে।

এই ওঙ্কার ও অন্যান্য দেবতার নামে কিছুমাত্র পৃথক্ নাই। হরি, রাম, দুর্গা, কালী প্রভৃতি যে সকল নাম সম্প্রদায়ভেদে আমরা

ব্যবহার করিয়া থাকি। সে সমস্ত নামই এক আত্মবাচক হইতেছে। পরমাত্মবাচক ওঙ্কার শব্দ, লীলা ও গুণভেদে হরি প্রভৃতি শব্দে পরিণত হইয়াছে। ইহার পরিচয় পরে দেওয়া যাইবে। বাসুদেবরহস্য তন্ত্র, হরি, ও রাম শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন :—হরি শব্দে হ+র+ই এই তিন বর্ণ আছে। রাম শব্দে র+আ+ম এই তিন বর্ণ আছে। ইহাদের অর্থ এই :—

"হকারস্তু সুতশ্রেষ্ঠ শিবঃ সাক্ষান্ন সংশয়ঃ।
রেফস্তু ত্রিপুরাদেবী দশমূর্ত্তিময়ী সদা।
ইকারঞ্চ ভগং বিদ্যাৎ সাক্ষাৎ যোনিং তপোধন॥

অস্যার্থঃ—হে সুতশ্রেষ্ঠ, হে তপোধন! এই যে হরিনাম, ইহার মধ্যে হকারকে সংহারকর্ত্তা মহেশ্বর বলিয়া জানিবে, রকারকে সৃষ্টিবিধায়িণী দশমূর্ত্তিময়ী ত্রিপুরা অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্মকারণবাসিনী ত্রিপুরাদেবী বলিয়া জানিবে। আর ইকারকে ভগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যভোগের যোনি বা কারণ বলিয়া জানিবে।

রামশব্দের অর্থ উক্ত তন্ত্র বলিতেছেন ;—

রেফস্তু ত্রিপুরা সাক্ষাদানন্দামৃতসংযুতা।
মকারস্তু মহামায়া নিত্যাতু রুদ্ররূপিণী॥

অস্যার্থঃ—স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ নামক ত্রিপুরারূপিণী মহাশক্তি, আকাররূপী আনন্দামৃতে সংযুত যখন থাকেন, তখন তাহাকে (রা) বলা যায়, এবং সংহারকারিণী মহাশক্তির নাম মকার হইতেছে। তিনি সতত সংসারে নিত্যা হইয়া বর্ত্তমান আছেন।

এই যে হরি, রাম প্রভৃতি শব্দের অর্থ দেখান হইল, ইহাদের অর্থও সেই সৃষ্টি, সংহার ও পালনাত্মক ভাব সমন্বিত হইতেছে। অতএব সৃষ্টি-সংহার ও পালনাত্মক অনন্তলীলা এবং গুণ সমন্বিত ভগবদ্ভাব ভাবনা ও জপ করিলে চিত্তের মালিন্য দূর হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল। লৌকিকে একথা আমরা কেমন করিয়া বুঝি? এ বিষয়ে দর্শনশাস্ত্র বলিতে-ছেনঃ—যে বস্তু সত্য তাঁহার রূপ, গুণ প্রভৃতির অনুস্মরণে তদ্ভোগ

উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে দ্রব্যাদি স্থূল বলিয়া কথঞ্চিৎভোগ হয়। কাম ক্রোধাদি সূক্ষ্ম বলিয়া পূর্ণ ভোগ হয়। আত্মা একান্ত সূক্ষ্মতম বলিয়া সম্পূর্ণ ভোগ হইয়া থাকে। যেমন একটি গোলাপফুল জড় পদার্থ তাহার রূপ ও গুণ ভাবিলে তদ্বস্তুজাত প্রতীতি মনোমধ্যে যৎকিঞ্চিৎ উদয় হইয়া থাকে। সুন্দরী রমণী তাহাপেক্ষা চেতন, এই জন্য যুবকে তাহার অনুধ্যান করিলে তদিন্দ্রিয় ভোগ অধিকাংশে হয়। কামক্রোধাদি তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, তাহার চিন্তামাত্রে তত্তৎ রিপুর পূর্ণমাত্রা বিকাশ হইয়া থাকে। যিনি আত্মা, যিনি অতি সূক্ষ্ম অথচ নিত্য, তাঁহার গুণ ও ক্রিয়াদির চিন্তায় বিশেষরূপে তদ্ভাব হৃদয়ে অনুভূত হইয়া থাকে। এই সূক্ষ্মানুভূতি দুই উপায়ে হইয়া থাকে। এক উপায়ে বর্ণনায়, অন্য রূপ কল্পনায়। আমরা সংসারে ভার্য্যা শিক্ষার্থে পুস্তকাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করিলে, সেই অক্ষরাদি সংযোগে বর্ণিত বিষয়গুলিকে অনুধ্যান করিতে করিতে তজ্জ্ঞান সতত লাভ করিয়া থাকি। লক্ষণ গুলিকে রূপ কল্পনা কহে; যেমন রোগাদির মূর্ত্তি কেহ কখন দেখে নাই, কিন্তু লক্ষণদ্বারা রোগনির্ণীত হইয়া ভৈষজ্য প্রয়োগে রোগের শান্তি ঘটে। সেইরূপ আত্মা ইন্দ্রিয়গোচরীভূত শব্দাদি পদার্থগুণ নহেন, এই জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েন না। কিন্তু সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য তাঁহার লক্ষণ হইতেছে ভক্তে কৃপাকরণাদি হইতেছে তাঁহার গুণ। অতএব ঐ লক্ষণ ও গুণ সহযোগে যে সকল ভাষা কল্পিত আছে, তাহার জপ ও প্রণিধানে ঐশীভাব স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এই জন্য যোগশাস্ত্র ঐশীভাবদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতে ঐসকল ভাবময় ওঙ্কারাদি শব্দকে ভাবনা ও চিন্তা করিতে বলিলেন। এই ভাবনা ও চিন্তাযোগে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইলেই সমস্ত চিত্তভ্রান্তি দূর হইয়া যায়। সকল সাধন শাস্ত্রই এই এক উপায় দ্বারা ভগবৎসাধনের কথা বলিয়াছেন। এ বিষয়ে মহানির্ব্বান তন্ত্র বলিতেছেন:—

"যতোবিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ সর্ব্বাণি লীয়ন্তে জ্ঞেয়স্তদ্ ব্রহ্মলক্ষণৈঃ॥"

অস্যার্থ-—হে দেবি! যাহা হইতে বিশ্বপ্রপঞ্চের উদ্ভব হইয়াছে, যাহাতে বর্ত্তমান আছে এবং অন্তে যাহাতে লয় হইবে, এই সকল লক্ষণ দ্বারা সেই ব্রহ্ম বস্তুকে জানা যায়।" মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকে বলা হইয়াছেঃ—

"সবেদৈতৎ পরং ব্রহ্মধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রং।
উপাসতে পুরুষং যেহ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তিধীরা॥"

অস্যার্থঃ—যে ব্রহ্ম পদার্থে এই জগতের সূক্ষ্মাদি অবস্থা নিহিত আছে। তিনি অতিশয় জ্যোতির্ম্ময় হইতেছেন, (তাঁহাকে পরংব্রহ্ম বলিয়া জানা উচিত হইতেছে।) যে ব্যক্তি এই পুরুষকে নিজ বুদ্ধিযোগে ব্রহ্মলক্ষণাক্রান্ত জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া চিন্তা করিতে পারেন; তিনিই এই ব্রহ্মকে জানিয়া থাকেন।

মুণ্ডমালা তন্ত্রে এ বিষয় বিশেষ করিয়া বলিতেছেনঃ—

"তস্মাদ্বিজ্ঞানতো মুক্তির্ণান্যথা ভাবকোটিভিঃ।
মন্ত্রৌষধি বলৈর্যদ্বজ্জীর্য্যতে ভক্ষিতং বিষং॥
তদ্বৎসর্ব্বাণি কর্ম্মাণি জীর্য্যন্তি জ্ঞানিনং ক্ষণাৎ।
দেহাভিমানে গলিতে বিদিতে পরমাত্মনি॥"

অস্যার্থঃ—সেই পরমাত্ম বস্তুকে বিশেষ রূপে জানিতে পারিলে, জীবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। পরমাত্ম জ্ঞান ব্যতীত কোটি কোটি অনুষ্ঠান বা ভাবে মুক্তি হইতে পারে না। যেমন মন্ত্র ও ঔষধির ক্ষমতায় ভক্ষিত বিষের তেজ নষ্ট করিতে পারা যায়, তদ্রূপ যে ব্যক্তি পরমাত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া দেহাভিমানকে নষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহারই প্রারব্ধ, আগামী, সঞ্চিত প্রভৃতি কর্ম্মসমূহ ক্ষণমাত্রে জীর্ণ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে স্বয়ং ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেনঃ—

"বাহ্যে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্নতা মনঃ প্রসাদে পরমাত্মদর্শনঃ।
তস্মিন্ সুদৃষ্টে ভববন্ধনাশো বহির্নিরোধঃ পদবীবিমুক্তেঃ॥

অস্যার্থঃ—বাহ্য বিষয় হইতে মনকে আত্মাতে নিরুদ্ধ করিলে মনের প্রসন্নতা হয়, তাহাতেই পরমাত্মদর্শন ঘটে। পরমাত্মদর্শন

মাত্রেই ভববন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়। অতএব বহির্নিরোধই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হইতেছে।

এই সকল শাস্ত্রপ্রমাণে দেখান হইল যেঃ—ঈশ্বরের সৃষ্টিস্থিতি সংহারাত্মক লক্ষণযুক্ত নাম ও মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে চিত্তের মালিন্য ক্ষয় হয় এবং চিত্তের বিশুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বরোপাসনাই চিত্তশুদ্ধির একমাত্র উপায়। চিত্তশুদ্ধি হইলেই আত্মজ্ঞান হয়। আত্মজ্ঞান মাত্রেই রোগ, তাপ, জরা মৃত্যুর ক্ষয় হইয়া থাকে।

অথ অনুষ্ঠানতত্ত্ব।

যে কোন কার্য্যফল লাভ করিবার জন্য যে কোন আয়োজন, তাহাকে অনুষ্ঠান কহে। যেমন ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য অন্নাদির আহরণ, তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য পানীয়ের আয়োজন, দ্রারিদ্র্য নিবৃত্তির জন্য ধনাগমের আয়োজন প্রভৃতি হইয়া থাকে। এস্থলে উপাসনা রূপী কর্ম্মযোগে পরিপূর্ণ শান্তি ফললাভের জন্য যে আয়োজন, তাহাকে অনুষ্ঠান কহে। এই অনুষ্ঠান উপাসনাকল্পে চারি উপায়ে সংসাধিত হয়। একটির নাম দ্রব্য সংযুক্ত অনুষ্ঠান, দ্বিতীয়ের নাম ক্রিয়াসংযুক্ত, তৃতীয়ের নাম কালসংযুক্ত, চতুর্থের নাম মন্ত্রসংযুক্ত অনুষ্ঠান হইতেছে।

উপাসনার জন্য শুদ্ধ বস্ত্র গ্রহণ, শুদ্ধ আহারীয় গ্রহণ, ফল, ফুল, জল, তণ্ডুল, মিষ্টান্নাদি উপকরণযোগে নিজেষ্টদেবতা পূজনাদিকে দ্রব্যসংযুক্ত অনুষ্ঠান কহে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এবং মুদ্রাদি উপায়ভূত যোগাচারগুলিকে ক্রিয়াসংযুক্ত অনুষ্ঠান কহে। শুভ বার, শুভ নক্ষত্র, শুভ তিথি প্রভৃতি দেবপৈত্র কর্ম্মে যাহা প্রয়োজন হয়, তাহাকে কালসংযুক্ত অনুষ্ঠান কহে।

সন্ধ্যা, পূজা, একাদশী, চাতুর্ম্মাস্য, চান্দ্রায়নাদি ব্রত, বিষ্ণু, শক্তি ও অন্যান্য পূজা, শ্রাদ্ধতর্পণাদি এই কালসংযুক্ত অনুষ্ঠানের অন্তর্গত হইতেছে।' নিজ গুরু ও দেবতাকে উপাসনা কালে, নিজদেহে আবাহন, স্থিরীকরণ, স্থাপন, পূজন, বলিদান এবং বিসর্জ্জনাদি ক্রিয়ার্থে যে সকল বৈদিক ও তান্ত্রিক বাক্যগুলি প্রয়োগ হয় তাহাকে মন্ত্র কহে। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য, ক্রিয়া ও কালসংযুক্ত ত্রিবিধ অনুষ্ঠানের সকল অবস্থাতেও যে বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধি ও উপদেশ প্রযুক্ত হয় তাহাকেও মন্ত্র কহে। এই অবস্থাকে মন্ত্র সংযুক্ত অনুষ্ঠান কহে।

এই যে চতুর্ব্বিধ অনুষ্ঠানের কথা বলা হইল। ইহাদের সাহায্যেই আমাদের শরীরের স্থূল ও সূক্ষ্মাংশে বিশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে অনেকের জিজ্ঞাস্য হইতে পারে! পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, একমাত্র আত্মপদার্থ জ্ঞান হইলেই চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং চিত্তশোধিত হইলেই জন্ম, জরা, মৃত্যু, দুঃখ, শোক, তাপ সমস্তই ক্ষয় হয়। এক্ষণে আবার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? চিন্তাযোগে কার্য্য করিলেই যখন সিদ্ধি, তখন চিন্তনেরই আবশ্যক, অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? তদুত্তর এই যথাঃ—বহু জন্ম সঞ্চিত সংস্কার যাহা আমরা কর্ম্মবশে পাইয়াছি, তাহাতে মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপন শক্তিদ্বয় আমাদের চিত্তভূমিকে একেবারে আবৃত ও সংস্কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সেই সংস্কার ক্ষয় হইলে তবে ভগবচ্চিন্তার অধিকার চিত্ত প্রাপ্ত হয়। নচেৎ অবিশুদ্ধচিত্তে যে কোন সচ্চিন্তা প্রযুক্ত হউক না কেন, তাহাতে কোন ফলই লাভ হইবে না। যেমন শিশুকালে কন্যা মাটির ঘর দ্বার ও আত্মীয়স্বামী, পুত্রাদি সাজাইয়া ক্রীড়া করে, যুবতী বয়সে আর তাহাতে আসক্তি থাকে না, কারণ জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশে ঐ ক্রীড়াকে মিথ্যা বলিয়া স্থির হয়। যেমন মদ্যাদি মাদক দ্রব্য ব্যবহারে আসক্ত ব্যক্তি আপনার অহিত হইতেছে জানিয়াও মাদকতা থাকিতে তাহার প্রতীকার জন্য ফল লাভ করিতে পারে না। যেমন এক ব্যক্তি তাসপাসা কোন এক সময়ে ক্রীড়া করিতে করিতে সেই

সময়োপযুক্ত সংস্কার তাহাকে এমন আসক্ত করে যে, সেই সময়ে না খেলিলে তাহার আর শান্তি হয় না। যতক্ষণ না কোন বিপদ ও সম্পদে তাহার সেই ক্রীড়াকাল নষ্ট করে, ততক্ষণ তাহার সংস্কার ক্ষয় হয় না। জ্ঞানে বুঝিলে বালিকার ক্রীড়া মিথ্যা হয়; মদ্যাদি পান অতি গর্হিত বলিয়া স্থির হয়, তাস পাসা খেলা অত্যন্ত হেয় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যতক্ষণ না তাহাদের জ্ঞান বা অন্য বিষয়ে তাহাদের আসক্তির পরিণতি না ঘটে, ততক্ষণ সেই অকিঞ্চিৎকর পূর্ব্বাভ্যাসেই তাহারা মুগ্ধ থাকে। তদ্রূপ আমাদের জীবভাব লাভে চিত্তের কতকগুলি ভোগজন্য সংস্কার লাভ হইয়াছে। সেই সংস্কার-গুলি প্রবৃদ্ধ হইয়া মন, বুদ্ধি ও কায়া এই ত্রিবিধ অবস্থাকেও তৎ-সংস্কারীভূত করিয়া রাখিয়াছে। যেমন ক্ষুধা একটি দুঃখ, তৃষ্ণা একটি দুঃখ; কাম, ক্রোধ, স্নেহ, মমতা এ সমস্তই দুঃখ হইতেছে। কিন্তু নিত্য নিত্য ক্ষুধার দুঃখ মোচনার্থ স্বাদু আহারীয় ব্যবহার করিয়া আমাদের এমন সংস্কার হইয়াছে যে, নিত্য স্বাদু আস্বাদন করিবার জন্য ক্ষুধার আরাধনা করিয়া থাকি। তৃষ্ণাদুঃখ নাশার্থে শীতল সলিলে এমন আসক্ত হইয়াছি যে, তৃষ্ণা দুঃখই আমাদের অতি সুখকর হই-য়াছে। ঐরূপ কামদুঃখ নাশ করিতে মৈথুনাদি তৃপ্তিজন্য সতত আমরা কামেচ্ছা করি। আপন অনভিলষিত বিষয়ে দ্বেষবুদ্ধিকে চরিতার্থ করিতে ক্রোধ নামে দুঃখের অনুসরণ করি। পুত্র, কন্যা, ধন, গৃহাদি; পালন, পালন, প্রীণন, অনুধ্যান ও রক্ষণ এবং সতত তাহার জন্য চিত্তকে নিবেশ করণাদি অবশ্যই দুঃখকর হইতেছে। কিন্তু স্নেহ ও মমতা চরিতার্থ করিতে ঐ দুঃখগুলিকে আমরা সতত ব্যবহার করিয়া থাকি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, সংসারভোগা-শক্তি জনিত কারণগুলি অর্থাৎ ক্ষুধাদি সকলই কষ্টকর ও পীড়াদায়ক দুঃখ বটে, তবে দুঃখের উপর আমাদের এত আসক্তি কেন? তদুত্তর এই :—অতিদুঃখভোগে দুঃখভোগটি অভ্যাসের মধ্যে গণ্য হইয়া যায়। ঘোর দুঃখভোগ করিতে করিতে অন্তর্বৃত্তিগুলি

লোপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন কোন এক সুশীল ব্যক্তি কখন হিংসাদি করে নাই, কখন কামিনী সহবাস করে নাই; সেই ব্যক্তিকে প্রত্যহ হিংসা অভ্যাস করাইবার প্রথম অভ্যাসে, পশুপক্ষী-বধকালে তাহার হৃদয় করুণায় অতিশয় কাতর হয়; ক্রমে ঐ কাতর্য্য দুঃখ তাহাকে এত আবৃত করে যে তৎসহযোগে তাহার চিত্তের সূক্ষ্মানুভূতি ক্ষয় হইয়া যায়। সূক্ষ্মানুভূতি ক্ষয় হইলে সত্ত্বগুণ ক্ষয়ে ক্রমে রজোগুণের হিতাহিত বিবেকও ক্ষয় হইয়া যায়। সেই মূঢ়াবস্থায় ঘোর তমোগুণে আবৃত হইয়া সেই ঘোর হিংসাজনিত অভ্যাসবশে আর তাহার বধজনিত ক্লেশ অনুভব হয় না। পূর্ব্বে তাহার বধজনিত দুঃখ অনুভব হইত. এক্ষণে অনুভব হয় না, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল চিত্তের মলিন সংস্কার জন্য তাহার সূক্ষ্মানুভূতি ক্ষয় হইল বলিয়া বিজ্ঞানময় কোষে সুখ ও দুঃখ বোধ হইল না। ঐরূপ বেশ্যাদি জুগুপ্সিতা কামিনী সম্ভোগজন্য প্রথমে সুশীল ব্যক্তির ভয় ও লজ্জা থাকে, এই কামিনী ভোগে যখন ভয় লজ্জা থাকিল, এই ভোগ দুঃখের স্থানীয়, ইহা নিশ্চয় কথা হইতেছে। ক্রমে অভ্যাসবশে চিত্ত মলিন হইলে, আর ভয়লজ্জা থাকে না। খুনী ব্যক্তির প্রথম খুন অভ্যাস করিতে, হৃদয়ে করুণার সঞ্চারে ক্লেশ হয়, ক্রমে অভ্যস্ত হইলে পুত্রকে খুন করিতেও সে কুণ্ঠিত হয় না। এই যে সকল কার্য্যের কথা বলিলাম; এই সকল অবস্থার প্রথম অভ্যাসে দুঃখ বোধ হয়, পরিণামে বোধ হয় না কেন? অতিমাত্র দুঃখ ভোগ করিতে করিতে চিত্তের প্রসন্নতা আবৃত হইয়া থাকে। এই জন্য শেষে দুঃখেরও দুঃখানুভব হয় না, বরং তাহাতেই অভ্যস্ত হইয়া বারম্বার দুঃখভোগেই স্পৃহা হইয়া থাকে।

এই যে পুনঃপুনঃ দুঃখভোগে আসক্তি, ইহা কেবল চিত্তের অবিশুদ্ধি জন্য মানবের ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বে যে মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপশক্তির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, ঐ উভয় শক্তিই পূর্ব্বোক্ত দুঃখ ভোগের হেতু হইতেছে। কারণ যাহাকে দুঃখ বলিয়া প্রথমে অনুভব করিলাম, তাহা-

কেই উপাদেয় ভাবিয়া আমরা কেন ব্যবহার করিয়া থাকি। কেবল আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিবলে আমাদের মিথ্যাতে সত্য বুদ্ধি ঘটিয়া থাকে বলিয়া, আমরা ঐরূপ মুগ্ধ হই মাত্র যেমন সর্প মণিমন্ত্রাদিতে মুগ্ধ থাকিয়া ক্রীড়াকারীর ক্রীড়ার বস্তু হয়, তদ্রূপ আমরা মুক্তিবীর্য্য-মণ্ডিত, জ্ঞানবীর্য্যসান্বিত হইয়াও মায়ার বিক্ষেপ ও আবরণমন্ত্রবলে মুগ্ধ হইয়া সংসারী জীব হইয়াছি। যেমন সূর্য্যকে মেঘ কিয়দংশ আবরণ করিলে আমরা সূর্য্য ঢাকা পড়িল বলিয়া নিশ্চয় করি। সেই রূপ আবরণশক্তিবলে দুঃখ ভিন্ন সংসারে ভোগের উপকরণ আর লাভ হয় না বলিয়া, আমরা দুঃখকেই সার ভাবিয়া তাহাকেই সুখ ভাবিয়া অবলম্বন করি। যেমন অবলম্বন করি,অমনি মায়ার বিক্ষেপ শক্তি যোগে সত্য নিশ্চয় করিতে ভুলিয়া যাই। এই জন্য একবার ক্ষুধাদিতে মুগ্ধ হইলে বিক্ষেপশক্তিবলে বারম্বার ক্ষুধার ইচ্ছা করি। একবার আবরণ শক্তি বলে যে কার্য্য করিয়া ব্যাধি উপভোগ করি, বিক্ষেপশক্তিবলে সেই কার্য্যে দুঃখ পাইলেও তাহা ভুলিয়া বারম্বার পীড়িত হইয়াও তাহাতে আসক্ত থাকি। একবার পুত্র, বিত্ত, বিষয়ে আবরণশক্তি বলে আমরা মুগ্ধ যেমন হইলাম, তাহাদের ক্ষয়ে একবার শোক, তাপ যেমন পাইলাম, অমনি বিক্ষেপশক্তিবলে সে কষ্ট ভুলিয়া বারম্বার তাহাতেই আসক্ত এবং বারম্বার শোক ও তাপ ভোগ করিতে থাকিলাম। আবরণশক্তিবলে জ্ঞান হারাইয়া আমরা আসক্ত মাত্র হই, বিক্ষেপশক্তি বলে আমরা দুঃখ বোধে অক্ষম হইয়া বারম্বার তাহাতে মুগ্ধ হইয়া থাকি। জন্মমাত্রে আবরণশক্তি আমাদের যে দুর্দশা ঘটাইবার তাহা ঘটাইয়াছে। এক্ষণে বিক্ষেপশক্তিবলে চিত্ত অবিশুদ্ধ হওয়াতে বহু দুঃখসংস্কার লাভ করিয়া আমরা সংসার ভোগ করিতেছি। আমাদের মুক্তিবীর্য্য মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় হারাইয়াছি। আমাদের আত্মজ্ঞানসূর্য্য চিত্তের বিক্ষেপ দোষজনিত মেঘে আবৃত হইয়াছে। এই চিত্তের অবিশুদ্ধ কালে অবশ্যতে ও হেয় বিষয়ে যে আসক্তি দেখা যায় তাহাকেই চিত্তের বিক্ষেপ দোষ কহে। এই

বিক্ষেপদোষ উপস্থিত হইলে বহির্বিষয়ে মন, বুদ্ধি ও চিত্তের ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। অন্তর্দৃষ্টি একেবারে ক্ষয় হয়, এই জন্য আত্মদর্শন বা আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। এই অবস্থা উপস্থিত থাকাতে আমাদের সকলের চিত্ত, বুদ্ধি, মন ও বাহ্যদেহ সমস্তই মলিন সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া আছে। এই অনুষ্ঠানতত্ত্ব কথিত উপায়দ্বারা আমাদের কায়িক মনের ও চিত্তের শুদ্ধি ঘটাইতে পারিলে তবে চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে। সেই বিশুদ্ধ চিত্তে কেবল আত্ম চিন্তা সংশাধিত হইলে আমাদের সুফল লাভ হইবে। যেমন শবদেহে অলংকার গৌরবের বস্তু নহে, মৃণ্ময় পুত্তলীর বস্ত্রাভরণ, যেমন বাহ্য শোভার জন্য, রোগীকে পুষ্টিকর দ্রব্যদান যেমন তাহার রোগ বৃদ্ধিপ্রদায়ক; সেইরূপ অবিশুদ্ধ চিত্তে ভগবচ্চিন্তা কোন ফল প্রদান করিতে পারে না। দেহসংস্কার, মনসংস্কার ও চিত্তসংস্কার ব্যতীত কখনও ভগবচ্চিন্তা লাভ হয় না। চিত্তের বিক্ষেপ জনিত দোষগুলিই ভগবত্তত্ত্ব বোধের একান্ত বিরোধী, এ বিষয়ে শ্রীযোগশাস্ত্র বলিতেছেনঃ—

"ব্যাধি স্ত্যান সংশয় প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধ—
ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ।"

অস্যার্থঃ—ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন; অলব্ধভূমিকত্ব, অনবস্থিতত্ব এই কয়টিই আত্মদর্শনোপযুক্ত সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা সাধনের বিরোধী বিক্ষেপ জনিত দোষ হইতেছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কেবল তমোগুণ দ্বারা মায়ার আবরণ শক্তি গঠিত হইয়াছে, এবং রজো ও তমোগুণের মিশ্রণে বিক্ষেপ শক্তির গঠন হইয়াছে। চিত্তে বিক্ষেপ শক্তি কার্য্য করিলে ঐ দুইটী অবস্থা চিত্তের লাভ হয়। চিত্ত বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ রজস্তমোময় হইলে মন ও বুদ্ধির তাহাই ঘটিল। মনবুদ্ধি যেরূপ ভাবাক্রান্ত হইল, স্থূল দেহও সেই অবস্থাপন্ন হইল। এইজন্য স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপে যোগ শাস্ত্রোক্ত কয়েকটি দোষ ভোগ কালে সাধারণতঃ মানবের লাভ হইয়া থাকে। ধাতু অর্থাৎ

ধাতু, পিত্ত, কফ বিকৃত বা বৈষম্যভাব ধারণ করিলে ব্যাধি উপস্থিত হয়। অনেকে মনে করিতে পারেন মনের হইল গ্লানি, স্থূল দেহ কেন তাহাতে পীড়িত হয়। ইহা সংসারের নিত্য ঘটনা, অতি ভয়ে, অতি ক্রোধে, অতি শোকে জ্বর হইয়া থাকে। মনের গ্লানি মাত্রেই প্রাণাদি শক্তিগুলির গ্লানি উপস্থিত হয়; বায়ু, পিত্ত ও কফের স্বধর্ম্মে অবস্থান, কেবল প্রাণশক্তির স্ফুর্ত্তিতেই ঘটিয়া থাকে। মনাদির মূঢ়তায় যখন প্রাণাদির গ্লানি ঘটে সেই সময়ে নিয়মিত বায়ু, পিত্ত, কফের গতি রাখা যায় না বলিয়া ব্যাধি ঘটিয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তে চিত্ত বিক্ষেপে স্থূল দেহের বিকারের কথা বুঝান হইল। অকর্ম্মণ্য দোষকে স্ত্যান কহে। অস্থির ও নির্ব্বুদ্ধিমান হইলেই অকর্ম্মণ্য দোষ ঘটিয়া থাকে। কোন কার্য্যে সুফল বা কুফল ঘটিবে ইহা ভাবিয়া কর্ম্ম অনারম্ভেই তৎপ্রতি ঔদাস্যকে সংশয় কহে। বিপদ বা সম্পদ নিকটবর্ত্তী ইহা জানিয়া তদ্বিষবে অসাবধানতাকে প্রমাদ কহে। আহার, তৃষ্ণা, কাম ও ক্রোধাদির অতিশয় ব্যবহারে অতি পরিশ্রান্তি জন্য স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের যে জড় ভাব তাহাকে আলস্য কহে। দিবা-রাত্র ভোগস্পৃহাকে অবিরতি কহে। বহু দুঃখ ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, পরাগমে, লাভ করিলেও তদ্বিষয়ে নিতান্ত মনোনিবেশ জন্য যে সংস্কার তাহাকেও অবিরতি কহে। এই অবস্থায় অতি ভোগী, অতি লোভী, অতি কৃপণাদি দোষে দূষিত হওয়া যায়। দুঃখাভ্যাসে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকাকে ভ্রান্তিদর্শন কহে। কোন সদ্গুরু বা উপযুক্ত তীর্থাদি স্থানে উপস্থিত হইয়াও মনের শান্তির দিকে সচেষ্ট না হওয়াকে অলব্ধভূমি-কত্ব কহে। গুরুমন্ত্রগ্রহণ, তীর্থাদিসেবন ও সাধনাদির অনুষ্ঠানে দীক্ষিত হইয়াও তাহাতে সম্যক্ বিশ্বাস না করা বা অনাস্থা প্রদর্শন করা বা উপযুক্ত নিয়মে না থাকাকে অনবস্থিতি দোষ কহে।

এই যে কয়েকটি দোষের পরিচয় দেওয়া হইল ইহাদের শান্ত-করিতে না পারিলে চিত্তের একাগ্রতা অর্থাৎ দুঃখশান্তির জন্য আত্ম-দর্শন কখনই ঘটিতে পারে না।

এ বিষয়ে যোগ শাস্ত্র বলিতেছেনঃ—

"ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোহপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।

অস্যার্থঃ—যে কোন কৌশলে চিত্তকে বাহ্য বিষয়াসক্তি ও দুঃখ প্রবৃত্তি হইতে অন্তরে আত্ম চৈতন্যের দিকে পরিণত করিতে পারিলে বিক্ষেপ জনিত বিপদগুলি নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই অবস্থায় চিত্তের অন্তরে যে বিশুদ্ধি সংস্কার হয়, ইহার সাহায্যে অন্য বিষয় জনিত কুসংস্কার ক্ষয় হইয়া থাকে, চিত্ত প্রশান্ত হয়, আত্ম বস্তু চিন্তনের অধিকার লাভ করে। এ বিষয়ে পুনরায় যোগশাস্ত্র বলিতেছেনঃ—

"তজ্জ সংস্কারোঽন্যসংস্কারবিরোধী।"

অস্যার্থঃ—এই প্রজ্ঞাজনিত সংস্কার চিত্তে উপস্থিত হইলে, বিষয় সংস্কার দূর হয়, এমন কি একাগ্র হইতে যে ব্রত, নিয়ম, যোগা ঙ্গাদি অভ্যাস জনিত শুদ্ধ সংস্কার লাভ হইয়াছিল, তাহাও ক্ষয় করিয়া আনন্দ উদ্দীপন হইয়া থাকে।

এই সকল যোগ শাস্ত্র কথিত সূত্র সাহায্যে চিত্তের দোষ প্রমাণ করা হইল। সেই দোষ সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরব্যাপী ইহাও বলা হইল; অতএব স্থূল ও সূক্ষ্মের বিশুদ্ধির জন্য পূর্ব্বোক্ত চারিটি অনুষ্ঠানের আবশ্যক হইয়া থাকে। তন্ত্রাদি সাধন শাস্ত্রে ঐ বিক্ষেপ দোষ সংযোগে স্থূলে ও সূক্ষ্মে আরো কতকগুলি দোষ ঘটে ইহা স্বীকার করা হইয়াছে। সেই দোষগুলিও বিনানুষ্ঠানে ক্ষয় হয় না। সেই দোষ গুলি দ্বারা জীবের ভোগ বন্ধন ঘটে বলিয়া তাহাদের পাশ কহে। একে একে আটটি পাশে আমরা আবদ্ধ হইয়া মুক্ত হইতে পারি না। এ বিষয়ে কুলার্ণব তন্ত্র বলিতেছেনঃ—

"জীবঃ শিবঃ শিবো দেবঃ সজীবঃ কেবলঃ শিবঃ।
পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তো সদাশিবঃ॥"
ঘৃণালজ্জাভয়ংশোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

অস্যার্থঃ—জীবই শিব স্বরূপ, শিবই স্বয়ং দেব অর্থাৎ বিশুদ্ধাত্মা হইতেছেন। এই নিয়মে জীবমাত্রেই শিব স্বরূপ বুঝিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যথা, যখন আত্মা অষ্ট সংসার পাশে আবদ্ধ হয়েন তখনই তাঁহার জীব অর্থাৎ আবদ্ধ এই সংজ্ঞা হয়, এবং যখন তিনি পাশমুক্ত হয়েন তখন তিনি বিশুদ্ধাত্মা শিব হইয়া থাকেন।

সংসার ভোগ করিতে করিতে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় শোক, জুগুপ্সা কুল, শীল এবং জাতি এই আটটই পাশরূপে জীবের বন্ধনকারী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এই অষ্টপাশরূপী সংস্কার কেমন করিয়া আমাদের দুঃখদায়ী ইহা বুঝা উচিত হইতেছে, এবং অনুষ্ঠান বলে কেমন করিয়া উহাদের ক্ষয় হয়, তাহাও বুঝা উচিত হইতেছে। অজ্ঞান জনিত হেয় ও উপাদেয় বোধকে ঘৃণা কহে। আমিষভোজী, মাংসভোজী লোকে নিরামিষ আহারাদিকে ঘৃণা করে। ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে ঘৃণা করে। নিজ সংস্কারানুসারে অজ্ঞানবশে যাহাকে উপাদেয় বোধ হয়, তদ্ব্যতীত সকল বস্তুকেই যে হেয় ভাব দর্শাওন, এই অবস্থাকে ঘৃণা বুঝায়। ইহা অজ্ঞানোত্থিত কি না? তদ্বিষয়ে বিচার এইঃ—শিশুকালে যখন ভোগক্ষমতা ছিলনা, তখন বিষ্ঠাচন্দন, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, আমিষ নিরামিষ, এক বোধ ছিল; তখন ঘৃণার উদয় হয় নাই। ক্রমে যখন বিষয় ভোগ ঘটিতে ঘটিতে আমার আসক্তি অনুসারে একটি উপাদেয় অর্থাৎ সুখবোধক সংস্কার স্থির হইল, তাহাতে অভিমানী হইয়া আমি যাহা ভাল না বাসি তাহাতেই যে বিরক্তি প্রকাশ করি, তাহাকেই ঘৃণা কহে। আমি ছিন্নবস্ত্র, দরিদ্র, মলিনভাবসম্পন্ন লোক দেখিলে ঘৃণা করি। আমি সুখ শয্যায় শয়ন করি বলিয়া তৃণশয্যাকে ঘৃণা করি, আমি দুগ্ধাদি পান করি বলিয়া কদন্নকে ঘৃণা করি। এই ঘৃণা হইতে উপাদেয় বোধে যে ভোগের আলিঙ্গন এবং হেয় বোধে যে পরিত্যাগ, ঐ উভয় আলোচনা করিতে করিতে ভোগে ভীষণ মোহ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাতে মন সর্ব্বদা অশুচি হইয়া থাকে।

পথে, ঘাটে, বসনে, ভুষণে, আত্মীয়ে, স্বজনে, সর্ব্বদা দোষদর্শী হইয়া থাকে। তাহার কোন বিষয়ে বিশ্বাস হয় না, সর্ব্বদা স্বার্থের চিন্তায় ব্যগ্র হইয়া ঘৃণিত জীব হইয়া যায়। এইরূপ ঘৃণাকে বৈদ্যশাস্ত্রে ভয়ঙ্কর ব্যাধি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এ স্থলে সন্দেহ হইতে পারে তবে কি ঘৃণা করিব না? তদুত্তর এইঃ—জ্ঞানযোগে গুরু প্রভৃতির উপদেশবলে, এবং আবহমান প্রচলিত সাধুগণের উপদেশ বলে, যে বিষয়গুলিকে উপাদেয় বলিয়া স্থির করা হইয়াছে তাহা অবলম্বন এবং হেয় বস্তুর সহিত সম্পর্ক রহিত হইতে হয়। হেয় বলিয়া মনে ও প্রাণে তাহাদের তুচ্ছ করাতে বা উপেক্ষা করিবার চিন্তা করাতে চিত্তের মালিন্য ক্ষয় হয় না বরং ভীষণ রোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এই ঘৃণাতে ভয়ানক অশান্তি আসে বলিয়া ইহা জীবের প্রধান বন্ধনরজ্জু স্বরূপ হইতেছে।

এই নিয়মে লজ্জাও একটি দোষ হইতেছে। প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় মনোভাব প্রকাশ না করিয়া আত্মগোপন করার নাম লজ্জা হইতেছে। ব্যাধির কথা বৈদ্যের নিকটে না বলিলে, স্ত্রীর দুঃখের কথা স্বামীর কাছে না প্রকাশ পাইলে, যেমন কখন তাহা নিবারণ হয় না, তদ্রূপ গুরুজনের নিকটে আত্মদুঃখ নিবেদন করিলে, তাহা ক্ষয় হইবার উপায় লাভ হয়। নিজে গুরুজনের নিকটে গোপন করিলে তাহার দুঃখ গ্লানি না হইয়া ভীষণ ক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই জন্য মুক্তির প্রতিকূলে লজ্জা একটি ভীষণ দোষ হইতেছে। লজ্জাবলে জীব বহু দুঃখ সহ্য করিয়াও আত্মকল্যাণদর্শী হইতে পারে না বলিয়া, ইহাও একটী পাশ হইতেছে। সাহস বিহীন হইয়া আত্মমর্য্যাদা ক্ষয় করার নাম ভয়। জগতে সকল বস্তুতে ভীতিপূর্ণ থাকিলে তাহার কল্যাণ কখন হয় না। ভয়ে কুচিন্তাবলে মনের ও শরীরের স্ফুর্ত্তি ক্ষয় হয়, রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে, এই জন্য ইহা পাশ রূপে কথিত হইয়াছে। শোকে একেবারে চিত্তপ্রসাদ ক্ষয় হয়। মন্দ বিষয়ে রুচির নাম জুগুপ্সা হইতেছে। যেমন অম্লরোগে অম্ল

খাইতেই ইচ্ছা হয়, সেইরূপ যাহা অহিতকর সেই বিষয়ে ইচ্ছা বলবতী হইলে প্রবৃত্তি কলুষিত হইয়া থাকে। ইহাতে জীবের উদ্ধার হয় না। কুল, শীল, জাতি এই সকলের অভিমানে আবদ্ধ হইয়া জীবে উদার প্রকৃতি লাভ করিতে পারে না; দয়া ও দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণ ব্যবহার করিতে পারে না, এই জন্য এই সকল অভিমান হইতে ভয়ানক অকল্যাণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

ইহাতে অনেকের সংশয় হইতে পারে; তবে কি কুল, শীল জাতি মানিব না? এস্থলে কুল, শীল ও জাতির সম্মান হানির কথা বলা হয় নাই। কুলের ও জাতির গৌরব নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইতেছে। উহাদের অভিমানী হওয়াই দুঃখমূলক হইতেছে। যেমন পথে একটি চণ্ডালের ভীষণ পীড়া হইয়াছে, একটি শূদ্র শিশু জলে ডুবিতেছে; পথে গমনকারী কোন ব্রাহ্মণ এই ঘটনা দেখিয়া যদি নিজ জাতির অভিমানে অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া তাহাদের উদ্ধার না করে, তবে দয়া ও দাক্ষিণ্যের কার্য্য হইল না। দয়াদাক্ষিণ্যের কার্য্য হইল না বলিয়া সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইল না। সত্ত্বগুণের উদ্রেক না হওয়াতে কল্যাণের হানি হইল। আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র, আমার জাতি ও কুলগৌরব বলে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট উপায়ে সদাচারী ও নিজ ধর্ম্ম রক্ষা করিব, কিন্তু আচণ্ডালে দয়া দাক্ষিণ্য দেখাইতে বিরত হইব না। কিন্তু তাহাতে অভিমানই জীবভাবের দুঃখ উৎপাদনকারী হইতেছে।

এই যত কিছু চিত্তের দোষ ও অষ্টপাশের কথা বলা হইল, ইহারা সকলেই মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিবলে, বহির্বিষয় ব্যবহারে লাভ হইয়াছে, উহাদের বিচারযোগে ও অনুষ্ঠানযোগে নাশ করিতে পারিলেই চিত্তের শুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিতেছেনঃ—

"আবরণস্য নিবৃত্তির্ভবতি চ সম্যক্ পদার্থদর্শনতঃ।
মিথ্যাজ্ঞান বিনাশস্তদ্ বিক্ষেপ জনিত দুঃখ নিবৃত্তিঃ॥"

অস্যার্থঃ—ভোগ্য পদার্থগুলির বিশেষ বিচার দ্বারা আবরণ শক্তির হানি হইয়া থাকে। মিথ্যা ও সত্য বোধ হইবার জন্য চিত্ত শুদ্ধ হইলেই বিক্ষেপ জনিত দুঃখ নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

অতএব সকল দুঃখ নষ্ট করিবার জন্য অনুষ্ঠানই প্রধান উপাদান হইতেছে। আমাদের ভৌতিক দেহের শুদ্ধি চাই, আমাদের মনাদি সূক্ষ্ম দেহ শুদ্ধির আবশ্যক, ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইলেই আমরা বিশুদ্ধ ও অকম্পিত জলস্থ চন্দ্রবিম্ব দর্শনের ন্যায় আত্ম দর্শনের উপযোগী হইতে পারিব। চিত্তের কলুষ ক্ষয় না করিলে যখন আমরা ভগবদ্বস্তু দর্শনের বা অনুভবের অধিকারী হইতে পারিতেছি না। তখন চিত্তের, মনেব ও দেহের কলুষ নাশের জন্য অগ্রে চেষ্টা করা আবশ্যক হইতেছে। চিত্তের মালিন্যে, মনের জড়তায় যখন ব্যাধি, জরা দুঃখ, শোক, তাপেব উদয়, তখন উহাদের মালিন্য ক্ষয় করিতে যে সকল অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, তাহাই আমাদের মানব জন্মের প্রধান সংকল্প হইতেছে। অতএব অনুষ্ঠানই আমাদের নরক হইতে স্বর্গে লইয়া যায়। অনুষ্ঠানই আমাদের মুক্তি জ্যোতিঃ দেখাইয়া দেয়। অনুষ্ঠানই আমাদের ধর্ম্ম প্রকাশক পরম বন্ধু হইতেছে।

অথ দ্রব্যানুষ্ঠান তত্ত্ব

পূর্ব্বে অনুষ্ঠানতত্ত্ব বর্ণনা কালে বলা হইয়াছে যেঃ—আমাদের শরীরের স্থূল ও সূক্ষ্মাংশ শোধন করিবার জন্য প্রায়শ্চিত্তাদি যোগে পপাক্ষয় করিয়া, ভগবদ্ভাবময় হইতে তদ্ভাবগুলিকে স্থূলে ও সূক্ষ্মে ধারণা করিতে হয়। সেই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে ভগবৎ সংস্কার সংযুক্ত করিবাব কৌশলকেই অনুষ্ঠান কহে। দ্রব্য, ক্রিয়া, কাল এবং মন্ত্রভেদে

চারিটি উপায় সংযোগে সেই অনুষ্ঠান সাধন করিতে হয়। এ বিষয়ে শ্রীগীতাশাস্ত্র বলিতেছেনঃ—

"দ্রব্যযজ্ঞা স্তপো যজ্ঞা যোগযজ্ঞা স্তথাপরে।
স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥"

অস্যার্থঃ—(হে অর্জ্জুন! আমাকে লাভ করিবার জন্য) কতগুলি লোকে দ্রব্যাদির অনুষ্ঠানে যজ্ঞ করিয়া থাকে, তাহাদের দ্রব্যযজ্ঞকারী কহে। কতকগুলি লোকে চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি কঠিন ব্রতও নিয়ম সংযোগে যজ্ঞ করে তাহাদের তপস্বী কহে। কতকগুলি লোকে যোগশাস্ত্রোক্ত, ধ্যানধারণপ্রাণায়ামাদি যোগে সাধন করে, তাহাদের যোগযজ্ঞকারী কহে। কতকগুলি লোকে বেদাদি অভ্যাসরূপী কর্ম্ম করে, তাহাদের স্বাধ্যায়সম্পন্ন কহে। যাহারা অতিশয় যত্নশীল হইয়া আমাকে লাভ করিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রত নিয়মাদির অনুষ্ঠানে চিত্তকে একেবারে নির্ম্মল ও বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করিয়াছেন, তাহাদের জ্ঞানযজ্ঞকারী কহে।

শ্রীগীতা এই যে পঞ্চবিধ আনুষ্ঠানিক কর্ম্মের কথা বলিলেন, ইহারা সকলেই পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ অনুষ্ঠানের অন্তর্গত হইতেছে। স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদার্থজ্ঞানাভ্যাস ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ উপায় ইহারা উভয়েই মন্ত্রানুষ্ঠানের অন্তর্গত হইতেছে। গীতোক্ত বাক্যানুসারে এবং অন্যান্য শাস্ত্রে কথিত উপদেশানুসারে দ্রব্য সংযুক্ত যজ্ঞ অর্থাৎ অনুষ্ঠানই সর্ব্বাগ্রে ব্যবহারযোগ্য হইতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারেঃ—ভগবদ্ভাব লাভের জন্য দ্রব্যাদিতে কি উপকার হইয়া থাকে। তাহা বুঝাইতেই এই প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে। আমাদের চিত্তাদি হইতে স্থূল শরীর পর্য্যন্ত যখন গ্লানিপূর্ণ, তখন আমরা ঘোর তমোগুণে ও কিঞ্চিৎ রজো ও সত্ত্বগুণে আবৃত হইয়া আছি, একথা স্বীকার করিতে হইবে। শাস্ত্র স্বীকার করেন যেঃ—চিত্ত, মন, বুদ্ধি এবং স্থূল দেহ যখন তমোগুণবলে সাত্ত্বিকতা হারাইয়া দুঃখসংস্কারপূর্ণ হইয়াছে, তখন উহাদের বল এবং তীক্ষ্ণতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কারণ

যে বিষয় বা শক্তি আমাদের ব্যবহার না হয়, তাহার বলক্ষয় হইয়া থাকে। বলক্ষয় হইলে সূক্ষ্মতার হানি হইয়া থাকে। যেমন বহুকষ্টে কেহ অঙ্কবিদ্যা শিক্ষা করিল। সেই বিদ্যা শিক্ষা কালে তাহার বুদ্ধি সূক্ষ্ম এবং স্মৃতির বল ছিল। কিছুকাল অনভ্যাস বা আলোচনা হীন হইলে বুদ্ধির এবং স্মৃতির বল ক্ষয়ে সেই বিদ্যা আর তাহার স্মৃতিপথে সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পায় না। একবার বিদ্যা অভ্যাস হইল আবার তাহার বিস্মরণ ঘটিল। এই যে স্মরণ ও বিস্মরণ ইহাই বুদ্ধি স্মৃতির তীক্ষ্ণাতীক্ষ্ণ ভেদে ঘটিয়া থাকে। এইতো গেল অভ্যাস ও অনভ্যাস বলে সূক্ষ্মদেহের কার্য্য; স্থূল দেহের পক্ষেও ঠিক সেইরূপ ঘটিয়া থাকে।

যেমন একজন চিত্রকর হস্তে তুলিকা ধারণ করিয়া চিত্র করে, সে কিছুদিন তৎকার্য্য না করিলে, তাহার হস্ত পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। এইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্মের সমস্ত অবস্থাই অনভ্যাস অর্থাৎ তমোগুণবলে একেবারে শক্তিহীন হইয়া থাকে। এই পার্থিব কার্য্যের অভ্যাস ও অনভ্যাসবলে যখন এত অবস্থাভেদ দেখা যায়, যাহা জন্মান্তর হইতে অনভ্যস্ত এমন যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা সহজে কেমন করিয়া হৃদয়গত হইতে পারে? অভ্যাসবলে স্থূল ও সূক্ষ্মের বিশুদ্ধি ঘটাইবার জন্যই পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। যে বস্ত্র পরিধান করিলে চিত্তের প্রসাদ লাভ করি, যে স্থানে থাকিলে আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হয়, যেরূপ আহারীয় পানীয় পানাহার করিলে আমাদের বিশুদ্ধ ভৌতিক সংস্কার হয় সেই সকল আয়োজন আমাদের সতত করা কর্ত্তব্য হইতেছে। শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান, শুচিদেশে অবস্থান শুদ্ধ পানাহার গ্রহণ প্রভৃতির সাহায্যে আমাদের বাহ্যদেহ বিশুদ্ধ হয় বলিয়া; এই গুলির ব্যবহারকে দ্রব্যানুষ্ঠান কহে।

দার্শনিক পণ্ডিতগণে কহিয়াছেন যে ভাবে হৃদয় বা চিত্তকে স্থূল শরীরের সহিত পরিণত করিতে হয়, দ্রব্যাদি সেইরূপ ভাবের হওয়া চাই। এস্থলে ভগবদ্ভাবলাভের কথা হইতেছে, এজন্য বস্ত্র, স্থান ও আহারপানীয়াদি ভগবদ্ভাবময় হওয়া চাই। ভগবদ্ভাবময় ঐ সকল

দ্রব্যাদি ব্যবহারে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় অবস্থাই তদ্ভাবময় হইয়া থাকে। অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন বস্ত্র, আহারীয় এবং স্থানের মধ্যে ভগদ্ভাব ও অন্যভাব কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে যে, বাছিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। তদুত্তর এই যথাঃ—আমরা যদি ঘোর বিলাসী হই আমাদের বসন, বাসভবন, আহারীয়াদি সমস্তই বিলাস পূর্ণ ব্যবহার করিয়া থাকি। আমরা যদি ঘোর কামুক হই, তাহা হইলে বস্ত্রাদি তদ্ভাবোদ্দীপক যে উপায়ে করে,বাসভবন ও তাহার মধ্যস্থ চিত্রপঠাদি যাহাতে কামোদ্দীপন হয় আহারাদি যাহা কামোদ্দীপক, তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকি। আমরা যদি অতি ঘৃণিত মাদকতা প্রভৃতির প্রিয় হই আমাদের বসন, ভূষণ, ভবন, আহারাদি তদনুরূপ হইবেই হইবে। এই সকল প্রমাণে শাস্ত্র বলিতেছেন, অন্তরের বৃত্তি ভেদে বসন, ভুষণ, বাস, আহারীয়াদি গৃহীত হয়, এবং ঐ সকল বাহে যে ভাবময় থাকে অন্তরেও সেই ভাব গৃহীত হইয়া থাকে। যেমন ইংরাজী পোষাক পরিলে ইংরাজী চাল চলনে ইচ্ছা হয়।

যাত্রা নাচে সং বা নায়ক নায়িকা সাজিতে হইলে, তদুপযুক্ত বসনভুষণ ও স্থানাদি না হইলে অনুরূপ ভাব কখনই প্রকাশ হয় না। ইহাতে এককথায় বলা হইলঃ—বাহ্য বিষয়ের ভাবানুসারে অন্তরের গঠন হয় এবং অন্তরের বৃত্তি অনুসারেও বাহিরের বেশ ভুষাদির ব্যবহার হইয়া থাকে। অতএব বেশ, ভুষা, স্থান, আহারীয়াদিতে দোষ ও গুণ বর্ত্তমান এ কথা স্বীকার করিতে হইবেই হইবে। দ্রব্যানুষ্ঠান তত্ত্বে এই দেখান হইবে যে, দ্রব্যগুলি যাহাতে ভগবদ্ভাবময় করিয়া ব্যবহার করা যায় তাহাই করা উচিত হইতেছে।

ভগবদ্ভাবে যে সকল দ্রব্যের ব্যবহার হয় তাহাকে উপচার কহে। ভগবদ্ভজনার্থ আপনাকে যে সকল উপযুক্ত বসন ভূষণে সজ্জিত হইতে হয়, সে সমস্তই ভগবদ্ভাবময় হইতেছে। এ বিষয়ে শ্রীগীতাশাস্ত্র অর্জ্জুনকে ভগবান বলিতেছেনঃ—

'যৎ করোষি যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং।
শুভাশুভফলৈরেব মোক্ষসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ॥”

অন্বার্থঃ—হে অর্জ্জুন! তুমি যদি শুভাশুভ কর্ম্ম বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা না কর, তবে তুমি যে কিছু কার্য্য করিবে, তাহা আমাকে অর্পণ করিও। যাহা কিছু আহারাদি করিবে, আহাররূপে আমাকে প্রদান করিও; যাহা কিছু স্বর্গাদি লাভার্থ হোম, যজ্ঞ করিবে তাহার ফল আমাকে অর্পণ করিও; যাহা কিছু জগতে দান করিবে তাহা আমাকেই প্রদান করিও, যাহা কিছু তপস্যা করিবে, তাহা আমার জন্যই অনুষ্ঠান করিও।

এই গীতা বাক্যে দেখান হইল যেঃ—সংসারে যে সকল কার্য্য আত্ম-প্রীতির জন্য করা যায় অর্থাৎ গৃহ, বিত্ত, পরিবার প্রভৃতির সেবাদি, সে সমস্তই যদি অগ্রে ভগবদর্পিত করা হয়, তবে তাহাতে অন্য আসক্তি বা মোহের উদয় হয না। তাহাতে পাপেচ্ছা প্রবল হয় না। এই জন্য আর্য্যেরা গৃহারম্ভে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। ধনের চতুর্থাংশ দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অতিথীসেবায় ব্যয় করেন, দ্বিতীয় চতুর্থাংশ তীর্থ সেবার ব্যয় কবেন, তৃতীয় চ[illegible]ংশ রাজাকে দেবতা জ্ঞানে করস্বরূপ প্রদান কবেন। অবশিষ্ট চ[illegible]র্থাংশ অন্তর্যামী আত্মা;—মাতা, পিতা আত্মীয় স্বজনে আছেন বলিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে ব্যয় করিয়া থাকেন। আর্য্যগণ যাহা কিছু আহার করেন, শাস্ত্র বলিয়াছেন দেবতাকে নিবেদন ভিন্ন স্বাধু অন্ন বিষবৎ হইযা থাকে। যে বস্তু দেবতাকে দেওযা যায়, তাহা অশুদ্ধ হইতে পারেনা, সেই প্রসাদ ভক্ষণে শান্তি ভোগ হইবেই, তদতীতে আরো কিছু ফল আছে। ফল, ফুল, জল বা অন্নাদি যে ভাবে মণ্ডিত থাকে ব্যবহারী তাহাই লাভ করে। যেমন মদ্যাদি পানের পক্ষে স্বাদু হইবে বলিয়া কোন ফল প্রস্তুত কবা হইয়াছে এবং দেবতার প্রসাদে কোন ফল ব্যবহার হইয়াছে। দেবতার্থে নিবেদিত ফল ভক্তিসহকারে ব্য[illegible]ব করিতে গেলে তাহাতে শ্রদ্ধা ও ভ[illegible]া। মদ্যপান সাহায্যার্থে যে

ফল প্রস্তুত হইয়াছিল, হৃদয়ে ভক্তি থাকিলে তাহা ব্যবহার কালে অনুরাগ হয় না। যেমন কোন ফুল কোন বারনারীর হস্ত হইতে গ্রহণ করিলে বা বিলাসার্থ সজ্জিত থাকিলে, তাহা ব্যবহারে মনের যে ভাব হয়, ভগবচ্চরণার্পিত পুষ্প গ্রহণে সে ভাব ভক্তের পক্ষে আসিতে পারে না। এইরূপ প্রমাণে দেখান হইল, ভক্তির উন্নতি করিতে হইলে, বসন, ভূষণ, বাসভবন এবং আহারীয়াদিকে ভগবন্ময় বলিয়া বোধ করা চাই; এরূপ করিলে এবং তাহা ব্যবহারে নিশ্চয়ই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের প্রসন্নতা ঘটিয়া থাকে। শ্রদ্ধাবান্ না হইলে ভগবদর্পিত বিষয় হইতে কখনই তদ্ভাব লাভ হয় না। এই জন্য পুনরায় গীতা বলিতেছেনঃ—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

অর্থ—প্রযতাত্মা অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বিষয়ে শ্রদ্ধা গ্রহণের অভিলাষী ব্যক্তি, ভক্তির সহিত আমাকে যদি (ঐশ্বর্য্য দূরে থাকুক! কেবল, অনায়াসলভ্য) পত্র, পুষ্প, ফল এবং জলাঞ্জলি প্রদান করে; আমি সেই ভক্তি সংযুক্ত উপহারকে আদরের সহিত আহার করিয়া থাকি।

বিশেষ করিয়া এই গীতাবাক্যে দেখান হইল যে, শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে সংযত হৃদয় যে বস্তু গ্রহণ করিবে, তাহা ভগবদ্ভাবময় হইবেই। যাহার শ্রদ্ধা ভক্তির উপস্থিতি হয় নাই; সেই ব্যক্তির হৃদয়ে ভক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত সংস্কার বদ্ধমূল করিবার জন্য তাহার ব্যবহারোপযোগী বিষয়গুলিকে ও দ্রব্যগুলিকে ভগবদর্পিত করিয়া লওয়া চাই। বস্তুগুলির স্থূল ব্যবহারেও তাহার ভক্তি ও শ্রদ্ধার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ভগবদ্ভাবময় এই বিশ্বাসে ব্যবহার করিলে, পানাহার, বসন, ভূষণাদি সকল অবস্থাতেই ভগবদ্ভাব পুষ্ট হইয়া থাকে। অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন; সংস্কারবলে দ্রব্যাদি ব্যবহার করিলে মনের শোধন ঘটিতে পারে, ভৌতিক শোধন কেমন করিয়া ঘটে!! তদুত্তর এই যথাঃ—যে আহারীয় বা, পানীয়

যে বিশ্বাসে ব্যবহার করা যায়, তাহার ফল ও পুষ্টি তদনুরূপ হইয়া থাকে। যেমন ঔষধে রোগ নাশ করে, কিন্তু সেই ঔষধ যদি অবিশ্বাস যোগে ব্যবহার করা যায়, তাহাতে ব্যাধি শান্তি হয় না। সদ্গুণজাত বস্তুতে সাত্বিক-পুষ্টি হয় এবং তাহাতে যদি ভক্তিমাখা থাকে আরো উপকারী হইয়া থাকে। এমন কি ভক্তের জীবনীতে দেখা যায় যেঃ—বিষও ঈশ্বরার্পণে অমৃত হইয়া গিয়াছে!! অনেকে একথার মূল স্বীকার করিতে না পারেন, কারণ অন্তজগতের রহস্য কথা বুঝান বড় সহজ নহে। তবে আর্য্যরীতি এমন কোনটিই নাই, যাহা দর্শনতত্ত্বযোগে কিছু না কিছু বুঝিতে পারা যায়! আমরা কত শত ভক্ত দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান ইতিহাসে দেখিতে পাই! যাঁহাদের চিত্ত অন্তরে বা ঈশ্বরে একান্ত-সংলগ্ন, তাহাদের গরল, অগ্নি, জল প্রভৃতি দেহ ক্ষয় করিতে পারে না। গত ৫০। বৎসর পূর্ব্বে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হরিদাস গোস্বামী, লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরকে, ফলাহার বর্জ্জিত হইয়া তিন মাস পর্য্যন্ত ভূগর্ভে নিহিত থাকিয়া, নিজ ঐশীক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার কিছু পরেই কোন ইংরাজ্নৃপতি মহাশয়ের সাহায্যে সুন্দরবন হইতে এক ব্রহ্মসমাহিত যোগীকে কলিকাতার দক্ষিণ ভূকৈলাশ রাজবাটিতে আনা হইয়াছিল। সেই যোগীকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল, জলে ডুবাইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহার দেহের ক্ষয় হয় নাই। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং সমুদ্রমগ্ন হইয়া তিন দিবস ছিলেন। মহাবৈষ্ণব যবন হরিদাস, ভীষণ বেত্রাঘাতেও বাহ্যবেদনা বোধ করেন নাই। আধুনিক মহাত্মাগণের চরিত্র দেখান হইল, প্রাচীনের বহু কথা আছে। তাহা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। চিত্তের বাহ্য নিরোধ ঘটিলে বাহ্য দেহকে অগ্নিতে, জলে, আঘাতে ও বিষাদিতে কিছু করিতে পারে না। অতএব দ্রব্য সমস্ত ভগবদর্পণ করিয়া তৎপ্রতি ভক্তি স্থির করিতে পারিলে;—পরে সেই দ্রব্য ব্যবহার করিলে উত্তম বস্তু হইতে যে উত্তম ফল লাভ হইবে, ইহার আর

আশ্চর্য্য কি!! গরলও অমৃতে পরিণত হইযা থাকে। এক্ষণে দ্রব্যানুষ্ঠান তত্ত্বে দ্রব্যসহযোগে ভগবদ্ভক্তি উপস্থিত করিলে অমৃত্যু ও বিশুদ্ধ পদবী লাভ নিশ্চয়ই হয়, ইহা প্রমাণ করা হইল। মন শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইলে এবং তদ্ভাবে দ্রব্যাদি দেবতাকে অর্পণ করিয়া পশ্চাতে ব্যবহার করিলে শরীর হইতে মন পর্য্যন্ত এবং চিত্ত ও বুদ্ধির বিশুদ্ধি ঘটে ইহা যখন প্রমাণিত হইল, তখন দ্রব্যানুষ্ঠানযোগে ভগবদ্ভাব হৃদ্গত হয় ইহা স্থির হইল।

কেমন করিযা এবং কোন উপায়ে সেই দ্রব্যগুলিকে ঈশ্বর ভাবীয় করিতে হয় তদ্বিষয়ে শাস্ত্রে যে রূপ উপদেশ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই বর্ণিত হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে; যে সকল দ্রব্যাদি ঈশ্বরার্থ প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে উপচার কহে। উপ+চৃ+অ= উপচার। ঈশ্বরের সমীপস্থ হইবার জন্য যে সকল উপায় ও চিহ্নাদি ব্যবহার করিতে হয় তাহাকে উপচার কহে। কারণ উপ অর্থে সমীপস্থ হওয়া এবং চৃ ধাতুর অর্থ ব্যবহার করা।

সাধকের ক্ষমতা ও অধিকারানুসারে কখন ঈশ্বরকে অষ্টাদশ উপচারে পূজা করিতে হয়, কখন ষোড়শোপচারে, কখন দশোপচারে, কখন পঞ্চোপচারে পূজা করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন মহানুষ্ঠানিকগণ চতুঃষষ্টি উপচারেও পূজা করিয়া থাকেন। তাহা আমাদের দেশে কচিৎ প্রচলিত বিধায়ে আলোচনা অনাবশ্যক হইতেছে। অষ্টাদশ উপচার বিষয়ে শাস্ত্র বলিতেছেনঃ—

"আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং।
স্নানং বস্ত্রোপবীতঞ্চ ভূষণানি চ সর্ব্বশঃ॥
গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপমন্নঞ্চ দর্পনং।
মাল্যানুলেপনঞ্চৈব নমস্কারবিসর্জ্জনে॥
অষ্টাদশোপচারৈস্তু মন্ত্রীপূজাং সমাচরেৎ॥"

অর্থঃ—আসন, স্বাগতপ্রশ্ন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বস্ত্র, উপবীত, সকল প্রকার ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, অন্ন, দর্পণ, মাল্য,

অনুলেপন, (নমস্কার ও বিসর্জ্জন।) এই অষ্টাদশ উপচার যোগে সাধক নিজ দেবতার পূজা করিবেন। ষোড়শোপচার বিষয়ে শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"পাদ্যমর্ঘ্যং তথাচামং স্নানং বসনভূষণে।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্যাচমনস্ততঃ॥
তাম্বুলমর্চ্চনাস্তোত্রং দর্পনঞ্চ নমস্ক্রিয়া।
প্রযোজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শঃ।

অর্থঃ—পাদ্য, অর্ঘ, চামর, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, আচমন, তাম্বুল, পূজার প্রার্থনা, দর্পণ ও নমস্কার এই ষোড়শ উপচার পূজক ব্যক্তি পূজায় ব্যবহার করিবেন।' দশোপচার সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেনঃ—

"পাদ্যমর্ঘ্যং তথচামং মধুপর্কাচমনন্তথা।
গন্ধাদযো নৈবেদ্যান্তা উপচারা দশক্রমাৎ॥"

অর্থ—পাদ্য, অর্ঘ্য, চামর, মধুপর্ক, আচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্রভৃতিই দশোপচার নামে পূজায় প্রযোগ হইয়া থাকে। পরে পঞ্চোপচার বিষয়ে শাস্ত্র বলিতেছেনঃ--

"গন্ধং পুষ্পং তথা দীপং ধূপং নৈবেদ্যমেব চ।
অখণ্ডং ফলমাসাদ্য কৈবল্যং লভতে ধ্রুবং॥"

অর্থঃ—গন্ধ, পুষ্প, দীপ, ধূপ ও নৈবেদ্য এই পাঁচটিই পঞ্চোপচার নামে কথিত হয়। যে সাধক ইহা ব্যবহার করিতে পারে তাহার অখণ্ড ফল অর্থাৎ মুক্তি নিশ্চয়ই লাভ হইয়া থাকে।

এই যে সকল উপচারাদি সহযোগে দেবতার পূজার কথা বলা হইল, ইহাতে বিশেষ করিয়া বলা হইল, যে সকল উত্তম ভোগ্য বস্তু এবং চিহ্নাদি সহযোগে আমরা বিষয়ভোগ করিয়া থাকি; সেই সমস্ত দ্রব্য ও শারীরিক অঙ্গগুলি যদি দেবতায় প্রযোগ করি এবং পরে তাহাই ব্যবহার করি; তাহা হইলে আমাদের বাহ্য ও অন্তর দেবভাবময় হইয়া থাকে। এই গন্ধাদি উপচার সমস্ত চতুঃষষ্টি

হইতে পঞ্চসংখ্যা পর্য্যন্ত পূজার্থে ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে। উহাদের বিস্তার ব্যবহার করিতে করিতে মন যত ঈশ্বরপর ও তত্ত্বপর হইবে, ততই বাহ্যানুষ্ঠান হ্রাস করিয়া অন্তরের জ্ঞান ও প্রেমানুষ্ঠানের আধিক্য করিতে গুরু উপদেশ দিয়াছেন। এই জন্য চতুঃষষ্টি হইতে অষ্টাদশ শ্রেষ্ঠ, অষ্টাদশ হইতে ষোড়শ, ষোড়শ হইতে দশ, দশ হইতে পঞ্চ উপচার অবলম্বন শ্রেষ্ঠ হইতেছে। আমার যত বিষয়ী থাকিব, ততই আমাদের প্রচুর ভোগ্য বস্তুতে আসক্তি থাকিবে, সেই প্রচুর বস্তু সমস্তই ঈশ্বরে নিবেদন করিতে উপচারের আধিক্য হইয়া থাকে। যত শ্রদ্ধার আধিক্য ততই উপচার হ্রাস হইয়া থাকে। আমি ধনী, মহাভোগী গৃহী, আমার দেবতা পূজা পঞ্চোপচারে হইতে পারে না। আমি অতি শ্রদ্ধাবান এবং ধনাদিতে অনাসক্ত, আমার পূজা পঞ্চোপচারে হইতে পারে। কারণ ভোগের তারতম্যানুসারে উপচারের আধিক্য হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যথা—আমি রাজা, আমি সম্রাটের ন্যায় শোভা ও সম্মাননা যাহাকে দেখি, তাহাকে আমার অনুরাগের সঞ্চার হয়, মন তাহার উপরে আকৃষ্ট হয়, আর যদি দীনাবস্থায় একটি দরিদ্র ব্যক্তি দেখি, কখনই আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা হয় না। মনের গঠন করিতে এই নিয়মে আমাদের ভাবানুসারে ঈশ্বরকে সাধন করিয়া, পূজা করিলে শ্রদ্ধার বিকাশ হয়। উপচারাদির প্রয়োজন দেখান হইল, এত উপচারাদি ব্যবহার কালে আমাদের দুইটি ক্রিয়া হয়। একটি ক্রিয়ায় মন পবিত্র হয় আর একটি ক্রিয়ায় সংস্কার পবিত্র হইয়া থাকে। এই মন ও সংস্কার পবিত্রতা কেমন করিয়া হয় তাহা বলা হইতেছে। অষ্টাদশাদি উপচার সমস্ত সাধকের ঐশ্বর্য্য অনুসারে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু দ্রব্যোপচারের মধ্যে পঞ্চোপচারই, সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসিত এবং জ্ঞানের বিধায়ক হইতেছে। এক্ষণে সংক্ষেপতঃ পঞ্চতত্ত্বের স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয় বলা হউক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই পাঁচটিকেই পঞ্চোপচার কহে। এই যে গন্ধ ও পুষ্পাদি

ব্যবহার করা হয়, ইহাদের সাহায্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের শোধন ঘটিয়া থাকে। গন্ধাদি দ্বারা ও মৃদুতা অনুসারে জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। অনেকের হয়তো ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে। তদ্বিষয়ে বলা হইতেছে ঃ—আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় কয়টির ব্যবহারানুসারে মন, বুদ্ধি, ও চিত্তের প্রসন্নতা ও অপ্রসন্নতা ঘটিয়া থাকে। তীব্রগন্ধ ঘ্রাণ মাত্রেই চিত্ত সঙ্কোচ হইয়া থাকে, আমরা অজ্ঞানী ও অচেতন হইয়া পড়ি। চক্ষে ভয়ানক ও ভীষণ রূপ দেখিবামাত্র আমরা অচেতন হইয়া পড়ি। অতিমাত্র তীব্র আলোকে চক্ষু দৃষ্টিশূন্য এবং বুদ্ধি ক্রিয়াহীন হয়, যেমন সূর্য্য ও বিদ্যুৎ দর্শন মাত্র ঘটিয়া থাকে। অতি উষ্ণ বা শীতলানুভবে স্পর্শশক্তি উৎপীড়ন হইলেও আমরা অচেতন হই। বরফে বা অগ্নিতে পতন ঘটিলে এইরূপ হয়। অতি তীব্র আস্বাদনে অর্থাৎ অতি কটু প্রভৃতিতে আমরা অচেতন হইয়া থাকি। এই সকল প্রমাণ দ্বারা শাস্ত্র বলিতেছেন জ্ঞানেন্দ্রিয় কয়টি যে সকল দ্রব্য ও মন্ত্রাদির আশ্রয়ে প্রসন্ন থাকে এবং তৎসাহায্যে মনোবুদ্ধ্যাদির প্রসন্নতা ঘটে, তাহাই যথাসাধ্য ব্যবহার করা উচিত হইতেছে। সেই সকল ব্যবহার্য্য গন্ধ দ্রব্যমন্ত্রাদি দেবতাদি ভাবময় হইলে তাহাকেই উপচার কহে। অতএব উপচার গুলি ব্যবহার করিলে,মৃদু গুণ দ্বারা ও দৈবীভাব দ্বারা আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্মের পবিত্রতা ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে দেখা যাউক, এই ভাব আনিবার জন্য, শাস্ত্র কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কুলার্ণবতন্ত্র গন্ধের বিষয়ে বলিতেছেন ঃ—

"গম্ভীরাপারদৌর্ভাগ্যক্লেশনাশন কারণাৎ।
ধর্ম্মজ্ঞানপ্রদানাচ্চ গন্ধ ইত্যভিধীয়তে ॥"

অর্থ ঃ—গম্ভীর ও অপার সংসার জনিত দুর্ভাগ্য ক্লেশ নাশ করিতে, ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করিতে যে সকল দ্রব্য গন্ধাদিরূপে বর্ত্তমান, তাহাদেরই গন্ধ কহে। এই অর্থে জ্ঞানের বিকাশ বলা হইল। চন্দন, অগুরু, কর্পূর, মৃগনাভি, ধূনা প্রভৃতির গন্ধযোগেই সেই প্রসন্নতার আবির্ভাব হইয়া থাকে। এমন কি বৈদ্যশাস্ত্রে বিশেষ করিয়া বলা

আছে যে গন্ধাদির তীব্রমৃদুতা অনুসারে মনোগ্লানি ও ভূতগ্লানি অর্থাৎ রোগশোক ইত্যাদি ক্ষয় হইয়া থাকে। একা স্থূল গন্ধে এত গুণ তাহার উপরে তাহাকে দেবভাবে পরিণত করিলে, অবশ্যই তাহা সদ্‌গুণ উদয় করাইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? এই জন্য দ্রব্যানুষ্ঠানযোগে চিত্তশুদ্ধি করিতে গন্ধ একটি প্রধান উপাদান হইতেছে।

পুষ্পকে দ্বিতীয় উপচার কহে। কুলার্ণবতন্ত্র পুষ্প শব্দের অর্থ এইরূপ করেন:—

"পুণ্যসংবর্দ্ধনাচ্চাপি পাপৌঘ পরিহারত।
পুণ্যফলার্থ প্রদানাচ্চ পুষ্পমিত্যভিধীয়তে॥"

অর্থ:— যাহা ব্যবহার করিলে পাপরাশি ক্ষীণ হইয়া, স্তবে গুণে পবিত্রতায় বৃদ্ধি হয়। যাহা ব্যবহার করিলে বুদ্ধি প্রভৃতি বিকশিত হইয়া পুণ্যফল ও তদুপযুক্ত উপায় সমূহ বিধান করে, তাহাকে শাস্ত্র পুষ্প কহিয়াছেন। যেসকল পুষ্পের গন্ধে ও শোভায় স্থূল শরীরের ও সূক্ষ্মদেহের বিশুদ্ধি ঘটে, তাহাই দেবপূজায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইজন্য বহুপুষ্পকে অশুদ্ধ বলিয়া শাস্ত্র ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এমন কি ব্যবহারোপযোগী পুষ্পও যদি গুণহীন হয়, তাহাও ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে সারদাতন্ত্র বলিতেছেন:—

"মলিনংভূমিসংস্পৃষ্টং ক্রমীকেশাদি দূষিতং।
অঙ্গস্পৃষ্টং সমাঘ্রাতং ত্যজেৎপুর্য্যুষিতং গুরুঃ॥

অর্থ:—গুরু অর্থাৎ পূজা বিষয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি, কখনই মলিন পুষ্প পূজার্থে ব্যবহার করিবেন না। ভূমিতে পতিত, ক্রমিকেশাদিতে দূষিত, একবার কাহারো অঙ্গে ব্যবহৃত, সমাঘ্রাত এবং অধিক দিবসের বৃন্তচ্যুত পুষ্প কথনই পূজার্থে ব্যবহার হইবে না। কেবল পূর্ব্বোক্ত দোষে পুষ্পের পবিত্রতা গুণ ক্ষয় হইল বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হয় নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, পুষ্পাদি অতি কোমল বস্তু, অন্য কর্ত্তৃক ব্যবহৃত বা অশুচিস্থানে পতিত এবং ক্রমি প্রভৃতির দ্বারা দূষিত

হইলে তাহাতে বিষদোষ ঘটিয়া থাকে। ব্যবহারকারী তদ্দ্রব্যগণের সেই সকল গুণ লাভ করে এই জন্য ব্যবহারে একান্ত নিষেধ হইয়াছে. তুলসী, বিল্বপত্র, দূর্ব্বাপ্রভৃতি এই পুষ্প সম্প্রদায়ের সমান গুণকারী এবং ইহাদেরও পবিত্র বলিয়া শাস্ত্র পরিগণিত করেন। পরে কুলার্ণবতন্ত্র ধূপ শব্দের মহিমা প্রকাশ করিতেছেন ঃ—

"ধৃতাশেষমহাদোষপূতিগন্ধপ্রভাবতঃ।
পরমানন্দজননাদ্ধূপ ইত্যভিধীয়তে॥"

অর্থঃ—যে সকল মহাপাতক সহজে ক্ষয় হয় না, পবিত্র গন্ধ যোগে সেই সকল পাপসংস্কারকে বিধৃত করিয়া পরমানন্দ উদ্দীপন করে বলিয়া ইহার নাম ধূপ হইয়াছে। এই ধূপাদির ব্যবহারও পূর্ব্বোক্ত পবিত্রতার জন্য হইয়া থাকে বলা হইল। পরে কুলার্ণব তন্ত্র দীপ পদার্থের মহিমা বুঝাইতেছেন, যথাঃ-

"মোহান্ধকার পশমনাৎ ক্ষয়জন্ম নিবারণাৎ।
দিব্যরূপ প্রদানাচ্চ, পরতত্ত্ব প্রকাশনাৎ।
মোক্ষ দীপ ইতিখ্যাতো মোক্ষমার্গৈক দর্শনঃ॥

অর্থঃ—মোহরূপী অন্ধকার প্রশমিত করিবার জন্য. ক্ষয় এবং জন্ম নিবারণ করিবার জন্য, দিব্যরূপ প্রদান করিবার জন্য, পরতত্ত্ব জ্ঞান প্রকাশ করে বলিয়া, মোক্ষমার্গের একমাত্র প্রকাশক বলিয়া, ভবান্ধকার মোচনকারী দীপ নামে ইহার খ্যাতি হইয়াছে। দীপের যে এতগুলি গুণ বলা হইল, ইহার বিশেষ কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি। আলোকের তীব্র ও মৃদুতা অনুসারে বুদ্ধি প্রবৃত্তির বিকাশ হইয়া থাকে। বুদ্ধি ও জ্ঞানের উন্মেষ যদি হয়, তবে মোহরূপ অন্ধকার ক্ষয় অবশ্যই হইবে। মোহে আবৃত থাকাতেই আমরা দুঃখ ভোগ করিয়া আয়ুক্ষয় ও জন্ম মৃত্যু গ্রহণ করিয়া থাকি। দীপ সাহায্যে মোহ ক্ষয় করিতে পারিলে উহাদেরও বিনাশ হইতেছে। মানস পূজায় দীপাদির চিন্তাতে এই ফল ঘটে। ঘৃত ও মোমের দীপে বাহ্য পদার্থ হইতে সদ্‌গুণ লাভ হয়। দীপ চিন্তায় অন্তর্জ্যোতি লাভও হইয়া থাকে। এই জন্য ঘৃতাদির

দীপই পূজায় প্রশস্ত হইয়াছে। পরে কুলার্ণব তন্ত্র নৈবেদ্যের মহিমা বলিতেছেনঃ—

"চতুর্ব্বিধং কুলেশানি দ্রব্যং তে ষড়্‌রসান্বিতং।
নিবেদনাত্তবেত্তৃপ্তি নৈবেদ্যং তদুদাহৃতং॥"

অর্থঃ—হে ভগবতি, হে কুলেশানি! ছয় রস সমন্বিত চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য নিবেদন করিলে, তাহাতে তৃপ্তি হয় বলিয়া, লোকে তাহাকে নৈবেদ্য কহে।" এই পঞ্চ উপচারের সহযোগে স্থূল ও সূক্ষ্মের পবিত্রতা করিতে উপচারের সূক্ষ্ম তন্মাত্রাগুলিকে শাস্ত্র চিন্তা করিতে বলিয়াছেন, সেই অবস্থাকে মানসোপচার কহে। নীল-তন্ত্র ও কঙ্কালমালিনীতন্ত্র এবং অন্নদাকল্প প্রভৃতি সমস্ত তন্ত্রই মানসো-পচার পূজার এইরূপ বিধান করিয়াছেনঃ—

"মানসৈরুপচারৈশ্চ সংপূজ্য কল্পয়েন্মুদা।
গন্ধং ভূম্যাত্মকং দদ্যাদ্ভাবপুষ্পং ততঃপরং॥
ধূপং বায্বাত্মকং দেয়ং তেজসা দীপমেব চ।
নৈবেদ্যমমৃতং দদ্যাৎ পানীয়ং বরুণাত্মকং॥
অম্বরং মুকুরং দদ্যচ্চামরং ছত্রমেবচ।
তত্তন্মুদ্রা বিধানেন সংপূজ্যাত্ম গুরুং জপেৎ॥"

অর্থঃ—দ্রব্য পূজার পরে মানস পূজা মানস উপচারে করিতে হয়, তাহাতে গন্ধকে ভূমিতত্ত্ব বলিয়া প্রদান করিবে। পুষ্পগুলিকে অন্তরের পবিত্র ভাবসমূহ বলিয়া প্রদান করিবে। ধূপকে বায়ুতত্ত্ব বলিয়া প্রদান করিবে। দীপকে তেজস্তত্ত্ব ভাবিয়া প্রদান করিবে। নৈবেদ্যকে অমৃতরস ভাবিয়া দান করিবে। পানীয়কে জলতত্ত্ব বলিয়া দান করিবে। মুকুর, চামর ও ছত্র ইহাদের আকাশতত্ত্ব ভাবিয়া দান করিবে। এই সকল পূজাতে যে সকল মুদ্রা ধারণ করিতে হয়, সেই সকল চিহ্নময় হইয়া পূজা পূর্ব্বক পরে আত্মগুরুকে জপ করিবে।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদ্রব্যানুষ্ঠানের মধ্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম ব্যবহারভেদে উভয়

অবস্থার বিশুদ্ধি ঘটে ইহা সকল সাধনশাস্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সকল গন্ধাদির মধ্যে যেগুলি দেবতাকে প্রযোগ করিতে শাস্ত্র আদেশ করিয়াছেন, তাহাই আমাদের হিতকর এবং কল্যাণদায়ী হইতেছে। এই পঞ্চ উপচার ব্যতীত অন্যান্য উপচার সমস্তই এইরূপে আমাদের হিতকারী হইতেছে। ঐ সকল উপচারের মধ্যে অঙ্গ সঞ্চালনাদি যোগে যে উপচার পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নমস্কারই প্রধান হইতেছে। বর্ত্তমান ধর্ম্ম বিপ্লবে নমস্কার প্রথাটি একেবারে লোপ পাইবার উপযুক্ত হইয়াছে। এই জন্য নমস্কার বিধানে আমাদের কি উপকার সাধিত হয়, তাহা প্রকাশ করা উচিত হইতেছে। গন্ধর্ব্বতন্ত্র নমস্কারতত্ত্ব এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন:—

"কায়িকো বাগ্ভবশ্চৈব মানসস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
নমস্কারাশ্চ বিজ্ঞেয়া উত্তমাধমমধ্যমাঃ॥
জানুভ্যামবনীং নত্বা সংস্পৃশ্য শিরসা ক্ষিতিং।
ক্রিয়তে যো নমস্কারং প্রোচ্যতে কায়িকাস্তম॥
যাস্বয়ং গদ্যপদ্যাভ্যাং ঘটিতাভ্যাং নমস্কৃতি।
ক্রিয়তে ভক্তিযুক্তেন বাচিকস্তুত্তমঃ স্মৃতঃ॥
ইষ্টমধ্যানিষ্টগতৈর্মনোভি স্ত্রিবিধং ভবেৎ।
নমনং মানসং প্রোক্তমুত্তমাধম মধ্যমং॥"

অর্থাৎ—কায়িক, বাচিক ও মানস এই ত্রিবিধ উপায়ে নমস্কার সাধিত হইয়া থাকে, প্রতি কায়িকাদি অবস্থায় বস্তুভেদে নমস্কারের উত্তমাধম ও মধ্যম ফল হয়। ভূমিতে জানু রাখিয়া মস্তকে ভূমি স্পর্শ করিয়া যে নমস্কার করা হয়, ইহাকে কায়িক নমস্কার কহে। অতি ভক্তিপূর্ণ অঙ্গ সংস্থানের সহিত (অর্থাৎ করাদি চরণাদি সংযুক্ত করিয়া শরীর সংকুচিত করিয়া) গদ্যপদ্যাদিবাক্যে স্তব করিলে তাহাকে বাচিক উত্তম নমস্কার কহে। নমস্কার করিবার কালে ইষ্ট ভাবিয়া, অনিষ্টকর ভাবিয়া এবং সামান্য ফল লাভ হইবে এইরূপ মনে করিয়া, চিন্তা প্রণাম করিলে তাহাকে মানস নমস্কার কহে। নমস্কারকালে

যাহাকে নমস্কার করিতেছি তাহার উপর আমার মনের যেমন প্রীতি, তদনুরূপ ভক্তি ও অভক্তি উপস্থিত হওয়াতে মনের উত্তমাধম ও মধ্যম নমস্কার ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ দেবতা, পিতা, গুরু, উপকারী প্রভৃতিকে নমস্কারে ইষ্ট ফল জন্য প্রীতি হয়। ভীষণ ও পরাক্রান্ত শত্রুর নিকটে অভয় প্রার্থনার জন্য যে নমস্কার তাহা ভীতি জন্য অতএব অধম নমস্কার। এমনি সামান্য বা গুরুজন বা আত্মীয় প্রভৃতি যাঁহাদের দ্বারা ফল বা বিপদ কিছুরই আশা নাই, তাহাকে মধ্যম নমস্কার কহে। এই যে নমস্কারের রীতি দেখান হইল, ইহাতে অঙ্গ সঞ্চালনে মনের ভক্তিপ্রীতির আধিক্য হয়, ইহাই বুঝান হইল। অঙ্গুলি হইতে দেবতা সকলের কাছেই, ভক্তি বা ভয় যে কোন উপায়ে নমস্কাররূপা অঙ্গ সংস্থান মাত্রেই তাহাদের হৃদয়কে করুণাপূর্ণ করা যায়। অতএব নমস্কারে সকল অবস্থার মানবকে সন্তুষ্ট করা যায় এবং হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। এইরূপ অঙ্গ সঞ্চালন দর্শনে যখন অন্যের প্রীতি আকর্ষণ করা যায়, তখন নমস্কার অনুষ্ঠানে অন্তরের বিশেষ ভাব বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। এই নম স্কটিকে বিশেষ ব্যবহার করিবার জন্য অষ্টাঙ্গ, পঞ্চাঙ্গ, একদণ্ড এই তিন কৌশলেও ব্যবহার করিতে শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন। এ বিষয়ে ...নকতন্ত্র বলিতেছেনঃ—

"ত্যক্ত্বাস্বমযনং স্থানং পশ্চাদ্দত্বা নমস্কৃতঃ।
নিপত্য দণ্ডবদ্ভূমৌ দণ্ডইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
হস্তাভ্যাং চরণাভ্যাঞ্চ জানুভ্যাং বক্ষসা তথা।
মূর্দ্ধ্না, দৃষ্ট্যা, তথা বাচা চিত্তে চাষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ॥
হস্ত জানু শিরো বাক্য ধীভিঃ পঞ্চাঙ্গ ঈরিতঃ॥"

অর্থঃ—আপনার থাকিবার স্থান হইতে কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় ভূমে লম্বমান হইয়া পতিত হইলে, পরে মস্তকাদি স্পর্শে নমস্কার করিলে দণ্ডবৎ নমস্কার কহে। উভয় হস্ত, উভয় পদ, উভয় জানু, বক্ষঃ, মস্তক, বাক্য ও চক্ষু, বুদ্ধি প্রভৃতির সংযোগে যে নমস্কার বিধান করা যায়

তাহাকে অষ্টাঙ্গ নমস্কার কহে। কেবল হস্ত, জানু, মস্তক, বাক্য ও বুদ্ধি প্রভৃতির সংযোগে যে নমস্কার বিধান হয়, তাহাকে পঞ্চাঙ্গ নমস্কার কহে।

নমস্কারার্থ যে সকল অঙ্গ সংস্থানের, বাক্য ও বুদ্ধি প্রভৃতি সংযোগের কথা মহা মহাতন্ত্র বর্ণনা করিলেন, এই সকল অবস্থা অবধারণ করিলে আমাদের হৃদয়ে অতিমাত্র দুঃখের চিহ্ন উদয় হইয়া থাকে, সেই দুঃখবেদনা এবং দুঃখভাব প্রকাশ করিলে, যাহার নিকটে প্রকাশ করিতেছি তাহার করুণা হইবে এবং অন্তরে অতি দুঃখ অনুভূত হওয়ায় দুঃখের প্রতি ঘৃণা উপস্থিত হইবে। আমরা দেবতা, গুরু, পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজন এবং হিতকারী, প্রীতিকারী সকলের কাছেই যদি নির্ভদুঃখ জ্ঞাপনার্থ নমস্কারসূচক অবস্থা জ্ঞাপন করি, তাহাতে আমাদের পরস্পর সৌহার্দ্দ এবং নিজ হিত সাধন হয়। আত্মারূপে হরি অন্তরে আছেন, দুঃখানুভূতি সহযোগে তাঁহার মূর্ত্তিকে অন্তরস্থিত [illegible] বে যদি আমরা দুঃখ জ্ঞাপন [illegible] দেখাই, তাহাতে [illegible] আমরা অবশ্য লাভ করিব। নমস্কার চিহ্নে যদি [illegible] দয়া আসিতে পারে? যিনি সর্ব্বজগতে দয়াশী[illegible] ছেন, তাহার দয়া হইবে না, এ কথা কোন [illegible] বে। ইহাতে বিশেষ করিয়া বুঝান হইল যে, নমস্কারে [illegible] আকর্ষণ ঘটিয়া থাকে। দয়া যদি লাভ করিলাম তবে সমস্ত অসদ্‌গুণ দূর হইয়া বিশুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইল। এইরূপে সংক্ষেপে নমস্কার তত্ত্বের কথা বলা হইল। আর আর উপায়গুলি এইরূপে আমাদের অন্তর ও বাহিরের হিতকারী হইতেছে বুঝিতে হইবে।

দ্রব্যানুষ্ঠানের মধ্যে উপচার সমূহ ব্যতিত আরো কয়েকটি বস্তু আমাদের প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে বলিদান ও পঞ্চতত্ত্ব দান এই দুইটিই প্রধান হইতেছে। এতদ্ব্যতিত যাহা ব্যবহার হয়, তাহাদের পরিচয়ের আবশ্যক তত নাই, কারণ পূজাপদ্ধতিতে সে সমস্তের ব্যবহার স্পষ্ট

করিয়া লেখা আছে। এক্ষণে বলি কাহাকে বলে তদ্বিষয় বলা হইতেছে। যে সকল বিষয়ে আমরা একান্ত আসক্ত, যাহা সহজে দেওয়া যায় না, যাহা হইতে মোহ এবং স্নেহমমতাদির উদয় হয়, সেই সমস্ত অবস্থা ঈশ্বরে প্রদান করিলে, তাহাকে বলি বা উপহার কহে। আমাদের অন্তরের আসক্তি সত্বরজঃ ও তমোগুণভেদে ঘটিয়া থাকে। উপচারাদি সহযোগে যাহা ঈশ্বরে প্রদত্ত হইল তাহা আমাদের বিশুদ্ধির বিষয় মাত্র। যখন আমরা বিশুদ্ধ হইয়া দুঃখগুলিকে বুঝিব, তখন আমাদের আসক্তির উৎপাদক সমস্ত বস্তু ঈশ্বরে অপর্ণের উপযুক্ত হইবে। আমাদের সত্বাদি গুণভেদে ত্রিবিধ স্বভাব আছে। কাহারো সাত্ত্বিকী স্বভাব, হিংসাদি কার্য্যে আসক্তি নাই, পুণ্যাদি কার্য্য এবং সাধু ব্যবহার করিয়া সংসারের স্নেহমমতাদি ভোগ করা হয়। এই যে পুণ্য ও স্নেহমমতা সূচক বসন, ভুষণ, আহার, গৃহ-বিত্তাদি এ সমস্তই পুনর্দ্দুঃখোৎপাদক, এই জন্য ইহা ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া আত্মজ্ঞানী হইতে হয়। এই সকল ঈশ্বরে অর্পণকে সাত্ত্বিকী বলি কহে। বিহিত মদ্য, বিহিত মৎস্য, বিহিত মাংস ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া বিষয়ে ঘোর আসক্ত থাকাকে রাজস্ স্বভাব কহে। এই অবস্থায় মোহ ও অহঙ্কার, আহারীয় বস্তু এবং পুত্রবিত্তাদিতে নিবিষ্ট থাকে ; এই জন্য ঐ বিহিত আসক্তির বস্তুগুলিকে ঈশ্বরে প্রদান করার নাম রাজস্ বলি। যত কিছু অত্যাচার এবং নিষিদ্ধ ব্যবহার ও পশু প্রভৃতির হত্যা সংশাধিত হয়, ইহাদের তমোগুণের ক্রিয়া কহে। এই অবস্থায় সকল নিকৃষ্ট ভোগে স্পৃহা হইয়া থাকে। এই নিষিদ্ধ ও নিকৃষ্ট ভোগ্য দ্রব্য ও ম্লেচ্ছ পশুমাংস প্রভৃতি ঈশ্বরে অর্পণ করার নাম তামস্ বলি হইতেছে।

এ বিষয়ে সময়াচার তন্ত্র ও গায়ত্রী তন্ত্র বলিতেছেনঃ—

"বলিশ্চ দ্বিবিধো দেবি সাত্ত্বিকো রাজসস্তথা।
যথোক্ত বিধিনা কুর্য্যাত্তথোক্ত ফলমাপ্নুয়াৎ॥
সাত্ত্বিকো বলিরাখ্যাতো মাংসরক্তাদি বর্জ্জিতঃ।
রাজসো মাংসরক্তাদিযুক্ত স প্রোচ্যতে প্রিয়ে॥

তামসস্তামসগুণৈঃ রাজসাদৈর্যুতঃ প্রিয়ে।
ন শ্রদ্ধা বলিদানেষু পূজনাদিষু সুন্দরি॥

অর্থঃ—হে দেবি! প্রধানতঃ বলি দুই প্রকার হইতেছে। উহাদের নাম সাত্ত্বিক ও রাজস্ হইতেছে। যথাশাস্ত্রীয় নিয়মে অনুষ্ঠান করিলে সাধকে উপযুক্ত ফল লাভ করিয়া থাকে। যে বলিতে মাংস ও রক্তাদি হিংসাজনিত চিহ্ন থাকে না, তাহাকে সাত্ত্বিকী বলি কহে। বিহিত মাংস ও রক্তাদিযুক্ত বলিকে রাজস্ বলি কহে। রাজস ভাবে যেরূপ বলি ও পূজার কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, হে প্রিয়ে, সেইরূপ পূজায় ও বলিতে শ্রদ্ধাদি যুক্ত না হইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিলে তমোভাব জাত পূজা ও বলি কহে।

এই সকল দ্রব্য ব্যতীত মানস পূজায় যখন বলিদানের প্রকৃত তত্ত্ব চিন্তা করা যায়, তখনই মানবে প্রকৃত বলির অধিকারী হইয়া থাকে। প্রকৃত বলি কাহাকে বলে, তদ্বিষয়ে শাস্ত্র যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহার আলোচনা করা হউক। এই বাহ্য পূজা হইতে অন্তর্যজ্ঞ বিষয়ে অধিকার লাভ করিতে পারিলেই দ্রব্যানুষ্ঠান জন্য চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। দ্রব্যসমূহ সহযোগে, অঙ্গসংস্থান সহযোগে, এবং কাল ও মন্ত্রাদি সহযোগে ঈশ্বরার্থ অনুষ্ঠান করিতে করিতে আমরা যখন অন্তর্যজ্ঞ অর্থাৎ মানস পূজার অধিকার পাইব, সেই সময়েই আমাদের চিত্তশুদ্ধি ঘটিবে। এ বিষয়ে মুণ্ডমালা তন্ত্র বলিতেছেনঃ—

"মহাসিদ্ধিকরী পূজা মানসী মুক্তিদায়িনী।
অন্তর্যাগাত্মিকা সর্ব্ব জীবত্ব পরিনাশিনী॥"

অর্থঃ—এই যে মানসী পূজা ইহা মহাসিদ্ধিকরী এবং মুক্তিদায়িনী হইতেছে। বিশেষতঃ ইহা সর্ব্বজীবত্ব ক্ষয়কারিণী এবং অন্তর্যাগস্বরূপ হইতেছে।

এই তন্ত্রোক্ত বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে, মানসী পূজাই অনুষ্ঠানজাত বিশুদ্ধি সংস্কারের পরিণাম ফল হইতেছে। এই মানসী

পূজার মধ্যে পঞ্চোপচারাদি কি উপায়ে চিন্তিত হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এক্ষণে বলির তত্ত্ব প্রকাশ করা হইতেছে। কুলার্ণব তন্ত্র বলিতেছেনঃ—

"পুণ্যাপুণ্যপশুং হত্বা জ্ঞানখড়্গেন যোগবিৎ।
কামক্রোধৌ তু বিকৃতৌ বলিং দত্বা জপঞ্চরেৎ॥"

অর্থঃ—মানস পূজায় পুণ্য অর্থাৎ সুখ, অপুণ্য অর্থাৎ দুঃখ এবং কাম, ক্রোধ ও মনো বিকার সমস্তকে জ্ঞান খড়্গ দ্বারা যোগবিৎ ব্যক্তি ছেদন করিয়া, তাহা ঈশ্বরে উপহার প্রদান পূর্ব্বক তন্মন্ত্র জপ করিবেন।

এই শ্লোকে এবং বহুশাস্ত্রের প্রমাণে আছে যে, বিশুদ্ধির জন্য প্রথমে দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয়, পরে ক্রমে উন্নত হইলে তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—হইতে পারে ঃ—অন্যান্য দ্রব্যগুলি অর্থাৎ ফলমূল, জল ইত্যাদি তাহার স্থূল বা সূক্ষ্ম ব্যবহারে তত দোষ ঘটিতে পারে না, কিন্তু ছাগাদির হত্যায় হিংসা বৃত্তির উত্তেজনা করা হইতেছে, তাহা হইতে বিশুদ্ধি কেমন করিয়া ঘটিতে পারে? তদুত্তর এই যথাঃ—সাত্ত্বিকাদি বলি ভেদে দেখান হইয়াছে যে, রাজস্ ও তামস্ ঐ উভয় প্রকৃতির মানবে অর্থাৎ যাহারা ঘোর মাংসপ্রিয় তাহারা নিজাহারার্থে নিত্য পশুচ্ছেদন করে। ঐ রূপ কার্য্যে ঘোর হিংসা বৃত্তির উদ্রেক হইয়া চিত্তাশুদ্ধ হইয়া থাকে। উহাদের পূর্ব্বাসক্তি অর্থাৎ জীবহিংসা ক্ষয় করিবার জন্য, শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন যেঃ—ঈশ্বরার্থ শাস্ত্রানুমোদিত বিহিত হিংসা করিতে পারিবে। এই বিহিত হিংসা করিয়া তন্মাংস বা রুধির সে ব্যক্তি স্পর্শ করিবে না। দেবতাকে অর্পণ করিয়া অব্যবহিত পরে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এইরূপ বহুহিংসা ত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরার্থ এক মাত্র হিংসায় তাহার বৃত্তির শোধন ঘটে। প্রায়শ্চিত্ত করিতে করিতে যখন হিংসাদিকে দেবপূজায়ও পাপ কার্য্য বলিয়া বোধ হয়, তখনই তাহার বৃত্তি সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ হয়। আর সে হিংসা করে না। তখন তাহার পক্ষে পূজাকৃত হত্যাদি

কার্য্য বিহিত হয় নাই। পুজাদিতে পশুবধ করিয়াপ্রায়শ্চিত্ত না করিলে পাপক্ষয় হয় না, তদ্বিষয়ে শাস্ত্র বলিতেছেনঃ—

"পশূনাং ঘাতনং কৃত্বা যোনিমুদ্রাং বিধায় চ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সাধকঃ সাধয়েৎ শিবাং॥"

অর্থঃ—সাধক সেই মঙ্গলময়ী দেবীকে সাধনা করিতে যখন পশু হত্যা করিবে, তৎক্ষণাৎ যোনিমুদ্রার অনুষ্ঠান করিবে। এরূপ কার্য্য করিলে তবে সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে।" এই যে যোনি মুদ্রার কথা বলা হইল, ইহা এক প্রকার মন্ত্রময় ও ভগবচ্চিন্তাময় হইবার অঙ্গসংস্থান হইতেছে। অতএব চিন্তা সহযোগে মনোপ্রায়শ্চিত্ত এবং দ্রব্যসংযোগে বাহ্যপ্রায়শ্চিত্ত বিধি শাস্ত্র কহিয়াছেন।

দ্রব্যানুষ্ঠানের মধ্যে যতগুলি বিষয়ের উল্লেখ আছে, উপচার ও বলি ব্যতিত পঞ্চতত্ত্ব বিষয়ে আমাদের বোধ হওয়ার আবশ্যক হইতেছে। আমাদের তমো ও রজো প্রকৃতি থাকিতে আমরা পশুর ন্যায় আহারবিহারপর হইয়া থাকি। সেই ঘোর অবস্থোচিত প্রবৃত্তি গুলিকে ঈশ্বরার্থ ব্যবহার করিলে, আমাদের মনোগ্লানি ক্ষয় হইয়া থাকে। মদ্যপান, মাংস ও মৎস্য ভক্ষণ, মুদ্রা অর্থাৎ অর্থাদিতে অভিনিবেশ এবং স্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতি পাঁচটি বিষয়ে আমরা ঘোর সংসারে উন্মত্ত হইয়া থাকি। এই পঞ্চ বৃত্তিকেও ঈশ্বরে অর্পণ করিলে আমাদের শোধন ঘটে। এই পঞ্চ বৃত্তিকে পঞ্চমকার বা পঞ্চতত্ত্ব কহে। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন, এই পঞ্চ বৃত্তির প্রথমে মকার অক্ষর আছে বলিয়া পঞ্চমকার কহে। এই পঞ্চ পদার্থ যাহা আমরা ব্যবহার করিয়া একেবারে হতচেতন এবং মুগ্ধ হইয়া থাকি, উহাদের বৈধব্যবহার ও ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি সাহায্যে আমাদের পবিত্রতা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ঘটিয়া থাকে। এই পঞ্চতত্ত্ব পদার্থও পূর্ব্বের ন্যায় রাজস্ ও তামস্ প্রকৃতিমানের জন্য স্থূল ভাবে দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হয় এবং সাত্ত্বিক ব্যক্তির জন্য মন্ত্রময় হইয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দ্রব্যরূপে যখন ব্যবহার হয়, তখন শাস্ত্র উহাদের কেবল

দৈবপ্রীতির জন্য ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন, অধিকন্তু শোধন পূর্ব্বক কেবল পূজাদিকালে ব্যবহার করিবার কথা বলিয়াছেন, অন্য সময়ে তাহাদের স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। পূজাকালে উহাদের শোধন পূর্ব্বক ব্যবহার করিতে উৎপত্তি তন্ত্র এইরূপ বলিতেছেনঃ—

"অসংস্কৃতাং সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মহা ভবেৎ।
সৌত্রামণ্যাং কুলাচারে ব্রাহ্মণো প্রপিবেৎ সুরাং॥
অন্যত্র কামতঃ পীত্বা ব্রাহ্মন্যাদেব হীয়তে।
পিতৃদেবাদি যজ্ঞেষু বৈধ হিংসা বিধীয়তে।
আত্মার্থং প্রাণিনাং হিংসা কদাচিন্নোদিতা প্রিয়ে॥
শূদ্রানাং ভক্ষযোগ্যানাং যন্মাংসং দেবনিৰ্ম্মিতং।
বেদমন্ত্রেণ বিধিবৎ প্রোক্তা সা শুদ্ধিরুত্তমা॥

অর্থঃ—অসংস্কৃত সুরা পান করিলে ব্রাহ্মণও ব্রহ্মহত্যা পাপের অধিকারী হইয়া থাকেন। (অন্য ক্ষত্রিয়বৈশ্যাদি বর্ণের পক্ষে যত পাপ তাহা বাক্যাতীত হইতেছে।) সৌত্রামণী ও শক্তিপূজাতে প্রদত্ত শোধিত সুরা ব্রাহ্মণ পান করিতে পারেন, এতদ্ব্যতীত ইচ্ছানুসারে পান করিলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণত্ব হইতে হীন হইয়া থাকেন। (অন্যের তো জাতি বিচ্যুতি ঘটিবেই।)

পিতৃদেবযজ্ঞাদিতে শাস্ত্রে যে উপায়ে হিংসার বিধান করিয়াছেন, সেই হিংসা করা উচিত, তদ্ব্যতিত নিজ প্রীতির জন্য প্রাণিগণের হিংসা কখনই শাস্ত্রে অনুমোদিত হয় নাই। যে মাংস কেবল শূদ্রগণের ভক্ষণ জন্য দেবগণ সৃজন করিয়াছেন, বেদমন্ত্রে ও ক্রিয়ায় তাহার শোধন করিলে, তাহা উত্তমাশুদ্ধি লাভ করিয়া উপকারী হইয়া থাকে।

মুদ্রা ও মৈথুনাদি বিষয়ে কামাখ্যা তন্ত্র বলিতেছেনঃ—

"পৃথুকা তণ্ডুলভ্রষ্টা গোধূম চনকাদয়ঃ।
ভস্যনাম ভবেদ্দেবি মুদ্রামুক্তিপ্রদায়িনী।

তথা উৎপত্তিতন্ত্রেঃ—মাতৃযোনি বিচারোস্তি মাতৃযোনিং বিনাপ্রিয়ে।

ভগলিঙ্গ সমাযোগাদাকৃষ্য জপমাচরেৎ ॥
নিশ্চলত্তু ভবেচ্চিত্তং কোটি সূর্য্যগ্রহেন কিং।
চলে চিত্তে ভবেদ্ব্যাধি নিশ্চলে নিশ্চলং যথা ॥”

অর্থঃ—পৃথুকা, তণ্ডুল, গোধূম ও চনকাদি ভাজিয়া মিশ্রিত করিলে যে খাদ্য দ্রব্য হয়, তাহাকে মুদ্রা কহে। এই মুদ্রা অবস্থা বিশেষে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে। (অর্থাৎ বাহ্য বহুবস্তুর সম্মিলনে যেমন মদ্যাদি পানে মুদ্রাপদার্থ স্বাদু হয়; তদ্রূপ প্রেমমদিরা পান কালে সাধকের মনচিত্তবুদ্ধি ও স্থূলসূক্ষ্মকে একত্র করিতে পারিলে শরীর সংযোগের চিহ্ন বিশেষ বলিয়া মুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।)

মাতৃসম্বন্ধায় যোনি বিচার করিয়া (অর্থাৎ যাহাতে মাতৃসম্বন্ধ আছে মাসি, পিশি, খুড়া ইত্যাদি এবং মাতৃগর্ভসম্বন্ধাগত ভগ্নী, ভাগিনা ইত্যাদি) বিচার করিয়া, বিশেষতঃ মাতৃযোনি ত্যাগ করিয়া কামিনী গ্রহণ পূর্ব্বক ভগ ও লিঙ্গ সংযোগে জপ ব্যবহার করিলে তাহাকে পূজার্থে মৈথুন কহে। এই অবস্থায় যদি জপক্রমে চিত্ত নিশ্চল হয়, তবে কোটি কোটি সূর্য্যচন্দ্রগ্রহণ কালে পুরশ্চরণ করিলে যে ধর্ম্ম হয়, তাহা হইতে অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। যদি এই অবস্থায় চিত্ত চঞ্চল হইয়া রেতস্খলন হয়, তবেই মহাব্যাধি হইয়া থাকে, নিশ্চল হইলে একান্ত মুক্তিলাভ হয়। এতক্ষণ আমরা যথা শাস্ত্র পঞ্চমকারের স্থূল ব্যবহারের তাৎপর্য্য দেখাইলাম। ইহাদের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন তাহা বুঝান উচিত হইতেছে।—
কুলার্ণব তন্ত্র বলিতেছেন ঃ—

“সুরাশক্তিঃ শিবো মাংসং তদ্ভোক্তা ভৈরবঃ স্বয়ং।
তয়োরৈক্যসমুৎপন্ন আনন্দং মোক্ষ উচ্যতে ॥
আনন্দং ব্রহ্মণোরূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতং।
তস্যাপি ব্যঞ্জকং দ্রব্যং যোগিভিস্তেন পীয়তে॥
আমূলাধারমাব্রহ্মরন্ধ্রং গত্বা পুনঃ পুনঃ।
চিচ্চন্দ্র কুণ্ডলী শক্তিঃ সামরস্য মহোদয়ঃ ॥

ব্যোমপঙ্কজানিস্যন্দন্ সুধাপানরতো নরঃ।
মধুপানমিদং দেবি চেতরান্মদ্যপানকং॥
মানসাদীন্দ্রিয়গণং সংযম্যাত্মনি যোজয়েৎ।
মাংসাশীস ভবেদ্দেবি ইতরে প্রাণিঘাতকাঃ॥
পরে লযং নযেচ্চিত্তং মৎস্যাশাতি নিগদ্যতে।
যোনিমুদ্রেহম্মুদাস্যাদন্যামাহারসম্ভবা॥
পরশক্ত্যাত্মনি মিথুনং সংযোগাদ্বন্দ্বনির্ভরাঃ।
মুক্তাস্তে মৈথুনং তৎ স্যাদিতরে স্ত্রীনিষেবকাঃ॥"

অর্থঃ—হে দেবি! সাধন কার্য্যে সুরাকে মহাশক্তিরূপিনী এবং মাংসকে শিবরূপী বুঝিয়া যে উভয় তত্ত্ব ভোগ করে, সেই ব্যক্তিই মৃত্যুঞ্জয় ভৈরবত্ব লাভ করিয়া থাকে। এই শিব ও শক্তির একত্বই আনন্দ বলিয়া বিখ্যাত, সেই আনন্দই মুক্তি হইতেছে। আনন্দই ব্রহ্মের রূপ তাহাই ব্রহ্মযজ্ঞে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এই আনন্দ নামক ব্রহ্মব্যঞ্জক পদার্থ যোগীগণে সেই জন্য পান করিয়া থাকেন।

এই মদ্য সাধনকালে সাধক যখন যোগবলে মূলাধার হইতে ব্রহ্ম রন্ধ্র পর্য্যন্ত চিত্ত, মন ও কুণ্ডলিনীকে একত্র করিয়া গমনাগমন করা ইতে পারিবে, তখনই তাহার সহস্রার কমল হইতে সুধা ক্ষরিত হইবে। এই সুধা যে পান করে, সেই ব্যক্তি আনন্দ পানকারী, এতদ্ব্যতীত সামান্য মদ্যপায়ী হইতেছে। মানস ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া যে ব্যক্তি আত্মাতে সংযুক্ত করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মাংসাশী অন্য সকলে প্রাণিঘাতক হইতেছে। যে আপনার চিত্তরূপী চঞ্চল মৎস্যকে ব্রহ্মে লয় করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই মৎস্যাশী নামে বিখ্যাত হইতেছে। যে ব্যক্তি যোনী মুদ্রাদি যোগাবলম্বনে শরীরকে আনন্দে পুষ্ট করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মুদ্রা (মিশ্রিত স্বাদু খাদ্য বিশেষ) ব্যবহার করে। অন্য উপায়ে মুদ্রা ব্যবহার করা কেবল আহারের জন্য। পরাশক্তি ও আত্মা ইহারা মিথুন হইতেছে। এতদুভয়ের সংযোগেই সংসারের সকল দুঃখ দূর হয়, এই জন্য ইহাকে

প্রকৃত মৈথুন কহে। এরূপ মৈথুনে মুক্ত হওয়া যায়। অন্যথা স্ত্রী ব্যবহার করিয়া কার্য্য করিলে তাহাদের স্ত্রীসেবী সংসারী কহে।

এই সকল দ্রব্যানুষ্ঠান তত্ত্ব অতি সংক্ষেপে সাধারণের বোধ হইবার জন্য লিখিলাম। পূজাপদ্ধতিতে ইহাদের বিশেষ বোধে করাইতে চেষ্টা করিব।

অথ ক্রিয়ানুষ্ঠান তত্ত্ব।

ইন্দ্রিয়াদি সহযোগে মন কোন কার্য্যে প্রযুক্ত হইলেই তাহাকে ক্রিয়া কহে। ক্রিয়া দ্বিবিধ হইতেছে। কোন ক্রিয়ায় মন বিষয়াসক্ত হয়, কোন ক্রিয়ায় মন বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া থাকে। কাম ক্রোধাদি সংযুক্ত বাসনার অভিপ্রায়ে মন যখন ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় ব্যাপারে অর্থাৎ ভোগে প্রয়োগ করে, তখন যে ক্রিয়া হয়, তাহাকে বিষয়ক্রিয়া কহে। ইহাতে মন অবিশুদ্ধ হইয়া চিত্তকে মলিন করত একেবারে উন্নতিবিহীন হইয়া পড়ে। কেবল চিত্তকে বিশুদ্ধ করিতে মন যে সকল কার্য্য ইন্দ্রিয় সহযোগে করিয়া থাকে, তাহাকে ক্রিয়া অথবা অনুষ্ঠান কহে। ইহার সাহায্যে মনের ও দেহের বিশুদ্ধি ঘটে এবং চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে ক্রমে জীব মুক্ত হইয়া থাকে। চিত্তের বিশুদ্ধি ঘটাইবার জন্য যে সকল অনুষ্ঠানের আবশ্যক, তাহাই বর্ত্তমান আলোচ্য প্রস্তাবের বিষয় হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আমাদের তিনগুণ আছে। পূর্ব্বকর্ম্মফল যেরূপ শুদ্ধাশুদ্ধ হইবে, আমরা তদনুরূপ প্রকৃতিজাত গুণস্বভাব পাইব। আমাদের স্বভাব তমো, রজো বা সত্বগুণময় হইলে, আমাদের স্বভাবানুসারে আমাদের বুদ্ধি, জ্ঞান ও বাসনাদি সংসারে প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই গুণময় স্বভাবের রুচি

অনুসারে আমাদের তমোগুণময় রুচি হইলে, তাহা হইতে আমাদের বিশুদ্ধ হইতে এক প্রকার ক্রিয়ার আবশ্যক; রজোগুণময়ী রুচি হইলে তাহা হইতে চিত্তকে বিশুদ্ধ করিতে অন্য প্রকার ক্রিয়ার আবশ্যক হয়। সত্ত্বগুণময়ী রুচি হইলে তাহা হইতেও চিত্তকে বিশুদ্ধ করিতে অন্য প্রকার ক্রিয়ার আবশ্যক হইয়া থাকে।

আমরা যে ক্রিয়াদ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের বিশুদ্ধি ঘটাইতে চেষ্টা করিব তাহা গুণময় অবস্থা ভেদে ত্রিবিধ নাম ধারণ করে। প্রথম সাত্ত্বিকী, দ্বিতীয় রাজসী, তৃতীয় তামসী ক্রিয়া হইতেছে। যখন আমাদের ঘোর তমোগুণময় স্বভাব থাকে, তখন আমরা ঘোর অহংকারী থাকি। দয়াদাক্ষিণ্যাদি কোন গুণই থাকে না। সর্ব্বদাই আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও মৈথুনাদিতে প্রবৃত্তি ধাবিত হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহাদিতে সর্ব্বদাই হৃদয় পূর্ণ হইয়া থাকে। এই সকল দোষে যখন চিত্ত দূষিত হয, তখন মন ঘোর স্বেচ্ছাচারে; মাদকতায় উন্মত্ত ও হিংসাদি কার্য্য দ্বারা আহারাদির চরিতার্থ করিয়া থাকে। এই ঘোর সূক্ষ্ম অবস্থাকে বিশুদ্ধ করিতে যে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয তাহাকে তামসিকী ক্রিয়ানুষ্ঠান কহে। তখন মানবের প্রবৃত্তি ঘোর হিংসাপর, সেই সময়ে গুরুদেব আমাদের বহু হিংসাপর চিত্তকে ক্রমে হিংসাহীন করিতে দেবতার প্রীতি কামনায় সামান্য হিংসার বিধি দিয়াছেন। তখন মানবে মাদকতায় ঘোব উন্মত্ত, সেই অবস্থার বিশোধনার্থ গুরুজনে দেবতার প্রীতি কামনায় সামান্য মদিরাদি পান কবিতে বিধি দিয়াছেন। সেই সময়ে মানবের বসন, ভূষণ, অর্থ, গৃহ ইত্যাদিতে বিশেষ অনুরাগ থাকায়, গুরুজনে ঐ সকল কামনায় দেবতার প্রীতি সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অনেকে হয়তো মনে করিতে পারেন যে একে ঘোর হিংসা, রিপু ও আশক্তিতে পূর্ণ হইয়া তমোগুণাপন্ন ব্যক্তিগণ সংসারে আপনাদের দুষ্কৃতি ভোগ করিতেছে। তাহাদের প্রবৃত্তির শোধনের জন্য কিঞ্চিৎ পবিমাণে হিংসা বা মদিরাদি ব্যবহারে কেমন করিয়া বৃত্তির বা স্বভাবের শোধন ঘটিতে

পারে? অগ্নিতে বহু ঘৃত আহুতি না দিয়া স্বল্প ঘৃত নিক্ষেপে কখন কি অগ্নির নির্ব্বাণ ঘটে? প্রতিকূলবাদীগণের ঐ যুক্তি মৌখিক, তাঁহারা ব্যবহারজগতের কোন তত্ত্বই রাখেন না। শাস্ত্র ও দর্শনের যুক্তিমতে দেখা যায় যে, যে বিষয় ব্যবহারে উপলব্ধি হইলে সকল সংশয় দূর হইয়া যায়, তাহা কখনই কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করে না। যেমন ক্ষুধা সমুদিত না হইলে আহারীয়ের মিষ্টতা অনুভব হয় না। আহারীয় বস্তু নাই এবং ক্ষুধাও নাই, এমন অবস্থায় আহারীয় মিষ্ট বলিলে কি কখন আহারকর্ত্তা তৃপ্ত হইতে পারে। ক্ষুধা চাই, আহারীয় চাই, উভয়ের ব্যবহারে যে ফল হইবে, তাহাতে তৃপ্তি আপনিই আসিবে। আমাদের সাধন জগতে ব্যবহার দ্বারা প্রত্যক্ষ যে ফল তাহাই স্বীকার্য্য; শাস্ত্র কেবল যুক্তি বা তর্কের সাহায্য কখনই স্বীকার করেন না। এই জন্য স্বয়ং মহেশ্বর শিবসংহিতায় সাধনোৎকর্ষ দেখাইতে বলিয়াছেনঃ—

"মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তিস্তু বিশেষ দর্শনাদ্ভবেৎ।
অন্যথা ন নিবৃত্তিস্যাদ্দৃশ্যতে রজতভ্রমঃ॥"

অর্থঃ—যখন বস্তুর প্রকৃত সত্বা উপলব্ধি বা দর্শন ঘটে, তখনই বিস্ময় বা মিথ্যা জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, যেমন শুক্তি বা রজত বোধ না হইলে কখনই শুক্তিতে রজত ভ্রম নষ্ট হয় না, তদ্রূপ প্রত্যক্ষ নির্ণয় না হইলে মিথ্যা জ্ঞান নাশ হয় না।" এই শ্লোকদ্বারা বিশেষ করিয়া বলা হইল যে, সাধন মার্গে প্রত্যক্ষ ফল ভিন্ন স্বীকার্য্য নহে। এই প্রত্যক্ষ ফল নির্ণয়ের জন্য যে সকল বিধি শাস্ত্র কর্ত্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য, কারণ তাহা প্রত্যক্ষ ফলের অনুসারী হইতেছে। এক্ষণে পূর্ব্বকথা বুঝান হইতেছে। ঘোর তমোগুণাপন্ন ব্যক্তিকে রজোগুণাপন্ন বা সত্বগুণাপন্ন করিতে যে সকল উপায়ের আবশ্যক হইয়াছে, সে গুলিও পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে প্রত্যক্ষ ফলের বিষয়ীভূত বুঝিতে হইবে।

কোন জীব বা মানবকে বশীভূত করিতে হইলে, যাহার যে প্রকৃতি

তদনুরূপ কার্য্য উপদেশ দিতে হয়। সেই উপদেশ ফলে সে ব্যক্তির কিছু উপকার বোধ হইলে, তবে সে উপদেষ্টার বশীভূত হইয়া থাকে। মহাভোগে আশক্ত ও ক্রুবকর্ম্মা তমোগুণীকে যে ভাবে বশীভূত কবিতে হয, সত্ত্বগুণীকে সে ভাবে হয় না। দর্শনতত্ত্বজ্ঞেবা দেখাইয়াছেন, যে জীবেব অন্তবে জ্ঞানেব অপ্রকাশ, চিত্তেব অপ্রকাশ, জড়তা ও নিব্বুদ্ধিতাব বিকাশ থাকে, আহাব বিহাব ও ভয় প্রভৃতিতে তাহাদের বশীভূত করিতে হয। তমোগুণপব মনুষ্য হইতে পশুগণেব প্রকৃতি পবীক্ষা কবিলে দেখা যায যে, যত উহাদেব জন্ম ও জাতি তারতম্যে বুদ্ধিব অপ্রকাশ ঘটিযাছে, ততই উহাবা আহাব, নিদ্রা ও মৈথনাদিতে আশক্ত হইযাছে। ন এবা কুকুব, শৃগাল, গাভী, ঘোটক, হস্তী, প্রভৃতিকে পালন বিতে ও বশীভূত করিতেঃ—ভয মৈত্র, আহাব প্রভৃতি কোশনেব প্রয়োজন হইযা থাকে। অতিশয আহাব ও অধন্য বিহাব পাইলেই কুকুব, গাভী, ঘোটক, হস্তী প্রভৃতি উদ্দান্ত ও অবশীভূত হইবা থাকে। যে আহাবেব বশে তাহাবা পূর্ব্বে বশীভূত হয নাই, পবে গৃহে বাখিয়া নিযমিত আহাব ও বিহাবে তাহাদেব বশীভূত কেমন কবিয়া কবা হইল? তাহাবা যেমন ঘোব বনে ভ্রমণ কবিত, তেমনি গাভী, ঘোটক ও হস্তীকে একবাব একবাব ভ্রমণ না কবাইলে তাহাদেব ব্যাধি উপস্থিত হয, তাহাদেব প্রকৃতিব অনুসাবী আহাব না দিলে তাহাদেব ব্যাধি উপস্থিত হইযা থাকে। এই নিয়মে দর্শনতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কহিযাছেন, যাহাদেব জ্ঞানের উদ্ভেদ হয নাই বা অল্প হইযাছে, তাহাদের ভোগ দ্বাবা বশীভূত কবিতে হয়। যাহাদেব জ্ঞান অল্প বিকশিত হইয়াছে, তাহাদেব ভোগ ও উপদেশবলে বশীভূত কবা যায। যাহাদেব বিশেষ জ্ঞানের বিকাশ ঘটিযাছে, তাহাদেব কেবল উপদেশ চিন্তন ও মননাদি দ্বাবা বিশুদ্ধি ঘটযা থাকে। ঘোব তামসিক স্বভাব সম্পন্ন মানবের জ্ঞান ও বুদ্ধিব বিকাশ তাদৃশ হয নাই, এ অবস্থায় তাহাদেব ভোগেব সহযোগে বুদ্ধির বিকাশ ঘটাইয়া, শেষে ভোগ ও যোগের

অধিকারী করিয়া অন্তে একান্ত যোগের অধিকারী করিবার বিধিই গুরু ও শাস্ত্রগণ দিয়া থাকেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই, যে ভোগে একবার দুর্ব্বিনীত হওয়া যায়, আবার সেই ভোগে কেমন করিয়া বিশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। তদ্বিষয়ে বিচার এই যথাঃ—ভোগটি যে ভাবে মণ্ডিত থাকিবে, ভোগকারী সেই ভাবে আপনার স্বভাবকে পরিণত করিবে। যেমন ঘোটক, হস্তী প্রভৃতি অরণ্যে বিহার করিত, যথেচ্ছা আহার করিত, তখন কাহারো বশীভূত হয় নাই। যখন ধৃত হইয়া বশীভূতকারীর অধীন হইল, তখন তাহারা সেই বশকারীর ভয় ও করুণা গুণের অপেক্ষী হইয়া তদ্ভাবাক্রান্ত আহারীয় পাইয়া বশীভূত হইয়া পড়িল। সে সময়ে হস্তীঘোটকের আহারবিহার সমস্তই তদধিকারীর ভয় ও করুণা মাখা থাকাতে, উহারা তাহার অধীন হইয়া থাকে। সেই রূপ এই সংসারের মধ্যে কোন অহঙ্কারী ও স্বেচ্ছাচারী তমোগুণী মানব আপন বুদ্ধির অবিকাশে গুরুদত্ত আহার, বিহার ও ভয়করুণায় বশীভূত হইয়া থাকে। সেই ভয় ও করুণা মাখা আহারবিহার যে অবস্থা হইতে তাহারা লাভ করে, তাহারই বশীভূত হয়। রাজার শাসনে প্রজার প্রকৃতি গঠিত হয়, প্রভুর শাসনে ভৃত্যের প্রকৃতি গঠিত হয়, ইহা আমরা স্পষ্ট সংসারে দেখিতেছি। দার্শনিক পণ্ডিতগণে কহেন, তমোগুণী মানবকে ঈশ্বরপথে আনিতে হইলে তাহাদের আহার বিহার ও কার্য্যাদি ঈশ্বর ও গুরুপর করা চাই। ঈশ্বরের কৃপায় তাহাদের আহার, সুখ, সম্পত্তি ইত্যাদি বোধ করাইতে পারিলে এবং গুরুর কৃপায় তাহাদের ভোগের ক্ষয় হয়, ইহা বোধ করাইতে পারিলে; তাহাদের ভোগশক্তি ক্রমে ঈশ্বরপর ও গুরুপর হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রকৃতি অনুসারে চিরাভ্যস্ত ভোগই তমোগুণীগণের কল্যাণপ্রদ হইয়া থাকে; সেই নিয়মে—হিংসা, মদ্য, মৈথুন ও ভোগস্পৃহা প্রভৃতিই যখন তমোগুণীর প্রকৃতি, তখন দেবপ্রীতির জন্য হিংসা, মদ্য, মৈথুন ও ভোগাদি যদি ব্যবহৃত হয়,

তাহা হইলে ক্রমে তাহাদের দেবপ্রীতি আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এই আহারবিহারাদি সংযোগে দেবপ্রীতির আকর্ষণ করিতে যে বিধি শাস্ত্র দিয়াছেন, তাহাকে তমাসিকী ক্রিয়ানুষ্ঠানতত্ত্ব কহে। তমোগুণের ক্রিয়া অনুসারে আহারীয়, বসন, ভূষণ, গৃহাপত্য প্রভৃতি ঈশ্বরের প্রীতি অর্জ্জনহেতু অর্পণ করিয়া শেষে তাহা ভোগ করিলে প্রকৃতি শোধিত হইয়া থাকে। আহারীয়াদি ঈশ্বরে অর্পণ করিলে পরে তাহার ভোগ হইতে যেভাবে বিশুদ্ধি ঘটে, এ কথা দ্রব্যানুষ্ঠান তত্ত্বে দেখাইয়াছি, এক্ষণে ক্রিয়ানুষ্ঠানে এই পর্য্যন্ত দেখান উচিত যে, মনাদির সহিত ইন্দ্রিয়গুলি পবিত্র হইলে দেবপ্রীতির জন্য তমোস্বভাবে যে ভাব ব্যবহৃত হয়, তাহাতে বিশুদ্ধি ঘটিতে পারে কি না? এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বলা হইয়েছে, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনাদি যে ভাবের বশবর্ত্তী হইবে, ইহাদের সংস্কার তদনুরূপ হইয়া থাকে। মনে অনিষ্টচিন্তা জ্ঞানেন্দ্রিয়ে তৎসহযোগীতা, কর্ম্মেন্দ্রিয়ে তাহার নিষ্পত্তি, এই সকল উপায়ে আমাদের ক্রিয়াশক্তি তমোগুণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পশু বা মানবের হিংসা করা তমোগুণজাত একটি প্রকৃতি। মানব যখন যথেচ্ছ ভাবে ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত, তখন ধরিল আর মারিল,—দিন, কাল, শুচি, অশুচি প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিল না। এ অবস্থায় প্রবৃত্তি বিশুদ্ধ হইতে পারে না। ছাগ, মৎস্য, পক্ষী প্রভৃতির মাংস যাহা মানবে আহার করে, সেই সকল পশু যদি দেবপ্রীতির জন্য প্রথমে ব্যবহার করিয়া, পরে আহারাদি করে, এ কার্য্যে পৃথক্ ও শুদ্ধ ফললাভ হইয়া থাকে। যেমন কোন হত্যাকারী একটি মানবকে মারিলে তাহার জিঘাংসা বৃত্তি এত বর্দ্ধিত হয় যে, সে ব্যক্তি ঘোরা মূর্ত্তিমান্ ও দয়াদাক্ষিণ্যহীন ভীষণ পশু ভাব ধারণ করে, কিন্তু কোন মানবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি চিকিৎসার জন্য খণ্ডবিখণ্ড করা হয়, তাহা হইলে খণ্ডকারীর পক্ষে পূর্ব্বোক্ত দূষিত ভাব স্পর্শ করে না। উভয় কার্য্যই হইল মানবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ড বিখণ্ড করা, কেবল বাসনা ও প্রকৃতিভেদে হত্যাকারী দস্যুর পক্ষে ঘোর পাপ

এবং বৈদ্যের পক্ষে পুণ্য হইয়া থাকে। এই নিয়মে একটি পশু স্বেচ্ছাচারে হত্যা করিলে, কৃতীর ভয়ানক দুর্দ্দান্ত হিংসাভাবের আবির্ভাব হয়। কিন্তু দেবতার নিবেদন কার্য্যে তাহা হয় না। দেবতায় নিবেদন করিতে হইলে পূর্ব্ব দিবস ব্রতপর হইয়া দেবতার চিন্তায় থাকিতে হইবে। নিজে স্নানাদির দ্বারা পবিত্র ও দেবচিন্তায় মনকে নিয়োজিত করিতে হইবে। শেষে দেবতার আবির্ভাব স্বীকার করিয়া অতিশয় কাতরতা ও মিনতি সহযোগে নিজের সুখকামনা করিয়া সেই পশু, ফল, জল ইত্যাদি দেবতাতে অর্পণ করিতে হইবে। সেই পশু হত্যাকালে যে ভাবে মন ও ইন্দ্রিয় কার্য্য করিল, তাহাতে জিঘাংসা বৃত্তির উত্তেজনা অর্থাৎ হত্যা করিয়া স্বেচ্ছায় আমোদ করিবে এ ভাবনা না হওয়াতে, ঈশ্বরের প্রীতির উপলক্ষ থাকাতে, তাহার ফল কিছু পৃথক হইল। অর্থাৎ তাহার তমোপ্রকৃতির সমস্ত কার্য্যই দেবতার প্রীতির জন্য ব্যবহার হওয়াতে এবং দেবপ্রীতির উপরে তাহার অনুরাগ থাকাতে, তামসিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে ক্রমে বিশুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। এই বিশুদ্ধির উপায় তমোগুণের পক্ষে যেমন তমোভাব দ্বারা সংসাধিত দেখান হইল, সেইরূপ রজোগুণ পক্ষে রজোগুণ সহযোগে ক্রিয়ার কথা শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন। তমোগুণের ও রজোগুণের কর্ত্তব্য কি? তাহা ক্রমে দেখান হইতেছে। শ্রীগীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন:—

"ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব—তামসী চেতি তাং শৃণু॥
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ! তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসং॥
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণং।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥"

অর্থঃ—হে অর্জ্জুন! আত্মকর্ম্ম ও স্বভাবানুসারে—দেহীগণের মধ্যে

কাহারো সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার উদয় হয়। কাহারো রাজসী শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। কাহারো তামসী শ্রদ্ধার উদয় হয়। ইহার বিশেষ পরিচয় শ্রবণ কর। যে সকল কৃতীপুরুষ যজ্ঞে ঈশ্বরের তুষ্টি সম্পাদন হইবে এই ইচ্ছায় যথাশাস্ত্র বিহিত নিয়মানুসারে ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া যজ্ঞাদি সম্পাদন করে; তাহাকেই সাত্ত্বিকী অনুষ্ঠান কহে। যে সকল কৃতীপুরুষ ফল ইচ্ছা করিয়া, কিম্বা সমাজে আত্মগৌরব খ্যাপনার্থ যজ্ঞাদি কার্য্য করে, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহাকে রাজসী শ্রদ্ধা জনিত যজ্ঞ কহে। যে সকল যজ্ঞে দেবতাব্রাহ্মণকে অন্নাদি দান করা যায় না, যাহাতে বিধি, মন্ত্র এবং উপযুক্ত দক্ষিণাদির প্রয়োগ হয় না; যাহা প্রকৃত শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হয় না, তাহাকেই তামস যজ্ঞ কহে।" এই যে ত্রিবিধ শ্রদ্ধানুসারে মন ও ইন্দ্রিয় সহযোগে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার কথা বলা হইল, ইহাতে ক্রমে সকলেই পবিত্র হইবে, কিন্তু স্বভাবভেদে ভিন্ন ভাবে অনুষ্ঠান হওয়াতে পৃথক ফল লাভ হইল। এক মাত্র শ্রদ্ধার তারতম্যে একই কার্য্যে পৃথক ফল লাভ হইল। চিত্তের বিশুদ্ধি ভিন্ন শ্রদ্ধার উদয় হয় না, অতএব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে স্বভাবের শুদ্ধিবিশুদ্ধি হেতু শ্রদ্ধার ও ফলের তারতম্য যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানে দেখা যায়। তমোভাবের ক্রিয়া হইতে যেমন বিশুদ্ধির উপায় দেখান হইল, সেইরূপ রজো হইতে সত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে; আবার সত্ত্ব হইতে বিশুদ্ধ সত্ত্বে চিত্তের পরিণতি ঘটিলে সাধন কার্য্যের শেষ হইল বুঝিতে হইবে।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা বুঝান হইল যে, যে সকল অনুষ্ঠান, ইন্দ্রিয় ও মনের সংযোগে চিত্তের বিশুদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই ক্রিয়ানুষ্ঠানতত্ত্ব কহে। এই ক্রিয়া সহযোগে আমাদের চিত্তের বিশুদ্ধি করিতে যে সকল কৌশল শাস্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাতব্য হইতেছে। তামস্ স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে চিত্তবিশুদ্ধির জন্য কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। রাজস্ স্বভাব ব্যক্তির জন্য কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া নির্দিষ্ট আছে। সাত্ত্বিক

প্রকৃতিস্থ মানবের জন্যও পৃথক ক্রিয়ার নির্দ্দেশ শাস্ত্র করিয়াছেন। ঐ সকল প্রকৃতি অনুসারে যে সকল কার্য্য করা উচিত হয় তাহার সংক্ষেপ বিবরণ বলা হইতেছে।

দেবতা, গুরু, বিপ্র, সাধু ও ভক্তের সেবন; তীর্থাদি ভ্রমণ; শ্রাদ্ধাদি করণ, ভগবন্নাম জপন ইত্যাদি কার্য্য তামস্ প্রকৃতিমান্ পুরুষের চিত্ত-শুদ্ধির জন্য শাস্ত্র বিধি করিয়াছেন। যজ্ঞ, পূজা, ব্রত, তর্পণ, অধ্যাত্ম শাস্ত্রের আলোচনা, দানাদি সৎকর্ম্ম, যোগানুষ্ঠান এবং যে সকল অনুষ্ঠান তমোগুণীর জন্য বিহিত হইয়াছে, সে সমস্তই রজোগুণসম্পন্ন পুরুষের চিত্তবিশুদ্ধির জন্য শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ যোগানুষ্ঠান, সমস্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা ও তদ্বিষয়ে অধিকার এবং তমো ও রজোগুণের উপযুক্ত ক্রিয়াগুলি সমস্তই সত্ত্বগুণময় পুরুষের চিত্তশুদ্ধির জন্য শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই যে তমোগুণের, রজোগুণের ও সত্ত্বগুণের উপযুক্ত ক্রিয়াগুলি, যাহার সাহায্যে সকলের চিত্তশুদ্ধি ঘটে, তাহার বিশেষ বা স্বল্প পরিচয় না পাইলে সাধনতত্ত্বের বা উপাসনা কার্য্যের সিদ্ধি হয় না। এই ক্রিয়ানুষ্ঠান তত্ত্বের মধ্যে ঐগুলির বিশেষ পরিচয় আবশ্যক বিধায়ে তাহার কিছু কিছু বিবরণ দেওয়া হইতেছে। এ পর্য্যন্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানে যাহা বলা হইল, তাহাতে অধিকারী ভেদে চিত্তবিশুদ্ধির উপায়ই দেখান হইল। অতএব চিত্ত-বিশুদ্ধির জন্য উপাসনা তত্ত্বে ক্রিয়ানুষ্ঠান নিতান্ত প্রয়োজনীয়, ইহা জানা আবশ্যক হইতেছে এবং ইহাও জানা উচিত যে ক্রিয়ানুষ্ঠান ব্যতীত কখনই স্থূল ও সূক্ষ্মের বিশুদ্ধি সহজে হয় না।

দেবতাগুরুবিপ্র ও সাধুসেবার প্রয়োজন কি ?

ক্রিয়ানুষ্ঠান তত্ত্বের বর্ণনা কালে যে ভাবে তামস্,রাজস্ ও সাত্ত্বিকাদি গুণস্বভাবভেদে ত্রিবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠানে আমাদের চিত্ত বিশোধন ঘটে, একথা আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রকাশ করিয়াছি। তামস্ ভাবসম্পন্ন মানবগণের বিশোধনের জন্য যে সকল অনুষ্ঠান শাস্ত্র বিহিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে দেবতা, গুরু, বিপ্র ও সাধুভক্তের সেবন, তীর্থ দর্শন, শ্রাদ্ধাদি করণ ও নাম জপন প্রভৃতিই প্রধান হইতেছে। এই কয়টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমে গুরু, দেবতা, বিপ্র ও সাধু সেবার প্রয়োজনে কি উপকার হয়, তাহাই বলা উচিত হইতেছে। ক্রমে অন্য বিষয়গুলির উপকারিতা দেখান হইবে। পূর্ব্বপ্রস্তাবে দেখান হইয়াছে যে, একমাত্র শ্রদ্ধার অভাবে মানবে তামস্ ভাব লাভ করে, কিছু শ্রদ্ধা হইলে রাজস্ ভাব প্রাপ্ত হয়, একান্ত শ্রদ্ধান্বিত হইলে সত্ত্বগুণময় হইয়া থাকে। চিত্তের অবিশুদ্ধি হেতু, দুষ্কৃতিসম্পন্ন পূর্ব্বকর্ম্মফল হেতু, কুভাব সম্পন্ন প্রারব্ধ হেতু, যখন মানবের মনাদির বৃত্তিগুলি জ্ঞানের তত্ত্ব না বুঝিয়া কেবল যথেচ্ছভোগের দিকে ধাবিত হয়, তখনই সেই মানবশ্রেণীকে তমোভাবময় বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই অবস্থায় হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া, আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও মৈথুন এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যাদির আক্রমণে মানবে নিয়ত আক্রান্ত হইয়া বারম্বার দুঃখভোগকেই সুখ বোধ করিয়া, যথেচ্ছাচারী হইয়া থাকে। যাহাতে জ্ঞান উদিত হয়, যাহাতে পবিত্র হওয়া যায়; যাহাতে বিষয় ভোগজনিত আসক্তি ক্ষয় হয় যাহাতে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, এরূপ পবিত্র কার্য্যে নিষ্ঠার উদয় হয় না। এই লক্ষণ সমূহ দ্বারা যখন মানবে ভূষিত দেখা যায়,

তখনই তাহারা তমোগুণময় ইহা অবধারণ করিতে হইবে। এই অবস্থায় সর্ব্বদাই দুঃখের দিকে প্রবৃত্তির গতি থাকাতে সুখের দিকে চেষ্টা হয় না। সুখ ও দুঃখ বুঝিতে পারা যায়, অথচ তাহাতে চেষ্টা হয় না কেন? তদ্বিষয়ে শাস্ত্রজ্ঞেরা কহিয়াছেন, শ্রদ্ধা নামে একটি প্রধান বৃত্তির বিকাশ না হওয়াতে, তাহাদের সুখের জন্য স্পৃহা হয় না। যেমন অতিরুগ্ন যুবকের সম্মুখে যুবতী থাকিলে ভোগে স্পৃহা হয় না। অরুচি রোগাক্রান্তের সম্মুখে স্বাদু আহারীয় থাকিলে ভোজনে স্পৃহা হয় না। সেইরূপ মানবের তামস্ রোগ সমাচ্ছন্ন প্রকৃতি থাকিলে উন্নতির ইচ্ছা হয় না। অতএব তামস্ রোগ ক্ষয় করিয়া শুদ্ধিপথে আসিতে হইলে, প্রথমে শ্রদ্ধা নামে অপূর্ব্ব একটি বৃত্তির আবির্ভাব করিতে হইবে। শ্রদ্ধা কাহাকে বলে তদ্বিষয়ে বেদান্ত শাস্ত্র বলিতেছেন—

"গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা।"

অর্থঃ—বেদান্তাদি সমস্ত সিদ্ধ শাস্ত্র বাক্যে এবং শ্রীগুরুর আদেশে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে করিতে যে ফল লাভ হয়, তাহাকে শ্রদ্ধা কহে।" শ্রদ্ধার সহযোগে অনুষ্ঠান করিলেই উন্নত হওয়া যায়। তমোভাবে সেই শ্রদ্ধার আবির্ভাব হয় না। প্রথমে শ্রদ্ধা আবির্ভাব করা চাই; সেই শ্রদ্ধা কেমন করিয়া উৎপাদিত হয় তাহার ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান বুঝাইতে গুরুবাক্যে ও বেদ বেদান্তাদি সমস্ত শাস্ত্রের বিহিত উপদেশে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক তাহা ব্যবহার করিতে করিতে তৎফল লাভ হয়। এই শাস্ত্রকথিত উপায় সিদ্ধান্ত করিয়া, আচার্য্যগণ তমোগুণীর পক্ষে বলিয়াছেন যেঃ—বিশ্বাস প্রথমে স্থির হইলে তবে শ্রদ্ধার আবির্ভাব হয়। নিয়ত অনুশীলন করিতে করিতে উদ্দেশ্যের কিঞ্চিৎ ফলাস্বাদন হইলেই তাহাতে যে অকাট্য প্রতীতির নিশ্চয়তা উপস্থিত হয়, তাহাকে বিশ্বাস বলে। যেমন ইক্ষুখণ্ড চর্ব্বণে মিষ্ট রস লাভ হয়। চর্ব্বণাদি ক্রিয়াযোগে ইক্ষুখণ্ড ব্যবহারে যে ফললাভ হইল, সেই মিষ্ট বিষয়ে যে একান্ত নিশ্চয়তা, তাহাকেই তদ্বিষয়ী

বিশ্বাস কহে। সেই ইক্ষুরসকে পিত্তরোগাক্রান্ত ব্যক্তি তিক্ত বলিলেও কখন বিশ্বাসী ব্যক্তির ভ্রান্তি আসিবে না। এই প্রমাণে সকল বাধা, ব্যতিক্রম, সংসারের আসক্তি প্রভৃতি যাহা চিরাভ্যস্ত,যাহা দুঃখ হইলেও তমোগুণে সুখপূর্ণ বলিয়া চিরদিন ব্যবহৃত হইতেছে, সে অবস্থার উপরে অবিশ্বাস এবং নিত্য সুখস্বরূপ এক অবস্থা আসিতে পারে। এ বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে, যে সকল অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয়, তন্মধ্যে দেবতা, গুরু, বিপ্র ও সাধুভক্তের সেবাই প্রধান হইতেছে। যেমন ইক্ষু খণ্ডের আস্বাদনীয় মিষ্টতায় কেহ কখন অবিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে না, সেইরূপ ঐ সকল সেবা হইতে এমন একটি আস্বাদন বা প্রতীতির আবির্ভাব হয়, যাহা কিছুতে ক্ষয় হয় না। সেই প্রতীতি ক্রমে শ্রদ্ধাতে পরিণত হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা ব্যতিত কোন মানবেরই কোন প্রকার, ব্রত, নিয়ম, পূজা, যজ্ঞ এবং শাস্ত্রশ্রবণ বা তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার হয় না। অতএব তদুপার্জ্জনে বিশেষ যত্নবান হওয়া চাই।

কোন একটি অবস্থা যাহাকে শাস্ত্রাদি প্রধান ও পবিত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই অবস্থা হইতে প্রধানতা ও পবিত্রতা নিজ হৃদয়ে আবির্ভাব করাইতে, মন, জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় যোগে যে সকল অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে মুখ্য সেবা কহে। আহারাদির অভাব পূরণার্থ প্রভু প্রভৃতির সেবাকে গৌণ সেবা কহে। পূর্ব্বে যে মুখ্য সেবার কথা বলা হইল, তাহার তত্ত্ব বোধ করাই উপাসনাতত্ত্বের অঙ্গীভূত হইতেছে। দেবতা, গুরু, ও সাধু প্রভৃতির সন্তুষ্টি উৎপাদন করিতে কায়বাক্যমনের ব্যবহার করিলে, যে ফল লাভ হয়, তাহাকে বিশ্বাস কহে। সেই বিশ্বাসানুসারে গুরু ও শাস্ত্রবিহিত আচার ব্যবহার করিলে শ্রদ্ধার উদয় হয়। সর্ব্বাগ্রে গুরু সেবার ফল বুঝান হউক; পরে দেবতা ও সাধুভক্তের সেবনফল বুঝান হইবে। মনে গুরু-মূর্ত্তি চিন্তন, জ্ঞানেন্দ্রিয়ে তাঁহার রূপ দর্শন, তাঁহার চরণ স্পর্শন, তাঁহার উচ্ছিষ্ট আস্বাদন; তাঁহার নির্ম্মাল্য আঘ্রাণ, তন্নাম শ্রবণাদিকে

মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় গত সেবন কহে। বাক্যে গুরুগুণ কথন, করে চরণ সেবন, আয়োজন করণ ও অঞ্জলি ধারণ, ছায়া পর্য্যন্ত পদে স্পর্শ না করণ ইত্যাদি কার্য্যকে কর্ম্মেন্দ্রিয় যোগে গুরুসেবা কহে। এই সকল কার্য্যে কি লাভ হয় এবং গুরু কে? ইহা নিশ্চয় করা চাই। নিশ্চয় হইলেই বিশ্বাস মূলীভূত হইবে। কিরূপ ব্যক্তিকে শাস্ত্র গুরুপদে বাচ্য করিয়াছেন তদ্বিষয়ে শাস্ত্র বলিতেছেনঃ—

"শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ শুচির্দ্দক্ষঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ সুবুদ্ধিমান্॥
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ, মন্ত্রতন্ত্র বিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥"

অর্থঃ—যিনি পরিপূর্ণ বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয়কে সংযত করিয়াছেন, যিনি সৎকুল সম্ভব, বিনীত, শুদ্ধবেশধারী, শুদ্ধাচারী, পবিত্রতায় পূর্ণ, সকল ধর্ম্ম কার্য্যে পটু হয়েন, যাঁহাকে দর্শন মাত্রেই ভক্তির উদয় হয়, যিনি সুবুদ্ধিমান্, যিনি আশ্রমী, মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতিতে বিশারদ ও সর্ব্বদা ভগবদ্ধ্যান পরায়ণ হয়েন, বিশেষতঃ যিনি শিষ্যকে কুপথে যাইতে দেখিলে তাহার নিগ্রহ অর্থাৎ শাসন এবং সুপথে যাইতে দেখিলে অনুগ্রহ করিতে সক্ষম; তাহাকে গুরুপদে বাচ্য করা যায়।

গুরু উপাধির অর্থঃ—আগমসার তন্ত্র বলিয়াছেনঃ—

"গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তোরেফঃ পাপস্য দাহকঃ।
উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্তঃ ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ পরঃ॥"

তথা শ্রীক্রম তন্ত্রেঃ—গকারাজ্‌জ্ঞান সম্পত্তিঃ রেফস্তত্ত্বপ্রকাশকঃ।
উকারাচ্ছিবতাদাত্ম্যং দদ্যাদিতি গুরুঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থঃ—গকার শব্দে সিদ্ধিদাতাকে বুঝায়, রেফ দ্বারা পাপহানী কার্য্য বুঝায়; উকার দ্বারা শম্ভু অর্থাৎ সকল মঙ্গলের আকর বুঝায়। যিনি পাপক্ষয় করিয়া, সকল সিদ্ধির উদয় করাইয়া, পরম মঙ্গল বিধান করাইতে পারেন, এমন কার্য্যত্রয়ের পটুতাই গুরু শব্দের অর্থ হইতেছে। শ্রীক্রম তন্ত্রোক্ত শ্লোকের অর্থঃ—গকার বর্ণে জ্ঞানসম্পত্তি

বুঝায়, রকারে তত্ত্বপ্রকাশক ক্ষমতা বুঝায়, উকারে সমস্ত মঙ্গল বুঝায়। যিনি জ্ঞানবলে তত্ত্ববিদ্যা শিষ্যের হৃদয়ে উদয় করাইয়া সকল মঙ্গল বিধান করেন, যিনি এই তত্ত্বত্রয় দানে সক্ষম, তিনিই, গুরু শব্দের অর্থোপযুক্ত ব্যক্তি হইতেছেন।

এই যে গুরুপদের অধিকারীর অবস্থা এবং গুরু শব্দের অর্থ দেখান হইল, ইহাতে এমন একটি মনুষ্যমূর্ত্তি বুঝাইল যে, যাঁহার অন্তর ও বাহির পবিত্র, যাঁহার চিত্ত ভগবৎবিষয়ে একান্ত প্রসন্ন, যাঁহার বুদ্ধি অতি বিমল, যাঁহার বাহ্য ও অন্তরের কোন ইন্দ্রিয়ই বিষয়ভোগে আসক্ত নহে। অথচ তিনি আশ্রমী এবং তিনি এমন ক্ষমতা ধরেন, যাহাতে দিবানিশি অন্তরে ভগবদ্বস্তুকে ধ্যান করাতে, সেই ভগবদ্ভাব শিষ্যের হৃদয়ে প্রবেশ করাইতে পারেন। আপনার ঐশী ক্ষমতায় উপযুক্ত শিষ্যকে অনুগ্রহ এবং উৎপথগামী শিষ্যকে শাসন করিতে পারেন। এইরূপ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির সেবা অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় যোগে তাহার আলোচনা এবং তাহার তুষ্টি উৎপাদনের চেষ্টায় নিরত থাকিলে তমোগুণী হইতে সত্ত্বগুণী সকলের হৃদয়ে পবিত্রতার উদয় হইয়া থাকে।

অনেকের সন্দেহ হইতে পারে, গুরু মন্ত্র দান করিলেন, তাঁহার উপদেশ শুনিলেই যথেষ্ট হইল, জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় যোগে তাঁহার সেবার প্রয়োজন কি? তত্ত্বাবৎ পণ্ডিতগণে বলেন :—কোন বস্তুর গুণ একান্ত হৃদগত করিতে হইলে, জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় সংযোগে তাহাকে অবধারণ করিতে হয়। যেমন কোন একটি যুবতীকে যদি কোন যুবক আত্ম সমর্পণ করে; কেমন করিয়া সে কার্য্যে ব্রতী হয়। ঐ কামিনীর রূপ, গুণ, লীলা ও সম্ভোগ জন্য রসাস্বাদন নিতান্ত জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় যোগে ব্যবহার করিলে, তবে যুবক কামিনীকে আত্মসমর্পণ করে। অধিক কি! একটি ফুলগাছ নিজে জন্মাইয়া তাহার পুষ্প প্রস্ফুটিত দেখিলে যত আদর করিতে ইচ্ছা করে, ক্রীত পুষ্পে তেমন আদর হয় না। লালন, পালন, প্রীণন, আলিঙ্গনাদি সহযোগে নিজপুত্রের প্রতি

পালনে সেই পুত্রের উপরে পিতা মাতার যত স্নেহের আবির্ভাব হয়; জন্মকাল হইতে পরপ্রতিপালিত পুত্রের উপরে সেরূপ স্নেহ হইতে পারে না। এমন কি! নিকটবর্ত্তী জ্যেষ্ঠ, মধ্যম, কনিষ্ঠাদি পুত্র থাকিতে শেষে কনিষ্ঠকে পালন করিতে হয় বলিয়া, পিতামাতার স্নেহ কনিষ্ঠের উপরে অধিক প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এই সকল প্রমাণে শাস্ত্র কহিয়াছেন, জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনাদির যোগে যে বস্তুর ব্যবহার করা যায়, তাহার সকল অবস্থাগুলি অন্তরে সংস্কারাবদ্ধ হইয়া যায়; অত্যন্ত অনুরাগবলে এমন সংস্কার হয় যে পূর্ব্বসিদ্ধি পর্য্যন্ত ক্ষয় হয়; শ্রীভরতনামে রাজর্ষির হরিণানুধ্যানবলে পূর্ব্বসিদ্ধি ক্ষয় ও হরিণ স্নেহসংস্কারে দেহত্যাগে তাঁহার হরিণজন্ম লাভ হইয়াছিল। এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্থির হইল যে, সেবা বিনা কোন বস্তুর অবস্থাকে সম্যক প্রকারে হৃদ্‌গত করা যায় না। এক্ষণে দেখা উচিত যে; জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ে গুরুকে লইয়া যে সকল ব্যবহার করা যায়, তাহার পরিণাম ফল কি? কর্ণে গুরুনাম, গুরুপ্রশংসা ইত্যাদি শ্রবণ করিতে হয়। শাস্ত্র কহেন, কর্ণে কোন বিষয়ের পরিচয় সূচক শব্দ শুনিতে শুনিতে তদ্দর্শনে স্পৃহা জন্মাইয়া থাকে। এই জন্য কর্ণই অনুরাগ জন্মাইবার প্রথম দ্বার হইতেছে। ঐ গুরুপ্রশংসা শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাঁহার মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা হয়। সেই মূর্ত্তি দর্শন চক্ষুর ক্রিয়া। দৃষ্টি শক্তিতে এমন একটি ক্ষমতা আছে যে, আমি যাহা শুনিয়া মনে স্থির করিয়াছি, সেই বস্তুকে দেখিয়া আমার সংকল্পের পূর্ণতা হইবে কি না, ইহা বুঝিতে পারা যায়। প্রথমে গুরুর প্রশংসা শব্দ ও কৃতীত্ব জ্ঞাপক কথাগুলি শুনিয়া, আমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিব এই ইচ্ছায় যেমন গুরু মূর্ত্তি দর্শন করিলাম; অমনি তাঁহার মূর্ত্তিতে যদি জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমমাখা লাবণ্য থাকে, তাহা হইলে আমি দর্শনমাত্রেই মুগ্ধ হইলাম। যেমন কামুক ব্যক্তি তাহার অভিলষিত কামিনী দর্শনে চরিতার্থ হয়। ক্ষুধিত ব্যক্তি স্বাদু আহার দেখিলে তৃপ্ত হয়। পিপাসিত ব্যক্তি সুশীতল বারি দেখিলে শান্ত হয়। ক্ষুধিতকে জল দেখাইলে সন্তুষ্ট

হয় না, কামুককে ক্রোধ দেখাইলে সন্তুষ্ট হয় না। সেইরূপ যে শিষ্যের গুরুপ্রশংসা শ্রবণে আত্মোন্নতি করিতে ইচ্ছা হয়, সে ব্যক্তিই পূর্ব্বোক্ত গুরুমূর্ত্তি দর্শনে সুখী হইয়া থাকে। আমার তত্ত্বজ্ঞানে ইচ্ছা নাই এবং গুরুও পূর্ব্বোক্ত গুণমূর্ত্তিময় নহেন, এ অবস্থায় যদি গুরু ও শিষ্যত্ব ব্যবহারিক সম্বন্ধ ঘটে, তবে তাহাতে পরস্পরের কোন উপকার ঘটে না। এই জন্য নবরত্নেশ্বরতন্ত্রে শিষ্যের লক্ষণ বলিয়াছেনঃ—

"শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতী॥
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা।
গুরুতা শিষ্যতা বাপি তয়োঃ সংবৎসরবাসতঃ॥"

অর্থঃ—যে ব্যক্তি উদ্ধত স্বভাব ত্যাগ করিয়াছে, বিনীত হইয়াছে, মনকে পাপাসক্তি হইতে বিরত করিতে সক্ষম হইয়াছে, শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয় করিয়াছে, গুরুর উপদেশ ধারণে এবং তদুপদিষ্ট কার্য্যে সক্ষম হইয়াছে; বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্রশালী ও সদাসন্তুষ্ট হইয়াছে; এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তিই শিষ্যের উপযুক্ত হইতেছে। গুরু এবং শিষ্য একত্রে এক বৎসর কাল বাস করিয়া পরস্পরে পরস্পরকে পরীক্ষায় স্থির করিলে, তবে উভয়ে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ নিশ্চয় হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত গুণ সমূহ একেবারে শিষ্যের আসেনা। গুরুসেবা করিতে করিতে বৎসরকাল মধ্যে যদি ঐ সকল গুণ তাহার শরীরে আবেশ হয়, তবেই তমোগুণক্ষয়ে রজঃ ও সত্বের বিকাশ হইল বুঝিতে হইবে। সেই অবস্থায় গুরু তাহাকে শিষ্যপদে বাচ্য করিয়া মন্ত্রাভিষিক্ত করিবেন। অন্যথা কোন গুণই দর্শাইবে না। শিষ্যের হৃদয় পবিত্র ও বিশ্বাস মূলীভূত না হইলে, উষর ভূমিতে বীজক্ষেপের ন্যায় গুরুর মন্ত্রদান ব্যর্থ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সমাজে এইরূপ ঘটনা হওয়াতেই আমাদের এত দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। গুরুসেবায় শিষ্যের পবিত্রতা কেমন করিয়া উপস্থিত হয়, তাহার প্রমাণ করা হইতেছে। কর্ণে গুরুপ্রশংসা ও তাঁহার ক্ষমতাবীর্য্যের এবং গুণের কাহিনী শুনিলে, মন তাঁহার

সঙ্গের ইচ্ছা করে, তাহাতে শিষ্যের আত্মজ্ঞানে অভিলাষ বা অনুরাগের উদ্রেক হয়। চক্ষে সেই মূর্ত্তি দেখিলে পবিত্রতার বৃদ্ধি হয়। চক্ষে রূপ দেখিলে পবিত্রতার বৃদ্ধি হয়, একথা শুনিলে অনেকে হয়তো বিস্মিত হইতে পারেন।! তাঁহাদের প্রতীতির জন্য বলা হইতেছেঃ—আমরা যখন কামপূর্ণা মূর্ত্তি দেখিলে কামী হই; ভয়পূর্ণা মূর্ত্তি দেখিলে ভীত হই; ঘৃণার্হা মূর্ত্তি দেখিলে ঘৃণা করিয়া থাকি; শোকাচ্ছন্না-মূর্ত্তি দেখিলে করুণায় আর্দ্র হই; তখন যে মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ শান্তি ও পবিত্রতার লাবণ্য বিকসিত হইতেছে; তাঁহাকে দেখিলে পবিত্র ও শান্তিতে পূর্ণ হইব না? ইহা কোন্ ব্যক্তি বলিতে সাহসী হয়েন। অতএব পবিত্র গুরুর শান্তিপূর্ণা মূর্ত্তি দর্শনে হৃদয়ে পবিত্রতার আবির্ভাব হয়, ইহা প্রমাণিত হইল। পরে নাসাদ্বারা গুরুর অঙ্গ বা চরণ আঘ্রাণ করিতে হয়। তাহাতেও পবিত্রতার আবির্ভাব হইয়া থাকে। অনেকে ইহাতে সন্দেহ করিতে পারেন। আমরা পুষ্পের আঘ্রাণে মুগ্ধ হই, পুত্রের মস্তকাঘ্রাণে স্নেহে পূর্ণ হইয়া থাকি, কামিনীর আঘ্রাণে কাম্যসুখ লাভ করি, এমন কি পশুর মধ্যে গাভী প্রভৃতি আঘ্রাণ যোগেই আপনাপন শিশু স্থির করিয়া দুগ্ধাদি পান করাইতে স্নেহে উন্মত্ত হইয়া থাকে। যেমন ব্যাঘ্রের গন্ধ ব্যাঘ্র জানিতে পারে না, সেইরূপ আমাদের স্বজাতীয় অঙ্গগন্ধ আমরা প্রকাশ্য অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু আঘ্রাণবলে আমাদের রসের অনুভব হইয়া থাকে সেইরূপ গুরুর বা ভক্তের অঙ্গ ও চরণাঘ্রাণ জনিত ক্রিয়া হইতে আমাদের পবিত্র রসের আবির্ভাব হইয়া থাকে। রসনা দ্বারা গুরুর উচ্ছিষ্ট আহারীয় ও পানীয় রস আস্বাদন করিতে হয়। অনেকে হয়ত ইহাতেও সন্দেহ করিতে পারেন। আমাদের তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণে কহেনঃ—কুষ্ঠ, হাঁপানী প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে, যখন আমরা রোগাক্রান্ত হই, তাহাদের যে সকল রোগ বা গ্লানি, তাহা যখন আহারীয়ে মিশ্রিত হইয়া রোগোৎপাদনে সমর্থ হয়, তখন যিনি জ্ঞানঘনমূর্ত্তি ধারণ

করিয়া অন্তরে পবিত্রগুণের সমাবেশ করিয়াছেন; তাঁহার উচ্ছিষ্ট ব্যবহারে গুণের আবেশ কেন না হইবে? অনেকে হয়তো সন্দেহ করিতে.পারেন, রোগে দূষিত ধাতু, শ্বাসপ্রশ্বাসে এবং মুখস্থ রসে মণ্ডিত থাকাতে উচ্ছিষ্টে রোগোৎপাদন হয়। গুণের লক্ষণে গুণ কেমন করিয়া ঐ সকল অবস্থায় বিকাশ হয়?? ইহা আমরা দেখিতে পাই যে, রোগের সময়ে আমাদের অঙ্গের যেরূপ অন্তর ও বাহিরের পরিবর্ত্তন ঘটে, সেই পরিবর্ত্তনের সহিত ধীরের ধৈর্য্য ক্ষয় হয়, শান্ত অশান্ত হয়, মিষ্টভাষী রুক্ষভাষী হয়, স্নেহবানের স্নেহ ক্ষয় হয়, কামুকের কামে স্পৃহা থাকে না, লোভীর লোভ কার্য্যকরী হয় না। একা ধাতুর বিপর্য্যয়ে এতগুলি দোষ আসিল। সেই ধাতু যখন প্রকৃতিস্থ হয়, তখন ধীরের ধৈর্য্য, শান্তের শান্তি, মিষ্টভাষীর প্রিয়বচন; স্নেহবানের স্নেহ ইত্যাদি প্রকৃতিস্থ ধাতুর সঙ্গে সঙ্গে শরীরে ও মনে দেখা দেয়। অতএব রোগের সঙ্গে দোষ ও শান্তির সঙ্গে অভ্রান্ত গুণীব্যক্তির গুণের বিকাশ হইয়া থাকে। দৌর্জ্জন্য পূর্ণ প্রকৃতি যাহার থাকে, তাহার রোগ সদা সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে। দুষ্কৃতিই রোগের কারণ। হয়তো অনেকে বলিতে পারেন ডাকাইত প্রভৃতি বলিষ্ঠ; তাহাদের রোগ কোথায়? অশান্তি, অভাব, চিরকলহরূপী-রোগ সর্ব্বদা তাহাদের অন্তরে বর্ত্তমান। গুণময় না হইলে শরীরের শান্তি বা লাবণ্যের বিকাস হয় না। অতি মূর্খ ও দুর্বৃত্ত ব্যক্তির মূর্ত্তিতে যে ভাব ও কান্তি দেখা যায়, সেই ব্যক্তিই আবার পণ্ডিত ও সাধু হইলে তাহার কান্তির নূতনতা ও কমনীয়তা প্রকাশ হইয়া থাকে। এই সকল প্রমাণে বিশেষ বুঝান হইল যে, দোষ সংস্পৃষ্ট ধাতু হইলে দেহকে রুগ্ন করে, গুণসংস্পৃষ্ট ধাতু হইলে দেহকে শান্তিভাবে উন্নীত করে। যেমন রুগ্নের উচ্ছিষ্ট দূষিত ধাতু মিশ্রণে, তদুচ্ছিষ্ট ব্যবহারকারী তত্তৎরোগে অধিকৃত হয়, সেইরূপ পবিত্রতাপূর্ণ ব্যক্তির উচ্ছিষ্টে গুণপূর্ণ ধাতু মিশ্রণ থাকাতে তদ্ব্যবহারে তত্তৎগুণের অধিকার হইয়া থাকে। অতএব প্রকৃত সাধু, গুরু ও ভক্তের উচ্ছিষ্ট ব্যবহারে তদুচিত গুণের লাভ

হইয়া থাকে ইহা প্রমাণিত হইল। গুরু চরণ ও দেহস্পর্শে আমাদের পবিত্রতা উপস্থিত হয়। যেমন উলাউঠা প্রভৃতি সংক্রামক রোগী স্পর্শে আমাদের রোগ সংক্রামিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পবিত্র দেহ স্পর্শে পবিত্রতার আবির্ভাব হয়। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কহেন অন্তরের প্রকৃতি জাত তেজ চক্ষে,বাক্যে, করে ও চরণে প্রবাহিত হইয়া থাকে। যে অঙ্গ সর্ব্বদা ব্যবহার হয়, তেজ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শক্তি সেই স্থল বা প্রণালী দিয়া সতত নির্গত হয়। সেই জন্য একজন ব্যক্তির ক্রোধ হইলে তাহার চক্ষে, বাক্যে, করে ও পদে ক্রোধের চিহ্ন সমস্ত লক্ষিত হয়। এই জন্য পবিত্র ও গুরুজনের চক্ষুদ্বারা কৃপাদর্শন করেন, তাহাতে আমাদের মঙ্গল হয়। বাক্যে উপদেশ দানে আমাদের মঙ্গল হয়। করে আশীর্ব্বাদ করিলে, আমাদের শরীরে পবিত্রতা প্রবেশ করে। চরণস্পর্শে বা চরণের প্রক্ষালন বারিতে অন্তরের অধ্যাত্মশক্তির প্রবেশ হওয়াতে, তৎপানে পবিত্র হওয়া যায়। অনেকে হয়তো মনে করিতে পারেন, অঙ্গেই অধ্যাত্মশক্তির বিকাশ হইল,তদ্ব্যবহারে তচ্ছক্তির সমাবেশ সম্ভব, কিন্তু সেই ব্যক্তির একাঙ্গ বা সর্ব্বাঙ্গ জলাদিতে স্পৃষ্ট হইলে তদ্গুণ জলে কেমন করিয়া উপস্থিত হইতে পারে? আমরা পূর্ব্ব প্রমাণে দেখি যে, আমাদের সর্ব্বাঙ্গ তাপিত হইলে, পদে, চক্ষে ও মুখে বারি প্রদান করিলে শান্তি লাভ করিয়া থাকি। সর্ব্বাঙ্গে বারি সিঞ্চনে শান্ত হইতেই হয়, আবার সময়ে সময়ে কুফলও ঘটে। পদাদিতে বারি স্পর্শ মাত্রে জলের গুণ অঙ্গে প্রবেশ করিল, অঙ্গের দোষ বা গুণ জলে প্রবেশ করিল, কারণ শরীরের ধাতু, গুণ বা দোষ সংযুক্ত এ প্রমাণ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। এইজন্য আমরা রুগ্ন বা নীচ জাতীয়ের স্পৃষ্ট জল বা অন্ন স্পর্শ বা ব্যবহার করি না। এই সকল গুণপূর্ণ জল, স্নানবারি বা চরণোদক প্রভৃতি পবিত্র হইবার জন্য ব্যবহার করি। আমাদের দার্শনিকেরা যাহাকে অধ্যাত্মশক্তি অর্থাৎ গুণদোষে সম্পৃক্ত অন্তরের ধাতু শক্তি কহেন, পাশ্চাত্য ভাষায় তাহারই নাম (Electricity) অর্থাৎ তাড়িত হইতেছে। এইতো গেল জ্ঞান ও মনাদি সহযোগে

গুরুসেবা করিয়া তদ্‌গুণ লাভ করিবার উপায় প্রণালী। এক্ষণে কর্ম্মেন্দ্রিয় যোগে গুরুসেবার উপকারীতা বুঝা যাউক। সর্ব্ব কর্ম্মেন্দ্রিয়ে গুরুর অভাব পূরণ ও অঙ্গসেবনাদিতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পবিত্রতা অধিকার করে। অতএব জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনাদি সহযোগে, গুরু সেবায় যেমন পবিত্রতা লাভ হয়, সাধুভক্তাদির সেবায়ও তদ্রূপ শুভ ফল লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণ সেবার উক্তরূপ পবিত্রতা লাভ কেমন করিয়া হয়, তাহা দেখা যাউক। বর্ত্তমান দ্বিজশ্রেণীর হীনাবস্থা দেখিয়া একেবারে ব্রাহ্মণ জাতির উপরে অশ্রদ্ধা সম্পন্ন হওয়া উচিত হয় না, কারণ সৌরভান্বিত পুষ্প মলিন হইলেও তাহার কিছু না কিছু সৌরভ লাভ হয়। তবে ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম ও গায়ত্রী—সন্ধ্যাদি বর্জ্জিত অথচ উপবীতধারী ব্রাহ্মণের সেবা করিতে শাস্ত্র সর্ব্বদা নিষেধ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের দ্বিজবন্ধু এই উপাধি দিয়া স্ত্রীশূদ্রাদির সমান পদবীতে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনা নিস্প্রয়োজন বিধায় প্রকৃত ব্রাহ্মণতত্ত্ব বলা হইতেছে। প্রকৃত ব্রাহ্মণের পরিচয় মহর্ষি মনু বলিতেছেনঃ—

"উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।
স হি ধর্ম্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্প্যতে ॥
ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথীব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে ॥"

অর্থঃ—ব্রাহ্মণ জন্ম মাত্রেই ধর্ম্মের পবিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি ধর্ম্মের পালন জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়া, শেষে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই জন্য ব্রাহ্মণ জন্মমাত্রেই পৃথিবীর সকল জন্য প্রাণীবর্গের শ্রেষ্ঠ হইতেছেন। ধর্ম্মকোষ তিনি অন্তরে রক্ষা করেন বলিয়া, তিনিই সকল প্রাণীবর্গের কল্যাণ বিধাতা ঈশ্বর স্বরূপ হইতেছেন।" বিষয়ভোগ করিব, বড় লোক হইব, গাড়ি, জুড়ী চড়িব, ইহার জন্য ব্রাহ্মণ জগতের শ্রেষ্ঠ হয়েন নাই। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের মূর্ত্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করতঃ নিজ জীবনে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, জীবকে ধর্ম্ম

শিক্ষা দিয়া অন্তে মুক্ত হইয়া থাকেন। আর সংসারে জন্ম লয়েন না।. এইরূপ পবিত্র কর্ম্ম ও জন্মবিশুদ্ধ মূর্ত্তির জন্য ব্রাহ্মণ সকলের পূজনীয় হইয়াছেন। যে ব্রাহ্মণের শরীরে কোন অংশেও সদ্‌গুণ বিরাজমান্ তিঁনিই পূজনীয়। এস্থলে সদ্‌গুণ বলিতে ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শিতা বুঝিতে হইবে। এইরূপ পবিত্রা মূর্ত্তিধারী ব্রাহ্মণের সেবা-তেও পবিত্রতা উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা উপাসনা তত্ত্বে প্রথমে দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতার উপায় নির্দ্দেশ করিতে এবং শ্রদ্ধার আবির্ভাব করাইতে তমোগুণীর পক্ষে যে, গুরু, ব্রাহ্মণ, ভক্ত প্রভৃতির সেবাই প্রসস্ত, একথা বলিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিলাম।

এক্ষণে অনেকের সন্দেহ হইতে পারে ঃ—গুরু, ব্রাহ্মণ, ভক্ত ও সাধু প্রভৃতি সজীব ব্যক্তি, উঁহাদের অন্তরে জীবন্ত গুণ বর্ত্তমান, কাযেই তাঁহাদের সেবায় অন্তরে সদ্‌গুণ আসিতে পারে।. দেবতা গঠিত মূর্ত্তি মাত্র, তচ্ছেবায় কেমন করিয়া দেবভাব হৃদ্‌গত হইবে? এক্ষণে দেখা উচিত, দেবতার সেবা কেমন করিয়া হয়। দেবতার নৈবেদ্যাদি ও পানীয়াদিব আয়োজন, তত্তুষ্টির জন্য পুষ্পাদির আহরণ, স্থান মার্জ্জন, প্রণাম করণ ইত্যাদি. দ্বারা দেবপক্ষে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যবহার হইযা থাকে। তল্লীলা শ্রবণ, তদ্রূপ দর্শন, তদ্ভাবাঘ্রাণ, তদ্ভাব স্পর্শন; তৎপ্রসাদ আস্বাদন ইত্যাদিকে দেবপক্ষে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যবহাব কহে। তদ্বীর্য্য চিন্তন এবং আত্মসমর্পণাদিকে দেবতাপক্ষে মনের ব্যবহর বলা যায়। সকল গুলিই বুঝা যাইবে, যদি 'নির্জ্জীব অবস্থা হইতে আমরা গুণের আবিষ্কার করিয়া তদ্‌গ্রহণে সক্ষম হই!! এই নির্জ্জীব কথাটি দেবতা কেন, কোন প্রতিমাতেই খাটিতে পারে না। যাহা কখন সজীব ছিল, কালে জীবত্ব ক্ষয় হইলে তাহাকে নির্জ্জীব কহে। কোন প্রতিমাই কোন কালে সজীব ছিলনা, এই জন্য নির্জ্জীব হইতে পারে না। দর্শনশাস্ত্রকারেরা কহেনঃ—মূর্ত্তি দ্বিবিধা হইতেছে। একটির নাম ভাবজ্ঞাপিকা। দ্বিতীয়ার নাম ক্রিয়াজ্ঞাপিকা। ভাব-

গুলি চিরদিন চৈতন্যপূর্ণ, যে পদার্থেই ভাব প্রতিফলিত হউক না কেন, তচ্চিন্তন মাত্রেই পদার্থে যে রসসঞ্জাত ভাব থাকিবে, চিন্তাকারীর মনে সেই ভাব উদ্দীপিত হইবেই হইবে। সেই ভাব জীবন্ত দেহে ক্রিয়ায় পরিণত হইলে, যে মূর্ত্তির বিকাস হয়, তাহাকে ক্রিয়াজ্ঞাপিকা কহে। দেহ লয়ে ক্রিয়া ক্ষয় হইয়া যায়। এই জন্য দার্শনিকেরা কহিয়াছেন ভাবের কখন ক্ষয় হয় না। সর্ব্বদা স্ববীর্য্য জ্ঞাপনে নিরত থাকে। সেই ভাবময়ী মূর্ত্তির নামই প্রতিমা হইতেছে। যে সকল ঐশবীর্য্য ও লীলা দেবমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছে, তচ্ছ্রবণে সেই বীর্য্য ও লীলাজাত ভাবগুলি অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, সেই সেই রসে আমাদের মনকে তন্ময় করিয়া থাকে। অতএব দেব ও দেবীর সেবায় মনের জড়তা ক্ষয়ে, প্রকৃত শ্রদ্ধার আবির্ভাব হয়, ইহা নিশ্চয় হইল।

যখন দেবতা, গুরু ও ভক্তাদির সেবায় আমাদের তমোগুণ জাত অবিশ্বাস ক্ষয়ে কল্যাণ অনুভব করিয়া আমরা বিশ্বাসী হইয়া পড়ি, তখনই শ্রদ্ধা নামে একটি অবস্থা আমাদের আসিয়া উপস্থিত হয়। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে আমরা একটু উন্নত হই। এই অবস্থায় জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সহিত মনের বিশেষ চিন্তনাদি কার্য্যের উপদেশ শাস্ত্র দিয়া থাকেন। এই অবস্থায় গুরুকে দেবময় এবং আপনাকে দেবময় ভাবিতে হয়। গুরুকে দেবময় ভাবিলে, দেববীর্য্য সমস্ত গুরুতে বর্ত্তমান বুঝায় এবং গুরু সেবায় গুরুবস্তুকে হৃদ্গত পূর্ব্বে করা হইয়াছে বলিয়া, গুরুর অন্তর দিয়া দেবভাব অন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। যেমন কোন মিষ্ট আস্বাদনের মধ্যদিয়া রোগ হানিকর কোন ঔষধি রস প্রয়োগ করিলে, মিষ্টের লোভে পান করিয়া, ঔষধের গুণে শিশু রোগহীন হয়, তদ্রূপ গুরুবীর্য্যের অন্তর্গত করিয়া দেববীর্য্যকে চিন্তা করিলে, দেবভাব সহজে হৃদ্গত হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ গুরুদেবতা প্রভৃতিকে জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনে সেবা করিতে হয়। শ্রদ্ধা হইলে চিত্তস্থলে ঐ দেব ভাবীয় গুরু প্রথমে ভাবিতে হয়, তাহাতে সক্ষম হইলে প্রকৃত

দেববীর্য্যকে ভাবিবার ক্ষমতা লাভ হইয়া থাকে। এই চিন্তা প্রথমে হৃদয়ে, পরে ভ্রূযুগলের মধ্যে দ্বিদল কমলে বা বুদ্ধির স্থানে, পরে ব্রহ্মরন্ধ্রের মধ্যবর্ত্তী সহস্রদল কমলে বা চিত্ত স্থানে স্থির করা উচিত হইতেছে। সকল অবস্থায় গুরুকে কি ভাবে ভাবিতে হয় তাহা তাহা বলা হইতেছে। গুরুকবচ বর্ণনায় জগতের সকল শক্তি ও দেবতাকে গুরু বলিয়া শাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন। আমরা গুরুকে সধারণতঃ যে ভাবে উপাসনা করিয়া থাকি,তাহারই পরিচয় আবশ্যক, অতি বিস্তৃত গুরুতত্ত্ব এস্থানে প্রকাশ নিস্প্রয়োজন হইতেছে। আমরা সম্ভবতঃ চতুর্ব্বিধ গুরুর পূজা ও ধ্যান করিয়া থাকি। প্রথম গুরু, দ্বিতীয় পরম গুরু, তৃতীয় পরাৎপর গুরু এবং চতুর্থ পরমেষ্টি গুরু হইতেছেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুরু মনুষ্যমূর্ত্তি সম্পন্ন, গুণ ও কার্য্যভেদে তাহাদের শ্রেষ্ঠ সম্মান হইয়াছে। যিনি বীজমন্ত্র প্রদান করেন তিনি গুরু; যিনি মন্ত্র চৈতন্য সহযোগে সেই বীজ হইতে আত্মজ্ঞান নির্দ্দেশ করেন, তিনি পরম গুরু; যিনি সকল পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া আত্মস্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাকে পরাৎপর গুরু কহে। গুরু ও দেবতাকে অভেদভাবে পরিণত করিয়া সহস্রার কমলে যে ধ্যানগম্য মূর্ত্তির চিন্তা করা যায; যিনি পরিপূর্ণ চিন্ময়ী মূর্ত্তিধারী, যাঁহাকে ধ্যান করিলে অন্তর্দ্দেহ চিন্ময় হইয়া যায, তাঁহাকে পরমেষ্টি গুরু কহে। মানবরূপী দীক্ষাগুরুর প্রণাম রুদ্রজামলতন্ত্র বলিতেছেন :—

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

অর্থ :—আমার ন্যায় অজ্ঞান তিমিরান্ধ ব্যক্তির দৃষ্টি যিনি জ্ঞানাঞ্জন শলাকা যোগে উন্মিলিত করিয়া দেন; সেই শ্রীগুরুকে আমি প্রণাম করি।

পরমগুরুর প্রণাম পক্ষে উক্ততন্ত্র বলিতেছেন :—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

অর্থঃ—অখণ্ড ও মণ্ডলাকার এই যে চরাচর, চৈতন্যরূপে যিনি ইহাতে ব্যাপ্ত আছেন, সেই অন্তর্যামী আত্মপদনী যাঁহা কর্তৃক দর্শিত হইল, এমন শ্রীগুরুদেবকে আমি প্রণাম করি। পরাৎপর গুরুর প্রণাম উক্ত তন্ত্র বলিতেছেনঃ—

"দেবতাদর্শনঞ্চ করুণাবরুণালয়ং।
সর্ব্বসিদ্ধি প্রদাতারং শ্রীগুরুম্প্রণামাম্যহং॥

অর্থঃ—যাহার কৃপায় সমস্ত দেবতাগণের দর্শন ঘটে, যিনি অসীম জলধির ন্যায় করুণাময়, যিনি বটাক্ষে সর্ব্ব সিদ্ধি দান করিতে পারেন, সেই শ্রীগুরুকে আমি প্রণাম করি। পরমেষ্ঠি গুরুর প্রণাম বিষয়ে উক্ত তন্ত্র বলিতেছেন ঃ—

'বরাভয়কর নিত্যং শ্বেতপদ্ম নিবাসিনং
মহাভয়নিহন্তারং গুরুং বন্দে নমাম্যহং'

অর্থ—যিনি সহস্রার কমলরূপী শ্বেতপদ্মে অর্থাৎ চিত্তাকাশে সদা সর্ব্বদা বাস করেন, সর্ব্বকামনাপ্রদ বরকরে যিনি একটি হস্ত ধারণ করিয়াছেন। মুক্তি প্রদান করিতে যিনি অন্য হস্ত ধারণ করেন যাঁহার কৃপায় মহাভয়রূপ ভব নষ্ট হইয়া যায় এবম্বিধ শ্রীগুরুকে প্রণাম করি।

এই যে অনাময়ী মতিমান্ চৈতন্যকান্তি পরমেষ্ঠি গুরু, এই মূর্ত্তি চিন্তায় সর্ব্বদা চৈতন্যস্বভাব বিকাশ হইয়া থাকে। তাঁহার ধ্যান ও পূজা, ইত্যাদি আছে। তাঁহার ধ্যান সম্প্রদায় ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত এই তিন সম্প্রদায়ই আমাদের দেশে প্রবল হইতেছে। তন্মধ্যে সকল সম্প্রদায়ই পূর্ব্বোক্ত গুরুত্রয় এক ভাবে ভাবনা করেন ও প্রণাম করেন। কেবল পরমেষ্ঠি গুরুর প্রণাম এক, কিন্তু ধ্যান পৃথক হইয়া থাকে। বৈষ্ণবেরা উক্ত গুরুকে এই রূপে ধ্যান করেন ঃ—যথা বৈষ্ণবামৃতেঃ—

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় প্রাতঃকৃত্যং সমাপয়িত্বা সহস্রদলকমল কর্ণিকান্তর্গতং শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং বরাভয়করং শ্বেতমাল্যানুলেপনং

স্বপ্রকাশস্বরূপং স্ববামস্থিতয়া স্বপ্রকাশ স্বরূপয়া শক্ত্যা সহিতং শ্রীগুরুং ধ্যায়েৎ ॥”

অর্থঃ—বৈষ্ণব সাধক ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ সূর্য্যোদয় কালে গাত্রো-খান করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, আপন ব্রহ্মমূর্দ্ধাগত সহস্রার কমলের কর্ণিকা মধ্যবর্ত্তী পরমেষ্টি গুরুকে এই রূপে ধ্যান করিবে ঃ—তিনি যেন শ্বেতজ্যোতির্ম্ময়, তিনি বরাভয়রূপী যুগল কর ধারণ করিয়াছেন। শ্বেত মাল্যচন্দনে সুশোভিত আছেন। চৈতন্যমূর্ত্তিমান্ হইয়া আপনি বিকাস হইয়া আছেন ; নিজবামে চৈতন্যময়ী স্বপ্রকাশ রূপীনি শক্তি শোভিতা আছেন ; এবম্বিধ রূপাত্মক গুরুকে ধ্যান করিবে।” শাক্ত ও শৈব একই ভাবে এই গুরুর ধ্যান করেন। তাঁহাদের উপযুক্ত ধ্যান কঙ্কালমালিনী তন্ত্র বলিতেছেন ঃ—

“সহস্রদলপদ্মস্থং অন্তরাত্মানমুজ্জ্বলং।
তস্যোপরি নাদবিন্দোর্ম ধ্যে সিংহাসনোজ্জ্বলে ॥
তত্র নিজগুরুং নিত্যং রজতাচল সন্নিভং।
বীরাসনসমাসীনং সর্ব্বাভরণ ভূষিতং ॥
শুক্লমাল্যাম্বরধরং বরদাভয়পানিনং।
বামোরুশক্তিসহিতং কারুণ্যেনাবলোকিতং ॥
আত্মোপলব্ধি বিষয়ং তেজসা শুক্লবাসসং।
জ্ঞানানন্দসমাযুক্তং স্মরেত্তন্নাম পূর্ব্বকং।”

অর্থঃ—সহস্রদল কমলের অন্তর্গত নাদ ও বিন্দুর মধ্যে উজ্জ্বল সিংহাসনে অর্থাৎ পূর্ণচৈতন্যে যে উজ্জ্বল অন্তরাত্মা বর্ত্তমান আছেন। তাহার মধ্যে নিজ গুরুকে এই ভাবে চিন্তা করিতে হইবে ঃ—যিনি নিত্য, যিনি রজতপর্ব্বতের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়, যিনি সর্ব্বসিদ্ধিরূপী আভরণে ভূষিত হইয়া বীরাসনে উপবিষ্ট আছেন। যিনি শ্বেতমাল্য ও বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, বর ও অভয়রূপী যাঁহার যুগল হস্ত হইতেছে। যিনি পরম করুণাময়ী দৃষ্টি সংযুক্তা শক্তিকে বামোরুতে রক্ষা করিয়াছেন। যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞান রূপী নিজ তেজে বস্ত্রাদিকে শুক্ল

ভাবে ধারণ করিয়াছেন। যাঁহাতে সর্ব্বদা জ্ঞান ও আনন্দ বিরাজ করিতেছে। তাঁহাকেই "গুরু" এই নাম স্মরণ পুর্ব্বক ধ্যান করিবে।

এইরূপ গুরুধ্যান ও পূজার অধিকার শ্রদ্ধাবান্ হইলে হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত গুরুত্রয় সেবাদ্বারা মানবের শ্রদ্ধার আবেশ হয়। আমরা ক্রিয়ানুষ্ঠানতত্ত্বে উপাসনাব সুবিধা ও উন্নতি প্রমাণ কবিতে দেবগুরুবিপ্রাদির সেবা ও ধ্যানেব প্রয়োজন কি? তাহাব প্রমাণ করিলাম। ঘোব তমোগুণী ও রজোগুণীকে বিশুদ্ধ ও শ্রদ্ধাপব কবিতেই এই সকল কার্য্যের প্রযোজন। ইহা বিশেষ কবিয়া সংক্ষেপ বিবৃত্তি দ্বাবা বুঝান হইল। এক্ষণে তমোগুণেব বিশুদ্ধিব জন্য তীর্থ সেবা ও শ্রদ্ধাদিব প্রয়োজন কি? তাহা পরপ্রস্তাবে প্রমাণ করা হইবে।

অথ তীর্থ ও শ্রাদ্ধতত্ত্ব।

পূর্ব্বে যে তামস্ প্রকৃতিব বিশুদ্ধি কথা বুঝান হইযাছে, তন্মধ্যে তীর্থ ও শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মেও তাহাদেব চিত্তশুদ্ধি এবং শ্রদ্ধাব আবেশ হয, একথা বলা হইযাছে। এক্ষণে সেই তীর্থ ও শ্রাদ্ধের প্রযোজন কি? এবং কেমন কবিয়াই বা উহাদেব সাহায্যে তমোভাবাপন্ন জনেব সংস্কার ঘটে, তাহা প্রমাণ করা হইতেছে। প্রথমে তীর্থ কাহাকে বলে ইহা বুঝা উচিত হইতেছে। তীর্থ শব্দটি দুই অর্থে শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথম গৌণ, দ্বিতীয মুখ্য। তন্মধ্যে গৌণার্থে বাহ্য জাগতিক স্থান বিশেষকে বুঝায়; মুখ্যার্থে অন্তর্দ্দেহের স্থান বিশেষকে বুঝাইয়া থাকে। তৃ ধাতুর উত্তব থ প্রত্যয় করিয়া তীর্থ শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। তৃ ধাতুর অর্থ উদ্ধার হওয়া, পার হওয়া। মনকে যে স্থানে রাখিয়া বিশুদ্ধি ঘটাইতে পারিলে, ভবসংসারের পারে যাওয়া যায় বা পাপ হইতে

উদ্ধার হওয়া যায়, তাহাকে তীর্থ কহে। কাশী, গয়া প্রভৃতি যে সকল তীর্থ স্থান আমরা দেখিতে পাই, উহাদের বাহ্য তীর্থ কহে। মন ও বুদ্ধিচিত্তের শোধনের জন্যই তীর্থের আশ্রয় একথা বলা হইয়াছে কায়িক, বাচিক, মানসিক শুদ্ধি হয় বলিয়া উপাসনা তত্ত্বের মধ্যে তীর্থসেবাও ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্যে একটি প্রধান অঙ্গ হইতেছে। তীর্থ শব্দার্থে যে অর্থ প্রকাশ হইল, তৎসেবা যে আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। স্বয়ং ভগবান মানব সমাজকে জ্ঞান ধর্ম্ম ও প্রেমাদি শিক্ষা দিবার জন্য যে যে স্থলে অন্তরে ও বাহিরে আবির্ভাব হইয়াছেন ও হইয়া থাকেন, এতদ্ভব স্থানই তীর্থ বলিয়া গণ্য। ভগবান সাধকের চিন্তায় নিত্য আবির্ভাব হইয়া থাকেন, সে স্থান দেহান্তরে বর্ত্তমান আছে। সাধক সাধন বলে নিত্য সেই সেই অন্তরের স্থানে ভগবানের আবির্ভাব ঘটাইয়া থাকেন। এই সকল অন্তরের স্থানকে নিত্য তীর্থ কহে। ভারত সংসারে স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইয়া জগৎকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য যে যে স্থান পবিত্র করিয়াছেন, তাহাদের বাহ্যতীর্থ কহে। বাহ্যতীর্থ দুই উপায়ে গঠিত হয়। ভারত সংসারটি আমাদের সূক্ষ্মদেহের রূপক করিয়া পণ্ডিতগণে কোন কোন স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই রূপক বর্ণনায়, আমরা যে দিকে ভারতের মূর্ত্তি দর্শন করি, সেই দিকেই সূক্ষ্মদেহের পবিত্র স্থান গুলি দেখিতে পাই। ইহাতে বলা হইল যে:—দুই উপায়ে স্থূলতীর্থ গঠিত হইয়াছে। ভগবানের আবির্ভাব জনিত পবিত্র স্থানকে যে সকল তীর্থ কহে, তাহা দর্শনে, তথাকার ভগবদ্গুণ গাথা শ্রবণে, প্রাণ পবিত্র হইয়া থাকে। অনেকে হয় তো মনে করিতে পারেন, যদি ভগবান আবির্ভূত হইয়া থাকেন! তাহা বহুকালে হইয়াছে। যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ না হয় সে স্থান পবিত্র ছিল. তাঁহার তিরোভাবের পরে, সে স্থানের মহিমা কেমন করিয়া থাকিবে? তদুত্তর যথাঃ—দ্বিবিধ উপায়ে প্রাচীন স্মৃতি মানবের মনে উদয় হইয়া থাকে। সেই স্থানে যদি অতীত সত্যকীর্ত্তির কোন চিহ্ন থাকে, কিম্বা অতীত

ঘটনা যদি সে স্থানে উপস্থিত হইলে স্মরণ হয়। এই উভয় উপায় যোগে স্মৃতি ঘটিয়া থাকে। যেমন কোথাও ডাকাইতে মনুষ্য মারিয়াছিল, একথা সেখানে লেখা থাকিলে বা মৃত মানবদেহ দেখিলে, ভয় হইয়া থাকে, কিম্বা কেহ যদি কথায় ডাকাইতের ব্যবহার সেই স্থানে শুনায়, সেই স্মৃতিবলে সেই স্থানে উপস্থিত মাত্রেই ভয়ের উদয় হইয়া থাকে। আমরা তীর্থ ক্ষেত্রে যাইবার পূর্ব্বে তীর্থ মহিমা শ্রবণে, তীর্থাদি গমনের পূর্ব্বে শ্রাদ্ধ ও প্রায়শ্চিত্তাদি করণে মনে তীর্থের পবিত্র স্মৃতি অঙ্কিত করিয়া তথায় গমন করি। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বস্মৃতিবলে এবং তথাকার ভগবদাবির্ভাব জন্য দেবলীলা-চিহ্নাদি দর্শনে, আমাদের হৃদয়ে ভগবদ্বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়া যায়। যিনি প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা মনকে একাগ্র ও তীর্থ মহিমায় একান্ত ব্যাকুল না হইয়া তীর্থে গমন করেন, তাহার তীর্থফল লাভ হয় না। এ বিষয়ে যোগিনী তন্ত্র বলিতেছেন।—

> "ন তীর্থানি ন দানানি ন ব্রতানি ন চ শ্রমাঃ।
> দুষ্টাশয়ং দুষ্টমতিং পাবয়ন্তি কদাচন।"

অর্থঃ—যাহাদের চিত্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পবিত্রীকৃত না হইয়াছে, সেই সকল মানবের দুষ্ট বাসনা ও দুষ্টবুদ্ধি কখনই, তীর্থ, ব্রত, দান বা তপস্যা যোগে পবিত্র হইতে পারে না।

এই প্রমাণে শাস্ত্র একেবারে বিধান করিতেছেন, যে, বিশুদ্ধ সংকল্পিত হইয়া কোন কার্য্য না করিলে, অনুষ্ঠানেও তৎফল লাভ হয় না। যেমন ডাকাইত প্রভৃতির কথা পূর্ব্বে যদি স্মৃতিপথে না থাকিত, সে স্থানে উপস্থিত হইলে কখনই ডাকাইত জন্য ভয় হইত না। কোন মৃতদেহ দেখিলেও অন্য কারণে মৃত বলিয়া অনুমিত হইত। বাহ্য তীর্থ ত্রিবিধ পবিত্রতা উৎপাদন করে। যে স্থানটি তীর্থ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে স্থানে সতত ভগবৎকীর্ত্তি বর্ত্তমান। সুন্দর দৃশ্য, নদী,সরোবর ও প্রকৃতির শোভা বর্ত্তমান। সর্ব্বদা জ্ঞান ও প্রেমের আলোচনার জন্য শত শত সাধু ও জ্ঞানী বর্ত্তমান। সতত সে স্থানে দান

পুণ্যাদি কার্য্যই হইয়া থাকে। অতএব যে স্থানে উপস্থিত হইলে একাগ্রতা বলে জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি মনের সহিত প্রফুল্ল হয়, সে স্থানে কায়ার শান্তি ও মনের শান্তি লাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বদা সাধু ও দেব-সেবায়, দানপুণ্যাদি কার্য্যে মন ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি পবিত্র হয়। সর্ব্বদা জ্ঞানের আলোচনায় ও প্রেমালাপে বাক্যের ও চিত্তের পবিত্রতা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব একাগ্রতা সহকারে বাহ্যতীর্থ সেবায়ঃ—কায়িক, বাচিক ও মানস বিশুদ্ধি নিশ্চয় ঘটিয়া থাকে একথা প্রমাণ করা হইল। এই বাহ্য তীর্থ সেবায় তামস্ ভাব ক্ষয় হইয়া শ্রদ্ধার আবেশ পর্য্যন্ত হয়, চিত্তের বিশুদ্ধি ক্রমে ঘটিতে থাকে। এই ভাবের সেবার মুক্তি পর্য্যন্ত উৎকৃষ্টত্ব লাভ হয় না। বিশুদ্ধির সেতু লাভ হইয়া থাকে। এইজন্য জীবের বিশুদ্ধিহেতু উপাসনাতত্ত্বে ক্রিয়ানুষ্ঠান বিধিতে বাহ্যতীর্থ সেবা অতিশয় উপযোগী হইতেছে। অতএব তীর্থ বা মানসতীর্থ সেবায় জীবে মুক্ত হইতে পারে। বাহ্য সেবা দ্বারা ক্রমে সত্ত্বগুণময় হইলে তবে মানস তীর্থ সেবার অধিকার জন্মায়। সেই অধ্যাত্মচিন্তা ভিন্ন মুক্তি কখনই সম্ভব নহে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র বলিতেছেনঃ—

"ইদং তীর্থং ইদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনা।
আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মুক্তা বরাননে॥"

অর্থঃ—হে বরাননে! তামস্ প্রকৃতিমান্ লোকেরা (বাহ্য শোধনের জন্য) এইটি তীর্থ, এইটি তীর্থ বলিয়া সংসারের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে কিন্তু যতক্ষণ তাহারা আত্মতত্ত্বরূপী তীর্থ অর্থাৎ ভব সংসারের পারে যাইবার উপায় না জ্ঞাত হয়, ততক্ষণ তাহারা কেমন করিয়া মুক্ত হইবে!'

আমাদের দেহের মধ্যে অধ্যাত্মতীর্থ বহু আছে। তন্মধ্যে প্রধান ছয়টি মর্ম্মস্থান, যাহাকে ছয়দল কমল কহে বা ছয়খানি চক্র কহে, সেই ছয়টিই প্রধান তীর্থরূপে গণ্য হইতেছে। সেই স্থানে মহাযোগানুষ্ঠানযোগে ভগদাবির্ভাব করিতে পারিলে মানবে মুক্ত হয়। এই

অধ্যাত্ম পবিত্র স্থানের মহিমা রুদ্রযামল তন্ত্রের উত্তর খণ্ডে এইরূপ লিখিত হইয়াছেঃ—

"স্নান মাত্রেণ মুক্ত স্যাৎ পাপশৈলাদনন্তগঃ।
স্নায়াচ্চ বিমলে তীর্থে হৃদয়াম্ভোজ পুষ্করে॥
ইড়াসুষুম্নে শিবতীর্থকেঽস্মিন্ জ্ঞানাম্বুপূর্ণে বহতঃ শরীরে।
ব্রহ্মাম্বুভিঃ স্নাতিতযো সদা যঃ কিন্তস্য গাঙ্গৈরপি পুষ্করৈর্বা॥"

অর্থঃ—হৃদয় কমলরূপী বিমল পুষ্কর তীর্থে যে ব্যক্তি একবার স্নান করে; অনন্তকাল সঞ্চিত শৈলসম অচল ও অটল পাপ হইতে, এবম্বিধ স্নান মাত্রেই সে ব্যক্তি মুক্ত হইয়া থাকে। (এ স্থলে স্নান শব্দের অর্থ জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান মালিন্য ধৌত করণ।) এই যে শরীর, ইহার মধ্যস্থ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামক নাড়ীত্রয়ে জ্ঞানাম্বু দিবানিশি যখন প্রবাহিত হয়, তখন ইহাকে শিবতীর্থ অর্থাৎ কাশীধাম কহে। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানাম্বুতে যে ব্যক্তি সতত স্নান করে; তাহার নিকটে গঙ্গা বা পুষ্কর কি পবিত্রতা দান করিতে পারিবে!!"

এই যে আধ্যাত্ম তীর্থের কথা বলিলাম। এই সকল অন্তরের স্থানে অর্থাৎ ছয় চক্র স্থলে ও সুষুম্নাদি নাড়ীতে জ্ঞান প্রবাহিত করিবার জন্য, যে সকল সাধন ও চিন্তনের আবশ্যক হয়, সেই যোগাভ্যাসের সাহায্য করিতে, মহাযোগীগণেঃ—গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি বাহ্যস্থান মধ্যে যে সকল চিহ্ন আছে, তাহার সহিত অন্তরের একতা স্থাপন করিয়াছেন। যেমন যমুনা, গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমকে বাহ্য প্রয়াগ কহে। অন্তপ্রয়াগের কথা রুদ্রযামল তন্ত্র এই ভাবে বলিতেছেনঃ—

"ইড়া ভাগিরথী গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা নদী।
তযোর্ম্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্নাখ্যা সরস্বতী॥
ত্রিবেণী সঙ্গমো যত্র, তীর্থরাজঃ স উচ্যতে।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

অর্থঃ—শরীরের যে স্থানে ইড়ানামে গঙ্গা প্রবাহিতা হয়েন,

পিঙ্গলা নামে যমুনা প্রবাহিতা আছেন; মধ্যস্থলে সুষুম্না নামে সরস্বতী বর্ত্তমান আছেন। এবম্বিধ ত্রিবেণী সঙ্গমস্থলকে তীর্থরাজ প্রয়াগ কহে। তথায় স্নান করিতে করিতে অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি করিতে পারিলে, প্রকৃষ্ট রূপে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

এই প্রকৃষ্ট শব্দ ব্যবহারে বলা হইল যে, বাহ্যতীর্থে সামান্য পাপক্ষয় হয়, কালে পুনরায় পাপের আবির্ভাব হইতে পারে। কিন্তু যাহার চিত্ত এইরূপ অধ্যাত্ম তীর্থে জ্ঞানময় হইয়াছে, তাহার পাপের পুনরাবির্ভাব হয় না, অতএব মুক্ত হওয়া যায়। সামান্যতঃ তীর্থ সেবাদ্বারা অন্তর ও বাহ্য শৌচ যে ভাবে হয় আমরা তাহা দেখাইলাম অতএব ক্রিয়ানুষ্ঠান পদ্ধতির মধ্যে তীর্থ সেবা জনিত পবিত্রতার প্রমাণ করা হইল। উপাসকের পক্ষে প্রথম শ্রদ্ধা ও ভক্তি স্থির করিতে বাহ্য তীর্থ যেমন নিতান্ত প্রয়োজনীয় সত্ত্বগুণীর পক্ষে অধ্যাত্ম তীর্থ সেবন সেইরূপ নিতান্ত আবশ্যকীয় হইতেছে।

শ্রাদ্ধ ক্রিয়ায় আমাদের কিরূপে অন্তর ও বাহ্য শুচি ঘটে তাহাই এক্ষণে বিচার করা যাইতেছে। প্রথমে দেখা উচিত শ্রাদ্ধ কাহাকে বলে: পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার সহিত দ্রব্য ও মন্ত্রাদি দান জনিত অনুষ্ঠানকে শ্রাদ্ধ কহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, তামস ভাবকে নষ্ট করিতে হৃদয়ে শ্রদ্ধার আবির্ভাব করিতে হয়। সেই শ্রদ্ধা উদ্ভব করিতে দেব, গুরু, সাধু প্রভৃতির সেবায় যে ফল হয়, তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। মানব প্রথমাবস্থায় শ্রদ্ধা আহরণ করিতে কোথায় শিক্ষা করিবে, এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া শাস্ত্রকর্ত্তাগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যতক্ষণ মানবে নিজ সংসারের মধ্যে শ্রদ্ধাবান্ না হইতে পারিবে, ততক্ষণ দেব, বিপ্র, সাধু ও গুরু প্রভৃতির সেবায় শ্রদ্ধার অধিকারী হইতে পারিবে না। অগ্রে নিজ গৃহের প্রত্যক্ষ কুলবিধাতা, জন্মদাতা প্রভৃতির উপরে শ্রদ্ধা ঠিক করিতে পারিলে, অপ্রত্যক্ষ দেবাদিতে তদ্ভাব উপস্থিত হইতে পারে। যাঁহাদের সহিত আমাদের নিত্য একতা সম্বন্ধ, যাঁহারা আমাদের জন্মদাতা, পোষণকর্ত্তা, দুঃখ, সুখ ও বিষাদের ভোগকর্ত্তা,

যাঁহাদের রোগে আমরা রুগ্ন, যাঁহাদের পুণ্যে আমরা পবিত্র; সেই সকল পিতৃমাতৃগণের উপরে আমরা যদি শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারি, তবে আমরা অন্য সকল বস্তুতে শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারিব। এই জন্য আমাদের জন্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, বিবাহ, মৃত্যু, তীর্থগমন, তীর্থদর্শন প্রভৃতি যে সকল অনুষ্ঠানে আমাদের অন্তরের বিশুদ্ধির প্রয়োজন হয়, সেই সকল কার্য্যের অগ্রে শ্রাদ্ধাদি করিতে শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন। শ্রাদ্ধতত্ত্বে বহু বিষয় বুঝিতে হয়; সংক্ষেপে সকল বিষয় বোধ করিবার জন্য শাস্ত্র যে উপায় বিধান করিয়াছেন, তাহাই এ স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। সমস্ত দেবতা, সমস্ত প্রকৃতিশক্তি, সমস্ত ফলফুল, ঋতু, অয়ন, বৎসর মাস ও দিন প্রভৃতি যাহারা এই জগতের উৎপাদন ও বর্দ্ধন করিয়া থাকেন, সেই সকল অবস্থা এবং আমাদের পিতা ও মাতা, পিতামহ ও মাতামহ এবং তদূর্দ্ধ পূর্ব্ব পুরুষ যাঁহারা প্রকটিত হইয়া সংসারে আমাদের জন্ম বিধান করিতেছেন; সেই সকল উৎপত্তিতত্ত্বে জ্ঞান লাভ করিতে আমাদের সতত শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, ইহাই শাস্ত্রানুমোদিত বিধি হইতেছে। এই শ্রাদ্ধ কার্য্যে দ্বিবিধ ফল আছে। ইহাতে উৎপত্তিতত্ত্ব জ্ঞানে সংসারাসক্তি ক্ষয়ে মুক্ত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ উপকার এই যে, শ্রাদ্ধ-কালে সমস্ত দেবতা ও প্রকৃতির চিন্তায় নিজদেহের ও মনের পবিত্রতা ঘটাতে পরলোকস্থ পিতা, মাতা ও পূর্ব্বপুরুষগণের পবিত্রতা ঘটিয়া থাকে। নিজের মুক্তি এবং পূর্ব্বপুরুষ হইতে নিজদেহ পর্য্যন্ত পবিত্র করণই শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য হইতেছে। এক্ষণে এই বুঝা উচিত যে, আমাদের সহিত পূর্ব্ব পুরুষগণের সম্পর্ক কি? আমরা যে দেহ পাইয়াছি, শাস্ত্রকারগণে কহেন, উহার সহিত মাতৃপক্ষীয় তিন পূর্ব্ব পুরুষ এবং পিতৃপক্ষীয় সপ্ত পূর্ব্বপুরুষের সম্বন্ধ থাকে। আমরা স্থূল দেহের মধ্যে দেখিতে পাই যে, সপ্তম পুরুষের কর্ত্তা যদি কুষ্ঠাদি দূষিত রোগে রুগ্ন থাকেন, সেই রোগ ধারাবাহিক রূপে সেই বংশের বংশধরেরা লাভ করে। মাতামহ পক্ষের তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সেই দোষের বীর্য্য

দেহে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। রোগস্পর্শে যেমন স্থূলদেহের সম্বন্ধ দেখা যায়, সেইরূপ মনোরোগ অর্থাৎ উন্মাদ প্রভৃতি সূক্ষ্ম মানস-রোগও ঐরূপ সপ্তম ও তিন পুরুষ হইতে বংশে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। এই যে সকল রোগের সংস্পর্শ কথা বলিলাম, ইহা ভৌতিক নহে। রোগ সমস্ত ধাতু বিক্রিয়ার উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাহার সঞ্চিত ফল সূক্ষ্মদেহের সূক্ষ্ম মানসাংশে বীজরূপে নিহিত থাকে। পিতার শুক্র ও মাতৃশোণিত সহযোগে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহও আমাদের লাভ হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে যোগার্ণব তন্ত্র বলিতেছেনঃ—

"অঙ্গপ্রত্যঙ্গভাগাঃ স্যুঃ সূক্ষ্মাশ্চ যুগপত্তদা।
চতুর্থে ব্যক্ততা তেষাং ভাগানামভিজায়তে।
মাতৃজঞ্চাস্য হৃদয়ং বিষয়ানভিকাঙ্ক্ষতি।
অথ মাতুর্ম্মনোভীষ্টং কুর্য্যাদ্গর্ভসমৃদ্ধয়ে।"

অর্থঃ—গর্ভের চতুর্থ মাসে জরায়ুস্থ জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভাগসমূহ বিকাশ হইয়া থাকে। মাতার হৃদয় অনুসারে গর্ভস্থ জীবের হৃদয় গঠিত হইলে ভোগ্য বিষয়ে জীব আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। এই জন্য পূর্ণগর্ভাবস্থায় মাতা যেরূপ খাদ্য ও সন্তুষ্টি ইচ্ছা করেন, গর্ভের কল্যাণ জন্য গুরুজনের তাহা সম্পাদন করা উচিত হয়।

এই শ্লোক দ্বারা এবং বর্ত্তমান ও প্রাচীন যুক্তিতে এই প্রমাণ করা হইল যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সম্বন্ধ পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত আমাদের নিত্য আছে। অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন যে, স্থূলদেহ হইতে পুরুষানুক্রমে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া, সম্বন্ধীভূত রোগ ও পুণ্যাদি পূর্ব্ব পুরুষ হইতে আমরা পাইয়াছি। কিন্তু মৃত্যুর পরে তাঁহাদের স্থূল দেহের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্ষয় হইল; অতএব সেই প্রেতকালে তাঁহাদের অদর্শন অবস্থায় আমাদের সংযোগ সম্বন্ধ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? জীবন্ত পিতামাতাকে শ্রদ্ধাদি দেখাইলে তাঁহাদের তুষ্ট করা যায় কিন্তু মৃত পিতামাতার প্রতি দ্রব্যমন্ত্রাদি যুক্ত শ্রাদ্ধে কেমন করিয়া তাঁহাদের তুষ্টি বা পবিত্রতা সাধিত হইয়া থাকে?

এই যে সন্দেহ, ইহার মূল কথা এই যে, মৃত্যুর পরেও প্রেতজীবের সহিত বর্ত্তমান সন্তানাদির সংযোগ যদি প্রমাণিত হয়, তবেই শ্রাদ্ধাদিতে উপকার হইতে পারে। শাস্ত্র এই সন্দেহ খণ্ডনের জন্য বলিয়াছেন যে ঃ—ইহ জগতে বীজানুসারে মূর্ত্তি ও গুণের বিকাশ হইয়া থাকে। আমরা জগতে দেখিতে পাই, বীজানুসারে অর্থাৎ পিতামাতার সংস্কারানুসারে গঠন, বুদ্ধি, বৃত্তি, গুণ প্রভৃতির বিকাশ হইয়া থাকে। যে বীজ হইতে আমাদের ভবিষ্যৎ দেহ প্রকাশ হয়, তাহাতে কিছুই নাই, কেবল এমন একটু তেজ আছে, যাহার ক্ষমতায় দেহ গঠিত হইলেই পিতৃজ ও মাতৃজ সংস্কার এবং পূর্ব্বকর্ম্মফল একে একে প্রবেশ করিয়া থাকে। অনেকে বলিতে পারেন বীজের অন্তরেই ঐ গুলি নিত্য বর্ত্তমান। তাহাদের ভ্রম, কারণ যদি বীজে তাহাই থাকিত, তাহা হইলে সকল বীর্য্য হইতে দেহ জন্মাইত। পিতার পুষ্টি ও জননীর শান্তির অপেক্ষা হইত না। পিতার ভাব ও জননীর ভাব এবং পূর্ব্বসংস্কার এই তিনটি আকর্ষণ হইবামাত্র জীবাত্মার প্রবেশ ঘটে। যদি কেবল শুক্র ও [illegible] প্রকাশক ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে, জীবাত্মাভিনিভ আনন্দকোষাদির অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? যাঁহারা ঈশ্বর ও জীব [illegible] করেন, তাঁহারা সপ্তধাতুতে দেহাদি প্রস্তুতের ও মাতৃজপিতৃজ এবং পূর্ব্ব সংস্কারের আকর্ষক অবস্থা বিশেষ বলিয়া বীজাদিকে জ্ঞাত আছেন। যদিও বিষয়টি অতি সূক্ষ্ম, পূর্ব্বে দেহতত্ত্বে কিছু বলা হইয়াছে। এইটি নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, যে, এই সংসারের মধ্যে প্রকৃতিই হইতেছে উপাদান কারণ এবং তিনিই পুরুষের আকর্ষণ কর্ত্তা। সেই নিয়মে শুক্রশোণিতাদিযুক্ত প্রকৃতির আকর্ষণে জীব গর্ভস্থ হইয়া পুত্ররূপে পরিণত হয়েন, এবং এক দেহ ক্ষয়ে অন্যদেহ গ্রহণ করেন।

জীব এই সূক্ষ্ম অবস্থায় সমস্ত জগৎ সংসারের সহিত নিত্য আবদ্ধ সকল জীবের দর্শনশক্তি এবং সকল জীবের অন্যান্য সকল শক্তি, মন, চিত্ত, বুদ্ধি, এ সমস্তই এক স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে এই প্রশ্নে এই

তর্ক উপস্থিত হইতে পারে, যে, জীবের সর্ব্বান্তর্যামীত্ব ঘটনায় সকল জৈবশক্তিই এক, স্বভাব বশে এক নিয়মে জন্মায় ও মৃত্যুলাভ করে। দেহসম্বন্ধ থাকায় রোগাদির সম্বন্ধও থাকিতে পারে। কিন্তু পিতা ও মাতার সহিত বিশেষ সম্পর্ক মৃত্যুর পরে কেমন করিয়া থাকিতে পারে? জৈব সংসারের মধ্যে এরূপ এক বিশেষ সম্বন্ধ যদি না থাকিবে, তবে সকল জীবের একই স্বভাব হইবে। আমরা যখন দেখিতে পাই, প্রতি জীবের ভিন্ন স্বভাব ও গুণ সংসারে বর্ত্তমান, তখন সকল মূল শক্তি এক হইলেও জীবভাবে সংসারে পরিণত হইলেই ভিন্ন হইয়া যায়। সেই ভিন্নাবস্থা সম্পন্ন পিতামাতার স্বভাব সন্তানগণকে বহু পুরুষ পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হয়। কোন বংশের মূর্ত্তি লাবণ্য, গঠন মনের অভিপ্রায় ইত্যাদি পঞ্চ বা সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, পরে ক্রমে বহু মাতৃসংস্কার ও পূর্ব্বকর্ম্মাদি সংযোগ হওয়াতে তাহাদের পূর্ব্ব চিহ্ন গুলির বিলয় ঘটে।

আমরা দেখিতে পাই যে, জননীর গর্ভে রেতঃসেক করিয়া পিতা যদি কালগ্রস্ত হয়েন, তথাপি পিতৃগুণ তদ্বীর্য্যজাত সন্তানে প্রকাশ হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শুক্র শোণিত কেবল প্রকৃতি মাত্র। তাহা পিতৃমাতৃগুণ ও দোষ সংস্কার আকর্ষণ করিয়া ক্রমে সন্তানের মনের ও দেহের পুষ্টি সম্পাদন করিয়া, পূর্ব্ব পুরুষের লক্ষণ বিকাশ করিয়া থাকে। এই প্রমাণে বুঝান হইল, যদি প্রেতভাবাপন্ন জনক জননীর সহিত আমাদের সম্বন্ধ না থাকিবে, তবে কেমন করিয়া, তাঁহাদের স্বভাব, গঠন, লাবণ্য প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে আমরা লাভ করিতে পারিব। এই সম্বন্ধ নিত্য আছে, এই সম্বন্ধ আমরা যত নিত্য স্থাপন করিব, ততই আমাদের কল্যাণ হইবে, কারণ পিতৃপুরুষেরা যদি পুণ্যবান হয়েন, আমরা তৎ স্বভাব নিত্য আকর্ষণ করিতে পারিব। তাঁহারা যদি মহা পাপী থাকেন, আমাদের বিশুদ্ধি বলে তাঁহাদের বিশুদ্ধি ঘটাইতে হইবে, কারণ তাঁহাদের বিশুদ্ধি ঘটাইতে না পারিলে, তাঁহাদের সকল স্বভাব যখন আমাদের প্রকৃতি দ্বারা নিত্য আকর্ষিত হইতেছে, তখন তাঁহাদের কুপ্রকৃতির

আবেশ হওয়াতে আমাদের পুণ্য ক্ষয় হইয়া যাইবে। তাঁহাদের গুণদোষ আমরা পাই এ কথা প্রমাণিত হইল, কিন্তু আমাদের পাপপুণ্য তাঁহাদের অধিকার করে কি প্রকারে, বুঝা উচিত হইতেছে। প্রেত প্রাপ্ত পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত যখন আমাদের নিত্য সম্বন্ধ প্রমাণ হইল, তখন আমাদের চিন্তায় ও পবিত্রতায় তাঁহাদের পবিত্রাপবিত্র হওয়া সম্ভব। আমাদের মনের ও বুদ্ধির সহিত তাঁহাদের নিত্য সূক্ষ্ম সম্বন্ধ যখন বর্ত্তমান, তখন আমাদের কলুষভাবে তাঁহারা সেই দুঃখ উপভোগ করেন, আমাদের সুখে তাঁহারা সুখ ভোগ করেন, ইহা নিশ্চয় হইতেছে। যেমন জীবন্তে তাঁহারা আমাদের সুখদুঃখের ভোগী ছিলেন, মৃত্যুর পরে তাঁহাদের সকল স্বভাব যখন আমরা ভোগ করিতেছি, আকর্ষণ করিতেছি, তখন তাঁহাদের সূক্ষ্মাবস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। সেই অস্তিত্বে আমাদের কর্ম্মফল ভোগ হয়। কারণ আমরা এবং তাঁহারা কেবল কর্ম্মফল ব্যতীত অন্য সকল অবস্থাতেই এক হইতেছি। তাঁহাদেরই স্থূল, তাঁহাদেরই সূক্ষ্ম, রূপান্তরে আমাদের গঠনে ও স্বভাবে বর্ত্তমান। সেই প্রেতপ্রাপ্ত পূর্ব্ব পুরুষগণের সূক্ষ্মাবস্থা বা স্বভাবগুলি আমাদের জন্য বর্ত্তমান চিরদিন থাকে। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন প্রেতপ্রাপ্ত জীবের ভাবের একভাগ পরবর্ত্তী পুরুষের অর্থাৎ বংশের পোষণের জন্য বর্ত্তমান। অন্য একভাগ নিজকর্ম্ম ভোগ করিতে অন্য সাদৃশ্য গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। যে ভাগ পোষণের জন্য বর্ত্তমান, তাহাই পিতৃপুরুষরূপে আমাদের শ্রাদ্ধার্হ হইতেছেন। এই দুই অবস্থাই প্রমাণিত, কারণ প্রতি জীবের যখন ভিন্ন সংস্কার দেখা যায়, তখন ইহারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হইতে জন্মিয়াছে। অতএব [illegible] র একদেহ ক্ষয়ে অন্য দেহ গ্রহণ নিশ্চয় হইতেছে। এতদ্ব্যতীত আমরা যখন পূর্ব্বপুরুষের স্বভাব ভোগ করিতেছি, তখন তাঁহাদের স্বভাবের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইতেছে। এই দুই অংশই আমাদের প্রেতকালে সক্রিয় থাকে। এ বিষয়ে নির্ব্বাণতন্ত্র বলিতেছেন :—

"ইতি শ্রুত্বা চ সা চণ্ডী পপ্রচ্ছ শঙ্করং প্রতি।
প্রাপ্তং চতুর্দ্দেহন্তু পিণ্ডদানাদিকং কথং॥
শিব উবাচঃ—শৃনু দেবি প্রবক্ষ্যামি মায়াদেহং তদৈব হি।
মায়াদেহঃ মহেশানি বায়ুরূপং ন চান্যথা॥
বায়ুরূপো যতো দেহ আকশস্থো নিরাশ্রয়ঃ।
ততশ্চ পিণ্ডদানেন বায়ু স্থিরতরো ভবেৎ॥"

অর্থঃ—জীবের প্রেতত্ব ভোগ কথা শ্রীপার্ব্বতী শ্রবণ করিয়া, শঙ্করকে বলিতেছেনঃ—হে প্রভো! জীব যদি মৃত্যুর পরে নিজ কর্ম্ম ফলেঃ—জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ এই চারি শ্রেণীর মধ্যে যে কোন দেহই লাভ করিয়া থাকে, তবে আর তাহার জন্য পিণ্ডাদি দানের প্রয়োজন কি? পার্ব্বতীর প্রশ্ন শ্রবণে শিব কহিতেছেনঃ—হে দেবি। যে প্রেতপ্রাপ্ত দেহের উপলক্ষে পিণ্ডদানাদি করা হয়, তাহাকে মায়াদেহ কহে; তাহার তত্ত্বকথা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে মহেশানি! সেই মায়াদেহ বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম ও সর্ব্বগত ভাব ধারণ করে; সেই বায়ুরূপী দেহ কোন প্রকার আধার বিহীন হইয়া চির দিন আকাশে বর্ত্তমান থাকে। কর্ম্মফলে সেই বায়ুরূপী দেহ, সতত পীড়িত হইয়া চঞ্চল থাকে, পিণ্ডদান দ্বারা শ্রাদ্ধাদিতে পবিত্র করিলে, উহা ক্রমে স্থির অর্থাৎ পীড়াহীনও নিশ্চল হইয়া থাকে।"

আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঐ অবস্থা তদীয় বংশধরগণের অন্তরে সতত সঞ্চারিত হয় বলিয়া শাস্ত্র এই অবস্থাকে বায়ুরূপে বর্ণনা করিলেন। এক্ষণে আমাদের সামান্যতঃ এই অবধারণ করিতে হইবে যে; পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ আছে। আমাদের পবিত্রতায় তদবস্থা পবিত্র হইয়া থাকে। এই পবিত্রতা সাধন করিলে উভয়ের কল্যাণ সাধন হয়। উভয়ের কল্যাণ সাধন হয় বলিয়া শাস্ত্র সকল কার্য্যেই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই জন্য শাস্ত্র শ্রাদ্ধতত্ত্বে বলিয়াছেন যেঃ—পিতৃ পুরুষকে আহ্বান করিয়া পত্নীর গর্ভ পর্য্যন্ত সম্পাদন করিতে হয় ও অন্যান্য কর্ম্ম করিতে হয়। এই জন্য ঋতুমতী

ভার্য্যাকে পিতামহার্থ প্রদত্ত পিণ্ড এই মন্ত্রে ভোজন করাইতে হয়ঃ—এ বিষয়ে যজুর্ব্বেদ বলিতেছেনঃ—

"ওঁ আধত্ত পিতরো গর্ভং কুমারং পুষ্করস্রজং।"

অর্থঃ—হে পিতৃগণ, আমার পত্নীর গর্ভে পঙ্কজমালা ভূষিত সুন্দর পুত্র যাহাতে জন্মায়, এমন উপায় করুন।

এই সকল কল্যাণ কামনা করিয়া পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ করা হয় বলিয়া নিজ কল্যাণ ইচ্ছায় তাঁহাদের শ্রাদ্ধ শেষে এইরূপ স্তব করিতে শ্রীযজুর্ব্বেদ বলিয়াছেনঃ—

"ওঁ আমাবাজস্য প্রসবো জগম্যাদেমে
দ্যাবা পৃথিবী বিশ্বরূপে আমাগন্তং—
পিতরা মাতরা যুবমামা সোমোঽমৃতত্বায গম্যাৎ।"

অর্থঃ—বাজস্য শাকদত্তান্নস্য প্রসবঃ ফলং মা মাং আজগম্যাৎ পুনঃ পুনরাগচ্ছতু। দ্যাবা পৃথিবী মা মাং জগামোতাং পুন পুনরাগচ্ছতাং, কাদৃশে বিশ্বরূপে বিশ্বং রূপং যয়োঃ এতেনে দ্যাবা পৃথিবী সম্বন্ধি সংফলং কল্যাণং তং নামাগচ্ছতু, পিতরা মাতরা যুবং যুবাং মং মাং আগন্তং আগচ্ছতাং, সোমঃ পিতৃণাং দেবতা মাং আগম্যাৎ আগচ্ছতু কিমর্থং অমৃতত্বায় মোক্ষায়েতি।"

অর্থঃ—ওঁকার অর্থাৎ জাগরণ, সুষুপ্তি ও স্বপ্নাবস্থায় আমি ঈশ্বরপর হইয়া, এই যে পিতৃলোক তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধে উপকরণাদি দান করিলাম, ইহার সংফল আমাতে পুনঃপুনঃ আবির্ভাব হউক। এই যে বিশ্বরূপী স্বর্গ ও পৃথিবী ইহাদের সকলকেই আমি শ্রাদ্ধকালে পূজা করিয়াছি, ইহারা বারম্বার আমার কল্যাণ বিধান করুন। আমি শ্রাদ্ধ করিলেই হে পিতামাতাগণ! আপনারা আগমন করিয়া আমার কল্যাণ বিধান করুন। হে সোম দেবতা, আপনি পিতৃপুরুষের আদি কর্ত্তা, অতএব আপনিও এই শ্রাদ্ধে পূজিত হইয়া, আমাকে মোক্ষ ফল প্রদান করুন।"

শ্রাদ্ধ মন্ত্র পাঠ করিলে বিশেষ বুঝা যাইবে যে, এক পিতৃপুরুষ

উপলক্ষ করিয়া সমস্ত তত্ত্বের চিন্তা, শক্তির চিন্তা ও পূর্ব্বপুরুষগণের চিন্তা করিতে শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন। আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ, পিতা ও মাতার উপরে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আত্মশোধন করিতে না পারিলে আমাদের কোন উন্নতিতে অধিকার হয় না। অতএব আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ শোধনের জন্য ক্রিয়ানুষ্ঠান তত্ত্বে শ্রাদ্ধ একটি প্রধান অঙ্গ হইতেছে। সাক্ষাৎ জন্মদাতা, পোষণকর্ত্তা ও মনোপ্রাণের পুষ্টিকর্ত্তা, এমন কি জন্ম ও মরণেও যাঁহারা আমাদের সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট করেন, তাহাদের উপরে শ্রদ্ধা স্থির করিতে না পারিলে. শ্রদ্ধা বলিয়া কোন অবস্থা আমাদের দেহে বিকাশ হইতে পারে না। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেনঃ—

"ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

অর্থঃ— ওঁকার অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায় ঈশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক পিতাকে স্বর্গের আকর বলিয়া জানিবে, কারণ ইহ বা প্রেতকালে পিতৃশুদ্ধি না ঘটিলে পুণ্য লাভ হইতে পারে না। ঐ নিয়মে পিতাকে ধর্ম্মের ও তপস্যার কল্যাণ বিধাতা বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব শ্রদ্ধাদি সহযোগে পিতৃতুষ্টি সম্পাদন করিতে পারিলে সকল দেবতাই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন

এই সকল বচনের সাহায্যে শ্রাদ্ধ যে অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা বুঝান হইল। শাস্ত্র বলিয়াছেন, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ বিহীন ব্যক্তি চিরদিন অশুচি থাকেন। তাঁহার কোন পবিত্র কর্ম্মে অধিকার থাকে না। তর্পণও শ্রাদ্ধের অঙ্গীভূত হইতেছে। পুণ্যতীর্থে, গ্রহণে বা নিত্য স্নানে আমাদের মানসের বিশুদ্ধি ঘটিতে পারে, এই জন্য ঐ সকল সময়ে ও প্রত্যহ তর্পণ এবং শ্রাদ্ধাদির বিধি শাস্ত্র দিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধাদি কার্য্য দ্বারা পূর্ব্বপুরুষ বিশুদ্ধ হইলে আমাদের বংশে উত্তম গুণবান্ পুত্রাদি ও কন্যাদি ঘটে, তদ্বিষয়ে শ্রীমনু বলিতেছেনঃ—

"প্রথিতা প্রেতকৃত্যৈষা পিত্র্যং নাম বিধুক্ষয়ে।
তস্মিন্ যুক্তস্যৈতি নিত্যং প্রেতকৃত্যৈব লৌকিকী।"

অর্থঃ—বেদাদি সকল শাস্ত্রেই অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধ কার্য্যের বিধি বিহিত হইয়াছে। সেই কার্য্য পিতৃলোকের ও কর্ত্তার উপকারার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই জন্য এই লৌকিকী অর্থাৎ মুনিজন প্রণোদিত ও স্মৃতিকথিত উপায়ে পিতৃপুরুষের উপকারার্থ ক্রিয়া সর্ব্বতোভাবে বংশধরগণের কর্ত্তব্য হইতেছে।

এই শ্লোকে যে "প্রেতকৃত্য" শব্দটি আছে, তাহার অর্থ ভাষ্যকার মেধাতিথি, গোবিন্দরাজ এবং টীকাকার কুল্লক এইরূপ করেন যথাঃ—প্রেতঃ—প্র+ইতঃ=প্রকর্ষেণ প্রাপ্তঃ। যে কার্য্য করিলে অতীত পুরুষগণের উৎকর্ষ হয় এবং তৎফল স্বরূপ কর্ত্তাব্যক্তিরও পুত্রপৌত্রাদি সদ্‌গুণসংযুক্ত সৌভাগ্য লাভ করে, তাহাকে প্রেতকৃত্যা ক্রিয়া বা শ্রাদ্ধ কহে। অনেকে বলিতে পারেনঃ—মৃত্যুর পরে এইরূপ শ্রাদ্ধাদি করিলে চলিতে পারে, জীবন্ত পিতৃমাতৃকুল সেবার প্রয়োজন কি? গুরুসেবা ব্যাখ্যাকালে, জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় যোগে যে ভাবে সেবন ফলরূপ পরস্পর শ্রদ্ধারূপী অপূর্ব্ব সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়, এ কথা প্রমাণ করা হইয়াছে। সেই সেবনাদিযোগে পরস্পর সম্বন্ধ একীভূত হইলে জীবন্ত হইতে পরকাল পর্য্যন্ত নিজের ও পিতৃকুলের কল্যাণ সাধন হইয়া থাকে। এক্ষণে অনেকের সন্দেহ হইতে পারেঃ—পিতা, মাতা যদি মূর্খ ও পাপী হয়েন বা রোগাক্রান্ত হয়েন, সেই অসংস্কৃত পিতা ও মাতার সেবা পণ্ডিত পুত্র কেমন করিয়া করিবে? তদ্বিষয়ে শাস্ত্র বলিতেছেনঃ—পিতা ও মাতার যে কোন গুণ বা দোষ থাকুক না কেন, সে সমস্তই পুত্রের অন্তর ও বাহ্য দেহে সর্ব্বদা সংযুক্ত থাকে। অতএব শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে দেহ পবিত্র না করিলে পিতৃকুলের ও আপনার বিশুদ্ধি কেমন করিয়া ঘটিবে। যেমন ক্ষতরোগাক্রান্ত ব্যক্তি নিজ ক্ষতরোগ আরোগ্য না করিয়া, উত্তম পোষাক দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিলে, তাহার রোগের শান্তি হয় না। তদ্রূপ বংশ বিশুদ্ধ করিতে না পারিলে, আপনার সুকৃতি কেমন করিয়া আসিবে! অধিকন্তু শাস্ত্রে লেখা আছে;—ব্যাঘ্র অপেক্ষা হিংস্র জন্তু আর নাই, ব্যাঘ্র ও

সিংহ যে দন্তে ও নখে হস্তীর মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া থাকে, সেই দন্ত ও নখাদি নিজ শিশুর প্রীতিপ্রদ হয়। অতএব পিতা ও মাতার দুঃস্বভাব হইলে, তাঁহাদের অন্তর পুত্রের মঙ্গলের জন্য সতত ব্যস্ত থাকে। অন্যান্য উপাসনার্থ সামগ্রী যেমন জ্ঞান ও বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ উপস্থিত হইলে অধ্যাত্ম ভাবে ও মন্ত্রময় করিয়া ব্যবহার করিতে হয় এই শ্রাদ্ধাদি কার্য্যও বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণীর পক্ষে মনোময় অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে শ্রীমনু বলিতেছেন :—

"ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তিঃ ন হাপয়েৎ॥
জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা।
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা॥"

অর্থঃ—ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞ (শ্রাদ্ধাদি) মানবে যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিবে, কখন পরিত্যাগ করিবে না। কেননা যজ্ঞই কেবল জ্ঞান ও সত্ত্বগুণ অধিকারের জন্য— সাধিত হইয়া থাকে। এই সকল অনুষ্ঠান বলে ক্রমে যে সকল বিপ্রের পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞান জন্মাইয়াছে, তাঁহারা আত্মজ্ঞানবাদ দ্বারা ব্রহ্মদর্শন পূর্ব্বক এই সকল যজ্ঞের মূল লাভ করিবার জন্য, জ্ঞানমন্ত্রে এই সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

অতএব ঘোর তমোগুণী হইতে অতিশয় বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানীর পর্য্যন্ত উপাসনাতত্ত্ব বোধের জন্য অন্য সকল ক্রিয়ার সহিত এই শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াসাধন অতীব প্রয়োজনীয় হইতেছে।

রুদ্রাক্ষ প্রভৃতিতে এমন গুণ আছে, যাহাতে ধাতু বৈলক্ষণ্য অনেকাংশে শান্ত করিতে পারে। ঐ সকলের সহযোগে ভগবন্নাম জপে অন্তরের শুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। আমরা মাল্য দুই উপায়ে ব্যবহার করি। কণ্ঠে ধারণ ও করে জপন করিয়া থাকি। কিন্তু অন্তর ও বাহ্য শৌচের জন্য শাস্ত্র এই মালাকে মস্তকে, কর্ণে, বাহুমূলে, করসন্ধিতে, কণ্ঠে ও নাভি পর্য্যন্ত লম্বিত করিয়া ধারণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যেমন উপবীতাদির মন্ত্র আছে, সংস্কার আছে। সেইরূপ মালাকে যতক্ষণ না সংস্কার করা হয়, অর্থাৎ মন্ত্রাদি দ্বারা পবিত্র করা না হয়, ততক্ষণ উহাকে বৃথা বলিয়া শাস্ত্র [illegible] করিয়াছেন। সম্প্রদায় ভেদে মালার ব্যবহার হইয়া থাকে। বৈষ্ণবে তুলসী, [illegible], তুলসীমূল [illegible] কেহ কেহ পদ্মবীজও ব্যবহার করিতে পারেন। শাক্ত শৈব, সৌরে ঐ সকল এবং রুদ্রাক্ষ ও অস্থি প্রভৃতির মালা ব্যবহার করিয়া থাকেন। গাণপত্যেরা বৈষ্ণবের ন্যায় সকল ও রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করিতে পারেন। কেহ কেহ বৈষ্ণবপক্ষেও [illegible] গাণপত্য বিধির অনুসরণ করিয়াছেন। এতদ্বারা বৈষ্ণব ও শাক্তে কিছু ভেদ থাকে, তাহা কেবল সম্প্রদায় পৃথক বুঝাইবার জন্য মাত্র, [illegible] কোন পার্থক্য থাকিলে বৈষ্ণবের কণ্ঠগত তুলসীমালায় একটি রুদ্রাক্ষ ও পঞ্চরত্ন থাকিবে কেন? এবং শাক্তের পক্ষে সমস্ত পদার্থজনিত মালা ব্যবহার বিধি বা শাস্ত্র বিহিত করিবেন কেন? আমাদের দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই অধিক হইতেছে। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণবে কেবল তুলসী ও তৎসহযোগে এক একটি রুদ্রাক্ষ ও পঞ্চরত্ন ধারণ করেন। শাক্তে তুলসী ও রুদ্রাক্ষ উভয়ই ধারণ করেন।

এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষাদি ফল বা তুলসীকাষ্ঠ গোটিকাগুলি সংযোগে মালা প্রস্তুত হয়, ইহার যথেচ্ছ ব্যবহার চলিবে না। এক শত আটটি কিম্বা পঞ্চাশৎ খণ্ড সংযোগে মালা প্রস্তুত করা চাই। যা তা কিছু সূত্র এবং যেমন তেমন করিয়া গাঁথিলে চলিবে না। তন্ত্রের নিয়ম আছে, গোটিকা বা বীজগুলি গ্রথিত হওনের কারণ

আছে। এই একশত আট এবং পঞ্চাশৎ গণিত যে মন্ত্র শাস্ত্রে কহিয়াছেন তাহা দ্বিবিধ। করাঙ্গুলিতে এক প্রকার জপের ক্রম আছে, তাহাকে করমালা কহে। পূর্ব্বোক্ত পদার্থমালার ন্যায়, এই করমালাও বৈষ্ণব ও শাক্ত ভেদে দ্বিবিধ ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সনৎকুমার সংহিতায় বিষ্ণুবিষয়িণী করমালার ক্রম যথাঃ—

'অনামা মধ্যমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এবচ।
তর্জ্জনী মূল পর্য্যন্তং দশপর্ব্বসু সংজপেৎ॥

অর্থ।—মধ্যমা অঙ্গুলী হইতে আরম্ভ করিয়া অনামা ও কনিষ্ঠা হইতে তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত দশপর্ব্বে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া জপ করিবে। শ্রীক্রমতন্ত্র শক্তিপক্ষে করমালার এইরূপ বিধি দিয়াছেনঃ—

'পর্ব্বত্রয় অনামায়াং পরিবর্ত্তেন বৈ ক্রমাৎ
[illegible] মধ্যমায়াস্তু তর্জ্জন্যেকং সমাচরেৎ॥
পর্ব্বদ্বয়ন্তু তর্জ্জন্যা মেরুং তদ্বিদ্ধি পার্ব্বতি।
শক্তিমালা সমাখ্যাতা সর্ব্বমন্ত্রপ্রদীপিকা॥'

অর্থ।—অনামার পর্ব্বত্রয় মধ্যমার পর্ব্বত্রয় ও তর্জ্জনীর একপর্ব্ব পরিবর্ত্তন যোগে জপ ব্যবহার করিবে। উহার মধ্যে তর্জ্জনীর পর্ব্ব দ্বয়কে, হে পার্ব্বতি মেরু বলিয়া জানিবে, ইহাকেই সর্ব্বমন্ত্রসঞ্জীবনী শক্তিমালা কহে।

পদার্থ জাত মালা ও করজাত মালা প্রভৃতিতে যে অষ্টোত্তরশত এবং পঞ্চাশৎ জপের বিধি দেওয়া হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য শাস্ত্র এরূপ দিয়াছেন। সংসারে সতত অন্তরের ভাব প্রকাশ হইবার জন্য তিনটি শক্তি আমাদের অন্তরে আছে। জীবাত্মা আমাদের দেহে প্রবেশ মাত্রেই চৈতন্যশক্তি, পূর্ব্বকর্ম্ম ও স্বভাবগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতে তিনভাগে বিভাজিত হইয়া কার্য্যকারিণী হয়েন। প্রথম ইচ্ছাশক্তি, দ্বিতীয় জ্ঞানশক্তি, তৃতীয় ক্রিয়াশক্তি। প্রথমে ইচ্ছার উদয়, পরে সেই ইচ্ছা বোধ ও কার্য্যে প্রবৃত্তি ঘটে। শেষে ইন্দ্রিয়াদি

সহযোগে তাহার ক্রিয়া নিষ্পত্তি হয়। এই ত্রিবিধ সাধনশক্তি কার্য্য নিষ্পত্তির জন্য কতকগুলি শব্দ প্রকাশ করে। সেই শব্দ বা ধ্বনি আমাদের দেহের তিন স্থান হইতে নির্গত হয়। যে গুলি গম্ভীরধ্বনি, তাহা নাভির নিম্ন হইতে প্রকাশ হয়। যে গুলি দীর্ঘ, সে গুলি হৃদয় হইতে; যে ধ্বনি হ্রস্ব তাহা কণ্ঠ হইতে প্রকাশ হইয়া থাকে। "যাহা নাভির নিম্ন হইতে প্রকাশ হয়, সে ধ্বনির নাম পশ্যন্তি, যাহা হৃদয় হইতে বিকাশ হয় তাহাকে মধ্যমা কহে; যাহা কণ্ঠে বা মুখে প্রকাশ হয় তাহাকে বৈখরী কহে। এই ত্রিবিধ ধ্বনির সাহায্যে আমরা মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকি। ঐ ত্রিবিধ ধ্বনি স্থানভেদে কম্পিত ও উচ্চারিত হইয়া পঞ্চাশৎ বর্ণ নামে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। সেই পঞ্চাশৎ বর্ণই আমাদের সকল ভাবের জননী হইতেছেন। জননী যেমন স্নেহ ও পীযুষরসে আমাদের দেহকে পুষ্ট করেন সেইরূপ ঐ সকল বর্ণশক্তি আমাদের জ্ঞান, ক্রিয়া ও ইচ্ছার পুষ্টি সম্পাদন করেন বলিয়া, উহাদের মাতৃকাবীজ বা বর্ণ কহে। পদার্থাদর্শ নামে মহাতন্ত্র বলিতেছেনঃ—

"ইচ্ছাশক্তি বলোদ্ দৃষ্টো জ্ঞানশক্তি প্রদীপকঃ।
পুংরূপিনী চ সা শক্তিঃ ক্রিয়াখ্যা সৃজতি প্রভুঃ॥
সূক্ষ্মা কুণ্ডলিনী মধ্যে জ্যোতির্ম্মাত্রা স্বরূপিনী।
অশ্রোত্রবিষয়া তস্মাদুদ্ গচ্ছন্ত্যূর্দ্ধগামিনী॥
স্বয়ং প্রকাশা পশ্যন্তী সুষুম্নামাশ্রিতা ভবেৎ।
সৈব হৃদ্ পঙ্কজং প্রাপ্য মধ্যমা নাদরূপিণী॥
ততঃ সংজল্পমাত্রাস্যাদবিভক্তোর্দ্ধগামিনী।
সৈবোরঃ কণ্ঠতালুস্থা শিরঘ্রাণরদস্থিতা॥
জিহ্বামূলোষ্ঠনির্ধৃত সর্ব্ববর্ণ পরিগ্রহা।
শব্দ প্রপঞ্চ জননী শ্রোত্রগ্রাহ্যা তু বৈখরী॥
ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়াত্মাসৌ তেজোরূপা গুণাত্মিকা।
ক্রমেণানেন সৃজতি কুণ্ডলী বর্ণমালিকাং॥"

অর্থঃ—সেই প্রভু জীবরূপে নিজ প্রকৃতিবলে ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তির উদ্দীপনকারী হইতেছেন এবং পুংরূপিণী অর্থাৎ জীবের কার্য্যসাধনার্থে যে শক্তির সৃজন তিনি করিলেন, তাহার নাম ক্রিয়া হইতেছে। সেই ক্রিয়া শক্তি যখন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ে প্রাপ্ত না থাকেন, তখন তিনি কুণ্ডলিনী নামে চৈতন্যপ্রবাহ নাড়ীর মধ্যে সূক্ষ্মা, জ্যোতির্ময়ী ও মাত্রা স্বরূপা হইয়া থাকেন। ইচ্ছা ও জ্ঞানের [illegible] কুণ্ডলিনীর মধ্য হইতে, সেই ত্রিবিধ শক্তি যখন প্রকাশ হয়েন, তখন নিম্ন হইতে ক্রমে ঊর্দ্ধগামিনী হয়েন। সেই উদ্গমনকালে যখন তিনি সুষুম্নার মধ্যে হৃদয় উদিতা হয়েন, তখন [illegible] নাম পশ্যন্তী হয়। যখন সুষুম্না-মার্গ দিয়া হৃদয় স্পর্শ করেন, তখন তাঁহার নাম মধ্যমা হয়। [illegible] অবস্থাকে কেহ নাদও বলিয়া থাকেন। ক্রমে হৃদয়ে ইচ্ছার উদ্গম হইতে হইতে যখন সেই শক্তি বাহির [illegible] হইতে পুনশ্চ ঊর্দ্ধে আগমন করে, অর্থাৎ যখন বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ, তালু, ব্রহ্মরন্ধ্র, নাসা, জিহ্বা, ওষ্ঠ ও দন্ত প্রভৃতি স্থান স্পর্শ করিয়া যে ধ্বনিরূপে বিকাশ হয়, তাহা [illegible] থাকে। এই বর্ণ সংযোগে যখন ধ্বনিগুলি শব্দময় হইয়া শ্রোত্রগ্রাহ্য হয়, তখন তাহাকে বৈখরী ধ্বনি কহে। সেই ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াময়ী, [illegible] ও গুণাধিকা কুণ্ডলিনী নাম্নী চৈতন্যনাড়ী এই নিয়মে সকল বর্ণমালার সৃজন করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ববর্ণিত বর্ণগুলি কুণ্ডলিনী নাড়ীর সাহায্যে ক্রমে ঊর্দ্ধে বিকাশ ও অধোস্থলে নিমগ্ন হইয়া বর্ণ, শব্দ ও ইঙ্গিতাদি বিকাশ করিয়া আমাদের সমস্ত ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই হরি কৃপা করিয়া, এমন কৌশল স্থাপন করিয়াছেন, যে, কুণ্ডলিনীযোগে পূর্ব্বোক্ত স্থান ভেদে ক্রিয়াশক্তি, অন্তরের ভাব প্রকাশ করিতে পঞ্চাশৎ বর্ণরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। যে বর্ণ ও শব্দ কুণ্ডলিনীর শক্তিবলে আমাদের বাহ্যভাব প্রকাশিত হইলে জগতের সকল ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, সেই বর্ণগুলিতে বাহ্য বিষয়ভোগ ভাব ত্যাগ করিয়া, যাহাতে সদাসর্ব্বদা উক্তরূপে ঈশ্বর-

ঐ নবধা মিশ্রণই জীবের প্রকৃতি স্বভাব হইতেছে। সুষুম্না, চিত্রা ও কুণ্ডলিনী এই তিন জ্ঞানপ্রবাহযোগে, জীবের নবধাগুণ মিশ্রিত স্বভাবকে শুদ্ধ করিতে প্রতি গ্রন্থিতে ও মালা গোটিকাতে ভগবত্তত্ব জ্ঞাপক মাতৃকা মন্ত্র অর্থাৎ প্রণব সংযুক্ত অকারাদি বর্ণ জপের কথা বলা হইল। সাৰ্দ্ধ দুই পেঁচ দিয়া গ্রন্থি বদ্ধ করাকে নাগপাশ কহে। প্রকৃতিপুরুষ হইতেছে দুই পেঁচ এবং অৰ্দ্ধ হইতেছে বিন্দু ব্রহ্মবিন্দু। এই মালাতে বিশেষ করিয়া বুঝান হইল যে,— ইহা হইল অন্তরের জ্ঞানপ্রবাহ, সেই জ্ঞান প্রবাহকে জাগ্রত করিয়া আমাদের নবধা মিশ্রিত স্বভাব বর্ত্তমান আছে, ভগবদ্ভাব জ্ঞাপক মাতৃকাবর্ণরূপা মালা তাহা দ্বারা ভগবন্মুখী করিতে পারেন না, অজ্ঞানান্ধ স্বভাব কহে—জ্ঞান প্রবাহ উজ্জ্বল হইলে এর যেন অন্তরে উদ্বুদ্ধ হইলে, সংসারের মধ্যে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ [illegible] মুক্ত হইবে। এত নিয়মে মালা গ্রন্থনার বিশেষ তাৎপর্য্য রহিয়াছে। যেমন কোন একটি দেবপ্রতিমা তৈয়ার হইলে দেবপ্রতিমা অঙ্কিত করিতে হয় কিন্তু তাহাতে মন্ত্রযোগে দেবতার আবাহন না করিলে, যেমন পূজাই হয় না। সেইরূপ এই ভাবে মালা গাঁথিয়া, তাহার সংস্কার অর্থাৎ মন্ত্রাদিতে তাহাতে প্রথম জপের পূর্ব্বে দেবতার আবির্ভাব করাইতে হয়। প্রথমে মালা ধারণ করিবার সময়ে যে প্রকারে, মালাতে দেবতার আবির্ভাবকরণ যজ্ঞ করিতে হয়। প্রথমে সংস্কৃত না করিলে, মালা জপ করিতে বা ধারণ করিতে শাস্ত্র নিষেধ করিয়াছেন :—যথা রুদ্রযামলে :—

> "অপ্রতিষ্ঠিত মালাভির্মন্ত্রং জপতি যো নরঃ।
> সর্ব্বং তদ্বিফলং বিদ্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি দেবতা ॥"

অর্থঃ—যে মালাতে দেবতার প্রতিষ্ঠাসংস্কার হয় নাই, সেই মালায় গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিলে, তাহার সকল কর্ম্ম বিফল হইয়া যায় এবং দেবতাও ক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন। মালাতে যে ভাবে মন্ত্রাদি যোগে সংস্কার করিতে হয়, তাহার মন্ত্র ও ক্রিয়াগুলির নিয়ম শাস্ত্রে আছে, উপাসনা-

তত্ত্বে তাহার আভাষ মাত্র দেওয়া হইল বুঝিতে হইবে। যেমন দেবতাদির পূজায় পুষ্প, নৈবেদ্য ও হোমাদির প্রয়োজন হয়। সেইরূপ মালা পূজাতেও প্রয়োজন হয়। পরে সর্ব্বদেবাবির্ভাব করিয়া এই বলিয়া ধ্যান করিতে হয়। যথা বারাহী তন্ত্রে—

"ওঁ মালে মালে মহামালে সর্ব্বতত্ত্ব স্বরূপিণী।
চতুর্ব্বর্গস্ত্বযিন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব॥"

অর্থঃ—ওঙ্কার অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায় যে পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে ভাবিয়া, এই মন্ত্র জপ করিতে হয়ঃ হে মালে! অর্থাৎ আত্ম তত্ত্বদানের ক্ষমতা সম্পন্নে। হে মহামালে! অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রদানে সক্ষমে! তুমি সর্ব্বতত্ত্ব স্বরূপিণী হইতেছ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ তোমারি অন্তরে ন্যস্ত আছে, তুমি আমাকে সিদ্ধি প্রদান কর।" এইরূপে ধ্যান ও পূজাদি শেষ করিয়া মালাকে এই বলিয়া প্রণাম করিতে হয়। যথা যোগিনী তন্ত্রে—

"ওঁ মালে সর্ব্ব দেবানাং সর্ব্বসিদ্ধি প্রদা মতা।
তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোঽস্তুতে॥"

অর্থ—হে মালে! তুমি সকল দেবতা হইতে সকল সিদ্ধি প্রদান করিবার একমাত্র জননী হইতেছ, সেই বিশ্বাসে আমি তোমায় জপ করিতেছি, হে মাতঃ! আমায় অভীপ্সিত সিদ্ধি প্রদান কর, আমি তোমায় নমস্কার করি।

অতি নির্জ্জনে, পবিত্র স্থানে, অতি সাবধানে, গোপনে মালা জপ করিতে হয়। এত সাবধান হওয়া চাই যে, মালা জপকালে কাঁপিবে না এবং গোটিতে গোটিতে সংঘর্ষণ পর্য্যন্ত হইবে না। মালা ছিন্ন হইলে মহাক্লেশ হয়, এই জন্য বৎসর বৎসর নূতন মালা পূজা করিয়া ধারণ করিতে হয়। এ বিষয়ে যোগিনী তন্ত্র বলিতেছেন ঃ—

কম্পনাৎ সিদ্ধিহানি স্যাৎ ধূননং বহুদুঃখদং।
শব্দেজাতে ভবেদ্রোগঃ করভ্রষ্টা বিনাশকৃৎ।
ছিন্নে সূত্রে ভবেন্মৃত্যু তস্মাদযত্নপরো ভবেৎ।"

অর্থঃ—মালাজপ কালে কম্পিত হইলে সিদ্ধিহানি হয়, ধূনিত অর্থাৎ পরস্পর গোটিকাতে স্পর্শ হইলে, বহু দুঃখ উপস্থিত হয়। গোটিকা স্পর্শে শব্দ উত্থিত হইলে মহা রোগের সম্ভাবনা। কর হইতে জপ কালে পতিত হইলে, সিদ্ধিক্ষয় হইয়া যায়, এবং মধ্যস্থ সূত্র ছিন্ন হইলে মৃত্যু দুঃখ উপস্থিত হয়। অতএব এক বৎসর মাত্র এক মালায় জপ করিবে।

এই করমালা ও পদার্থগত মালা যাহা নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ত্রিবিধ কর্ম্মেও যাহা মন্ত্র জপে প্রযোগ হয়, তাহার মধ্যে কর মালাই শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, কারণ উহাতে পূর্ব্বোক্ত দোষ ঘটিতে পারে না এবং মন অন্যদিকে অসাবধানে থাকিতে পারে না। কারণ অসাবধান ও অন্যমনস্ক হইলেই জপের সিদ্ধি অসম্ভব হয়। অধৈর্য্য ও অন্যমনস্ক হইলে পদার্থ মালা জপে পূর্ব্বোক্ত দোষ ঘটিয়া থাকে মানব শক্তি জন্য জপ অন্যমনস্ক থাকিলে সকল সিদ্ধি হানি ও অপূর্ণতা বশতঃ রোগাদিতে আক্রান্ত ও মৃত্যুগ্রস্ত হইতে হইবে, ইহার আর আশ্চর্য্য কি।। অনেকে হয়তো মনে করিতে পারেন, মালা জপে ভগবচ্চিন্তা করিলেই বা মৃত্যু নিবারণ কিসে হইবে? এবং ছেদকরণেই বা মৃত্যু কিসে ঘটিতে পারে? তদুত্তর এই যথাঃ কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি প্রদান করিতে হইলে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ফলসম্পৃক্ত যুক্তি দিয়া সেই কার্য্যের প্রশংসা করিতে হয়, যেমন বিদ্যাশিক্ষা ইহকালের অর্থকরী এবং পরকালে মুক্তি দায়িনী হইতেছে। এ কথা বলিলে:—বর্ত্তমানে ধন ও সম্মানার্থ জনিত প্রশংসা ফল দেখান হইল। বিদ্যাতেজে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, ভবিষ্যৎ কালে মুক্তি পাইতে পারা যায়, ইহাও বুঝান হইল। সেই নিয়মে ভগবচ্চিন্তায় বর্ত্তমানে মন, চিত্ত ও বুদ্ধির বিকাশ ও শান্তি ভাব ধারণের উপায় থাকাতে, ব্যাধি প্রভৃতি ও দুঃখদুশ্চিন্তাদি জনিত শীঘ্র আয়ুক্ষয় হয় না, ইহা বুঝাইতে আরোগ্যাদি ও সিদ্ধি প্রভৃতি বর্ত্তমান ফল, ধৈর্য্য ও মন্ত্র সহকারে মালা জপে বুঝান হইল। মালা জপ করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে মুক্তি বা অমরত্ব নামক

ভবিষ্যৎ ফল দেখান হইল। মাল্যাদি সহযোগে ভগবচ্চিন্তা পরিত্যাগ করিলে, অশ্রদ্ধাবান্ বুঝান হইল। অশ্রদ্ধাসম্পন্ন লোকের দুশ্চিন্তা ও বিষয়াভিনিবেশ বশতঃ নানা দুঃখ ভোগে রোগ ও আয়ুক্ষয় হয়, এই জন্য জপাদি কার্য্য না করিলে রোগাদি অসিদ্ধি, অধৈর্য্য ইত্যাদি বর্ত্তমান ফল এবং পরিণামে মৃত্যুরূপী ভবিষ্যৎফল দেখান হইল। এই মাল্য জপের মধ্যে কর জপ যোগে, অন্যমনস্ক হওয়া দোষ অসম্ভব। কারণ একটি ইন্দ্রিয় দেহে যদি একান্ত কার্য্য করে, সে সময়ে অন্য কার্য্যের প্রসক্তি উদয় হয় না। এই উদ্দেশ্যে শাস্ত্রে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য মন্ত্র জপে করমালাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন যথা উৎপত্তি তন্ত্রেঃ—

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং করে কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
করমালা মহাদেবি সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিতা॥
ছিন্নভিন্নাদি দোষোঽপি করেনাস্তি কদাচন।
অক্ষয়স্য করো দেবি মালা ভবতি তাদৃশী॥
গ্রন্থিঃ সা কুণ্ডলী শক্তিঃ পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী।
অতএব মহেশানি! করমালা মহাফলা॥

অর্থ:—বিচক্ষণ সাধক, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ কর্ম্মানুসারী জপ করে সাধন করিবেন। হে মহাদেবি! করমালা কম্পন ও ছেদনাদি সকল দোষশূন্য হইতেছে। করটি যেমন ক্ষয় হয় না, সেইরূপ জপার্থ করমালা ছিন্নভিন্নাদি দোষে দূষিত হইতে পারে না। সেই জন্য করমাল্য অক্ষয় ফল প্রদানে সক্ষম হইয়া থাকে। করস্থ গ্রন্থিগুলিকে কুণ্ডলিনী নামে জ্ঞানশক্তি ও পঞ্চাশৎ মাতৃকা বর্ণ ভাবিয়া নিত্য জপ করিতে হয়। এই জন্য করমাল্য হে মহেশানি! মহাফলপ্রদ হইতেছে।

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে করমালা ও পদার্থ মালার পরিচয়, সংস্কার ও ধারণাদির নিয়মপদ্ধতি দেখান হইল। এই জপ কার্য্যে শাস্ত্র মধ্যে এক শত অষ্ট, পঞ্চাশৎ এবং এক জপের কথা লিখিত আছে।

এই কয় নিয়মের মধ্যে পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণের জপ কথা পূর্ব্বে বলা হইল। আর এক নিয়মে ঐ পঞ্চাশৎ বর্ণের জপ হয়। কোন তত্ত্ব-বিদ্যাবিৎ গুরু বলেনঃ—ষোড়শ স্বর ষোড়শ পদার্থের সমান। পঞ্চবিং-শতি স্পর্শ বর্ণের মধ্যে ক হইতে ভকার পর্য্যন্ত স্বাধীন বর্ণ থাকায়, উহারা চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সমান। এবং মকার অনুস্বার রূপে সকল বর্ণে সর্ব্বরূপে প্রযুক্ত হয় বলিয়া, উহাই পুরুষ হইতেছে। বাকি নয় বর্ণের মধ্যে আটটি প্রকৃতি, একটি পরমাত্মা হইতেছেন। ষোড়শ স্বরের জপে পঞ্চভূত, দশেন্দ্রিয় ও মন বুঝায়। পঞ্চবিংশতি স্পর্শ বর্ণের মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও পুরুষ বা জীবাত্মা বুঝায়। নয়টি ব্যাপক অর্থাৎ যকার হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণে শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ তন্মাত্রা মনোবুদ্ধি ও অহংকার নামক অষ্ট প্রকৃতি বুঝায়। ক্ষকারটি বর্ণের আদি ও অন্ত বোধক এই জন্য ইনি পরমাত্মা নামে বর্ত্তমান। বীজাভিধান গ্রন্থে সমস্ত বর্ণেরই এইরূপ দেবত্ব প্রতিপাদন করা আছে। তন্মধ্যে শারদা তিলক তন্ত্রে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও জীবাত্মা সম্বন্ধে বলিতেছেন —

"স্বরাঃ ষোড়শ বিখ্যাতাঃ স্পর্শাস্তে পঞ্চবিংশতিঃ।
তত্ত্বাত্মানঃ সমস্তস্পর্শা মকারঃপুরুষো মতঃ।"

অর্থাৎ - স্বরবর্ণ ষোড়শ নামে বিখ্যাত এবং স্পর্শবর্ণ পঞ্চ বিংশতি গণিত হইয়া থাকে। সেই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও আত্মাই স্পর্শবর্ণরূপে বর্ত্তমান, কারণ মকারই স্বয়ং পুরুষ রূপে শাস্ত্রে কল্পিত হইয়াছে।

এই তো গেল দুই উপায়ে পঞ্চাশৎ বর্ণমালা জপ প্রকরণ, এতদ্ব্যতিত অষ্টোত্তর শত জপের নিয়ম আছে। প্রকৃত তত্ত্ববোধে যাঁহারা উক্ত জপ করেন, তাঁহারা পঞ্চাশৎ মাতৃবর্ণ, পঞ্চাশৎ তত্ত্ববিখ্যাত বর্ণ এবং অনির্ব্বাণ অষ্টসিদ্ধি যোগে একশত আট বর্ণের জপ করেন। এই অষ্টোত্তর শত জপ যাহা বাহ্যে করজপে ও পদার্থমালা রূপে প্রয়োগ হয় তাহা অন্তরেও জপ হইয়া থাকে, সেই মালার ক্রম মহানির্ব্বাণ তন্ত্র এইরূপে দিয়া থাকেনঃ

"মালা বর্ণময়ী প্রোক্তা কুণ্ডলী সূত্রযন্ত্রিতা।
সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ॥
অষ্টবর্গান্তিমৈর্ব্বর্ণৈঃ সহমূলমথাষ্টকং।
এবমষ্টোত্তরশতং জপ্তা তেন সমর্পয়েৎ॥
সর্ব্বান্তরাত্মনিলয়ে স্বাহা জ্যোতিঃস্বরূপিণী।
সমর্প্য জপমেতেন সাষ্টাঙ্গং প্রণমেদ্ধিয়া॥"

অর্থঃ—শরীরের যে যে স্থান হইতে বর্ণগুলি উচ্চারিত হয়, সেই সেই স্থান স্থিত মাতৃকা বর্ণসহ মূলমন্ত্রগুলি কুণ্ডলিনী জ্ঞান প্রবাহ সংযুক্ত নাড়িতে গ্রথিত আছে। এই বর্ণময়ীমালা চিন্তা করিয়া অনুস্বারের সহিত বর্ণ ও মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। অষ্টবর্গের পঞ্চাশৎ বর্ণ অনুলোম অর্থাৎ অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত একবার জপ করিয়া, ক্ষকার হইতে অকার পর্য্যন্ত বিলোম ক্রমে পুনরায় জপ করিয়া, শেষে অবর্গের অ, কবর্গের ক, চবর্গের চ, টবর্গের ট, তবর্গের ত, এবং পবর্গের প, যবর্গের য, শবর্গের শ, এই অষ্টবর্গের আদি মূল অক্ষর বিন্দু সহযোগের জপ করিলে এক শত অষ্ট জপ হইবে। এই সমস্ত মাতৃকা বর্ণকে স্বাহা নামি জ্যোতির্ম্ময়ী অর্থাৎ জ্ঞানময়ী ভাবিয়া অন্তরাত্মাতে লয় করিবে। এই সমস্ত জপ সেই আত্মাতে সমর্পণ করিয়া, বুদ্ধি সহযোগে একাগ্র হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে।

এই রূপে অন্তরের ক্রিয়া জ্ঞানময় হইলে, পরে অক্ষরগুলিকে মাতৃকা-স্বরূপীও ভাব প্রকাশক বীজগুলিকে এবং উচ্চারিত শব্দগুলিকে, আত্মাতে লয় করিতে কি ভাব অবলম্বন হয়, তদ্বিষয়ে নিত্যতন্ত্র বলিতেছেন :—

"শব্দাখ্যাং মাতৃকারূপং সম্বিদগ্নৌ ততো হুনেৎ।
অক্ষরানীহ মে দেবি! নিঃশব্দং ব্রহ্মজায়তে॥

অর্থঃ—অক্ষর ও শব্দ ভাবীয় মাতৃকারূপী বর্ণশক্তিকে জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে, হে দেবি! এই সংসারে সেই অবস্থায় যে নিশ্চল ও নিঃশব্দ অবস্থার উদয় হয়, তাহাকেই আমার মতে ব্রহ্মভাব কহে।

বাহ্যমালা হইতে অন্তর্মালা জপ করিয়া ক্রমে মুক্ত কেমন করিয়া

হওয়া যায়, তাহার সঙ্কেত যথা শাস্ত্র দেখান হইল। অতএব এইরূপ মালা ধারণের ও জপনের নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে। পূর্ব্বে যে এক মন্ত্র জপের কথা বলা হইয়াছে, তাহার তত্ত্ব অতিশয় কঠিন, তবে অতি সামান্য ভাবে কেবল সকলের গোচর করিতে এই স্থানে বলা হইতেছে। সোঽহং বা হংসঃ এই মন্ত্রই এক মন্ত্র জপের প্রধান বীজ হইতেছে। এই হংস মন্ত্রজপকে অজপা কহে। এই মন্ত্র অন্য বর্ণাদির ন্যায় উচ্চারণ করিয়া জপ করিতে হয় না; এই জন্য ইহার নাম অজপা হইতেছে। আমাদের জন্মকাল হইতে এই যে শ্বাস ও প্রশ্বাস ক্রিয়া হয়, উহাতে নিঃশ্বাস লইবার সময়ে যে বায়ুঘর্ষণে শব্দ হয় তাহাকে হং কহে। আর প্রশ্বাসকালে যে শব্দ হয় তাহাকে সঃ কহে। উহাকে বিলোমে উচ্চারণ করিলে অর্থাৎ প্রশ্বাস অগ্রে করিলে সঃ উচ্চারণ হয় এবং পরে নিশ্বাস লইলে হং এই উচ্চারণ হইয়া থাকে। তখন সোঽহং এই মন্ত্র হয়। একই মন্ত্র অনুলোম উপায়ে উচ্চারিত হইলে "হংসঃ" মন্ত্র হয়; আর বিলোমে উচ্চারিত হইলে "সোঽহং" এই শব্দ প্রকাশ হইয়া থাকে। এই শ্বাসপ্রশ্বাসবলেই আমাদের প্রাণাদির, দেহের, মনের, জীবাত্মার এবং পরমাত্মার সংঘটন এই দেহমধ্যে হয় বলিয়া হংসঃ বা সোঽহং মন্ত্র জপ জ্ঞানীর পক্ষে নিতান্ত বিহিত হইয়াছে। দক্ষিণামূর্ত্তি তন্ত্রে এই হংসঃ মন্ত্রের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেনঃ—

"হংসঃ পদং পরেশানি প্রত্যহং প্রজপেন্নরঃ।
মোহবন্ধং ন জানাতি মোক্ষস্তস্য ন বিদ্যতে॥
শ্রীগুরোঃ কৃপয়া দেবি, জ্ঞায়তে জপ্যতে যদা।
উচ্ছাসনিঃশ্বাসতয়া তদা বন্ধক্ষয়ো ভবেৎ॥
এক বিংশতি সাহস্র্যং ষট্‌শতাধিকমীশ্বরি।
জপতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাং॥
উৎপত্তিশ্চ জপারম্ভো মৃত্যুস্তস্য নিবেদনং।
বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ॥"

অর্থঃ—হে পরেশানি! এই যে 'হংস'পদ ইহা যদি প্রত্যহই মানবে জপ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি মোহরূপী বন্ধন জানে না এবং তাহার মুক্তির জন্য কোন চেষ্টার আবশ্যক থাকে না। শ্রীগুরুর কৃপায় যদি এই হংসমন্ত্রতত্ত্ব সাধকে জ্ঞাত হয় বা জপ করে, তাহা হইলে প্রতি শ্বাস ও প্রশ্বাসে সাধকের ভববন্ধন ক্ষয় হইয়া থাকে। হে ঈশ্বরি! যিনি মুক্তিরূপী আনন্দ দান করিতে পারেন এবং প্রকৃতি হইতে পরা বিশুদ্ধা শক্তি হইতেছেন, এই শ্বাস ও প্রশ্বাস যোগে প্রত্যহ জীবে সেই ব্রহ্মময়ীর হংস মন্ত্র একবিংশতি সহস্র ছয় শত বার জপ করিতে পারে। অধিক কি এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে জীবের জন্ম হইয়াছে, এবং মৃত্যুকালে ইহা শেষ হইবে অর্থাৎ প্রকৃতিতে নিবেদিত হইবে। হে দেবেশি! কর বা পদার্থ মাল্য জপ হইতেও এই জপ সাধকের মহাসিদ্ধিকারী হইতেছে।

এই অজপা নামে হংস মন্ত্রও পূর্ব্বোক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম সাধনভেদে প্রয়োগ হইয়া থাকে। যখন ভাবনাহীন অথচ সামান্য নিঃশ্বাসরূপে প্রকাশ হয়, তখন ইহা ব্যক্ত নাম ধারণ করে, যখন অন্তরে চিন্তায় প্রয়োগ হয়, তখন ইহা গুপ্তানাম ধারণ করে। সেই অবস্থা উপস্থিত হইলে মোক্ষলাভ হয়। যথা নিরুত্তর তন্ত্রেঃ—

"হং কারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
ষট্‌শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতি॥
অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী।
অজপা দ্বিবিধা দেবি ব্যক্তা গুপ্তা ক্রমেন চ॥
ব্যক্তা চ দ্বিবিধা প্রোক্তা শব্দজ্যোতিঃ স্বরূপিণী।
অজপার্থময়ী গুপ্তা বহ্নিজায়া প্রকীর্ত্তিতা।"

অর্থঃ—হংকার শব্দে শ্বাস বহির্গমন ও সকার শব্দে অন্তরে প্রবেশ করণ। এই নিয়মে একবিংশতি সহস্র ছয় শত হংসঃ মন্ত্রজপ জীবের প্রত্যহ ঘটিয়া থাকে। এইঅজপা নামক মন্ত্র যাহা গায়ত্রী স্বরূপ, তাহা যোগানুষ্ঠানকারীগণের মোক্ষদায়িনী হইতেছে। সেই অজপা

মন্ত্র জপক্রিয়ায় ব্যক্তা ও গুপ্তা নামে দুইভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শব্দ ও জ্যোতিঃরূপে ব্যক্তা জপ দুই ভাবে সাধন কালে ব্যবহার হয়। কেবল স্বাহা ও স্বধা এই অর্থে গুপ্তা নামে অজপা মন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই যে অজপা জপের কথা বলা হইল, ইহা কুম্ভকাদি যোগবলে আচরণ করিয়া সমাহিত হইলে ইহার জ্যোতির্ম্ময় ভাবনা হইয়া থাকে, এবং অন্তরের তত্ত্ব বুঝিবার কালে ইহাকে শব্দময় বলিয়া চিন্তা করিতে হয়। কোন যজ্ঞাদি কার্য্যে, হোমাদি কালে, স্বাহাদি মন্ত্রে ব্যবহার করিতে হয়। এই সকল উপায়ে শ্বাস ও প্রশ্বাসকে ব্যবহার করিলে প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে বিশুদ্ধতত্ত্ব অন্তরে গৃহীত হইলে, চিত্তশুদ্ধ হইয়া ক্রমে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। আমাদের শাস্ত্রানুসারে অহোরাত্রের গণনা এইরূপ হইতেছে ;—ষষ্টি শ্বাসে একটি প্রাণ হয়। ছয় প্রাণে এক নাড়ি হয়। ষষ্টি নাড়িকাতে এক অহোরাত্র হইয়া থাকে। এই প্রমাণে এক অহোরাত্রে আমাদের একবিংশতি সহস্র ছয় শত শ্বাস ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। আর্য্য ঋষিগণ এই সকল তত্ত্ব আলোচনা করিয়া যাহাতে দেহ, মন, প্রাণ, শ্বাস, প্রশ্বাস সকল ক্রিয়াতেই জীবের ভগবদ্ভাব উপস্থিত হয়, এই জন্যই মাল্য জপের বিধান করিয়াছেন। এই পদার্থ মাল্য ও কর মাল্য বাহ্য ও অন্তর উভয় শুদ্ধির জন্য ব্যবহার করিয়া, যখন মানবে মন্ত্র সিদ্ধি লাভ করিবে, তখন তাহাদের শ্বাস ও প্রশ্বাস সহযোগে জিহ্বা ও করাদি পর্য্যন্ত নিদ্রা ও জাগরণ সকল সময়ে ভগবন্নাম জপে উন্মত্ত থাকিবে। তখন সাধককে আর চেষ্টা করিয়া সময়াসময়ে জপ করিতে হইবে না। এই অবস্থাতেই হংসঃ মন্ত্র জপ হয়। বাহ্য ও অন্তর একেবারে জপময় হইয়া যায়। ভগবান চৈতন্যদেবের শিষ্য যবন হরিদাস ঠাকুর এই সিদ্ধি লাভ করিয়া বাহ্যচৈতন্য হারাইয়া নামে সমাহিত হইতেন এবং যদি কখন নিদ্রিত হইতেন, তখনও তাহার জিহ্বা ও কর প্রভৃতি জপের ক্রিয়া করিত। শ্বাসপ্রশ্বাস “হরি হরি” বলিত। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে বাহ্যচৈতন্য

একেবারে লোপ হইয়া তন্ময় হওয়া যায়। বর্ত্তমান যুগে মালাদি যোগে মন্ত্রসিদ্ধিতে শ্রীচৈতন্যপারিষদের যখন এত মহিমা দেখান হইল, প্রাচীন যুগের সাধন কথা আরো আশ্চর্য্যের হইবে, সেবিষয়ে আর বলা বাহুল্য হইতেছে। এই রূপে মাল্য জপের ও ধারণের প্রকৃত তত্ত্ব কথা বলা হইল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মাল্য ধারণ প্রথা চলিত আছে, তাহার কতকগুলি সাধনের জন্য, আর কতকগুলি সাম্প্রদায়িক চিহ্নস্বরূপ হইতেছে। উভয় সম্প্রদায়ই প্রায় অসংস্কৃত ও অসংযুক্ত মালা ধারণ করিয়া থাকেন। মন্ত্রচৈতন্য বিহীন মালা জপে যে অনুপযুক্ত এ কথা পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে। এক্ষণে শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের জপের মালা সকল লোকের সম্মুখে দেখাইয়া কণ্ঠে ধারণ করেন বা ঝুলিত রাখেন, ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রের অসম্মত, জপ মাল্য অন্যকে দেখান দূরে থাকুক, স্বয়ং গুরুকে পর্য্যন্ত দেখাইতে নিষেধ আছে, যথা বারাহীতন্ত্রে :—

"ইত্যুক্ত্বা পরিপূজ্যাথ গোপয়েদ্যত্নতো গৃহী।
স্বমন্ত্রঞ্চাক্ষমালাঞ্চ গুরোরপি নাদর্শয়েৎ।"

অর্থ :—পূর্ব্বোক্ত উপায়ে মাল্য পূজা, ধ্যান, ও নমস্কার করিয়া গৃহীসাধক যত্নে উহাকে গোপনে রক্ষা করিবে। এমন কি নিজ মন্ত্র ও অ হইতে ক্ষকার রূপী বীজ জপার্থ মালা নিজ গুরুকেও দেখাইবে না।

আমরা শাস্ত্রের মধ্যে সাধন মার্গে কেবল মাতৃকা মন্ত্র জপ, বীজ মন্ত্র জপ, তত্ত্ব মন্ত্র জপ, গায়ত্রী জপ এবং হংসমন্ত্রাদি জপের কথাই দেখিতে পাই কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ প্রচলিত কালী, দুর্গা, শিব, বা হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি বিশেষ নাম করিয়া জপের বিধি শাস্ত্রে দেখা যায় না। বর্ত্তমান গুরুগণ যেমন অসংস্কৃত মাল্যধারণ ও জপের বিধি শিষ্যগণকে দিয়াছেন, সেইরূপ প্রত্যেকের বীজমন্ত্রোক্ত দেবতার নামে যে সকল বীজচিহ্ন থাকে, তাহা ত্যাগ করাইয়া কেবল নাম মাত্র গ্রহণে অনুমতি করিয়াছেন। ইহাতে গৌণফল অর্থাৎ নাম জপে

প্রবৃত্তি মাত্র আসিতে পারে; প্রাচীন সাধুগণে ও হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের সাধুগণে, যে সিদ্ধি জপযোগে লাভ করিয়াছেন, তাহা কখনই এই ভাবের জপে লাভ হইতে পারে না। কারণ অক্ষর পরিভ্রষ্ট বা উচ্চারণ ভ্রষ্ট হইলে মন্ত্র যখন অশুদ্ধ ও ফলহীন হয়, তখন ইষ্টদেবতা, বীজের অঙ্গহানি করিয়া বা মন্ত্রচৈতন্য না করিয়া এবং মাল্য সংস্কার না করিয়া জপ করিলে কেমন করিয়া সাধক ফল লাভ হইতে পারে। এ বিষয়ে গোতমীয়তন্ত্র বলিতেছেন ঃ—

"চৈতন্য রহিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তাবর্ণাস্তু কেবলং।
ফলংনৈব প্রযচ্ছন্তি লক্ষ কোটী জপৈরপি ॥'

অর্থ ঃ—যে মন্ত্রে চৈতন্য প্রদান করা হয় নাই এবং তৎকৌশল শিক্ষা করা হয় নাই, তাহা কেবল বর্ণ মাত্র হইতেছে। সেই মন্ত্র লক্ষ বা কোটী জপেও কোন ফল প্রদানে সক্ষম হইতে পারে না।

অতএব বহু অন্বেষণে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান যুগে শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি করণকারণ শাস্ত্রীয় হইলেও তাহা যথা শাস্ত্র অনুষ্ঠিত হয় না; কেবল লোকাচার স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দেবতার নাম মাত্র লইয়া যে ভাবে জপাদি কার্য্য হয়, তাহা যে কেবল রুচি উৎপাদনের জন্য বর্ত্তমান গুরুগণ উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান বৈষ্ণব পুস্তকে ও কিংবদন্তিতে শুনা যায়ঃ—যথা —

"নামেরুচি জীবে দয়া বৈষ্ণব লক্ষণ।"
"মাগুরমাছের ঝোল, ভর যুবতীর কোল
বল্‌বে হরি বোল।" ইত্যাদি।

নাম জপ দ্বারা তদ্বিষয়ে রুচি মাত্র উদ্দীপনার্থ বর্ত্তমান নামজপ প্রণালী সমাজে প্রচলিত আছে; এবং সেই প্রণালী কেন প্রচলিত তাহাও বলা হইল, বর্ত্তমান যুগে মানব এত ভোগপ্রিয় যে, নামাভাসে জপ করিতেও চায় না, তজ্জন্য রুচি মাত্র উৎপাদন করিতে বৈষ্ণবগুরু উপদেশ দিয়াছেন যে ঃ-মৎস্যাদি খাও, আর যুবতী সম্ভোগই

কর,—ইহারই সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম কর; ঔষধ যেমন মিষ্টান্নের সহিত শিশুকে খাওয়াইলে তাহার রোগ ক্ষয় করে, তদ্রূপ ভোগীর ভোগ, হরি নামে রুচি হইলে ক্ষয় হইবে। রুচি হইলে সেই সাধক অন্যার্থে ঐ শ্লোক দেখিবে অর্থাৎ একদিকে মৎগুর মৎস্যাদির ঝোলের ন্যায় আসক্তি প্রিয় অন্ন ব্যঞ্জন বর্ত্তমান; অন্যদিকে পরিপূর্ণ কামোদ্দীপনকারিণী যুবতী বর্ত্তমানা; এতদুভয়ের মধ্যে গৃহী হরিনাম করিতে করিতে, ঐ সকল ভোগাসক্তির মধ্যে হরিনামে যখন রুচি পাইবে, তখনই তাহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে ইহা বুঝিবে।

কালি, দুর্গা, হরি, কৃষ্ণ ইত্যাদি যে দেবতার নাম, তাহা নামাভাস মাত্র, প্রণবাদি ও বিভক্তি সংযুক্ত বীজ না হইলে প্রকৃত দেবতার নাম হয় না। নামাভাসের জপে প্রবৃত্তি মাত্র উপস্থিত হয়, একথা ভাগবতের অজামিল উপাখ্যানে বিবৃত আছে। অতএব বর্ত্তমান সমাজের উচিত যে,—যাহাদের একটু জ্ঞান হইয়াছে, তাহারা মাল্যসংস্কার করিয়া মন্ত্র সংযুক্ত দেবতার নাম মাতৃকাবর্ণের সহিত জপ করেন, এ পর্য্যন্ত মালার বিষয় যাহা বলা হইল, তাহাতে একছড়া মালারই প্রথা বর্ণিত হইল, শাস্ত্রে সাধন পক্ষে তাহাই বিধান করিয়াছেন, আমরা সমস্ত বৈষ্ণব ও শক্তিশাস্ত্র যতদূর পারিলাম দেখিলাম, কোথাও দুই, তিন, চারি বা পঞ্চ কণ্ঠি মাল্য ধারণের কথা নাই। তুলসী, মণি, স্বর্ণ, রুদ্রাক্ষ বা যে কোন পদার্থমাল্য শাস্ত্র বিহিত করিয়াছেন, সকলের পক্ষে একছড়া গ্রন্থনের বিধি দিয়াছেন; তাহাই পূজা কালে কণ্ঠে ধারণ করিবেন এবং জপকালে করে ধারণ করিয়া শেষে গোপনে রক্ষা করিবেন। আর এক বিধি শাস্ত্রে আছে, তাহাতে সদা সর্ব্বদা কণ্ঠে ধারণের কথা উল্লেখ আছে। সে মালা জপে প্রয়োগ হয় না, তাহাতেও এক কণ্ঠি ভিন্ন দুই কণ্ঠির কথা উল্লিখিত হয় নাই, স্কন্দপুরাণের কার্ত্তিক মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে মাল্য মহিমা বর্ণনাকালে শ্রীব্যাসদেব দুই কণ্ঠি মাল্য ধারণের কথা বলিয়াছেন, তাহা এক পদার্থের নহে। দুই পদার্থের দুই কণ্ঠি বলা হইয়াছেঃ—যথাঃ—

"মালা যুগ্মঞ্চ যো নিত্যং ধাত্রী তুলসী সম্ভবং।
বহতে কণ্ঠদেশেচ কল্পকোটি দিবং বসেৎ॥"

অর্থঃ—ধাত্রী ফলের এক ও তুলসীর এক, যুগল মালা যে ব্যক্তি কণ্ঠে ধারণ করে, সে ব্যক্তি কোটি কল্প স্বর্গ বাস করে।

বর্ত্তমান সমাজে যে বহু কণ্ঠীর ব্যবহার দেখা যায়, তাহা বর্ত্তমান গুরুগণের লৌকিকী প্রথা হইতেছে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে গোস্বামী প্রভুগণ আপন আপন শিষ্যগণকে চিনিয়া লইবার জন্য শাস্ত্রোক্ত তুলসী মাল্য পরাইয়াছেন বটে, কিন্তু সেই শিষ্য কোন বিষ্ণুমন্ত্রের ভাবে; বা পরিবারের অন্তর্গত, ইহা গ্রন্থি দর্শনে মীমাংসিত করিবেন বলিয়া, বহু কণ্ঠির ব্যবস্থা দিয়াছেন। এক কণ্ঠী তুলসী বা বিষ্ণু পদার্থের মালা ধারণ করিলে, কেবল বৈষ্ণব বুঝায়। দুই কণ্ঠি ধারণ করিলে রাধাকৃষ্ণ যুগল মন্ত্রের উপাসক বুঝায়। তিন কণ্ঠি ধারণ করিলে স্বগণ সহিত রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রের উপাসক বুঝায়। পঞ্চ কণ্ঠিতে, শান্ত দাস্য সৌখ্য বৎসল ও মধুর নামক পঞ্চরসের উপাসক বুঝায়। কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য্য বলেন; এক ছড়া মাল্যে কেবল মধুর রস, দুই ধারণ করিলে, দাস্য ও মধুর, তিন ধারণ করিলে সৌখ্য দাস্য ও মধুর, চারি ধারণ করিলে দাস্য, সৌখ্য বৎসল ও মধুর বুঝায় এবং পঞ্চমে সমস্ত রসের অধিকারী বুঝাইয়া থাকে। যে রসে গোস্বামী পরিবার অধিকারী আছেন, তাঁহাদের শিষ্যগণ তদনুরূপ চিহ্ন ধারণ করিতে মাল্য ও তিলকাদি ধারণ বিধি তাঁহারা দিয়া থাকেন। ইহাতে বিশেষ বলা হইল যে, বর্ত্তমান মাল্য ও তিলক ধারণ প্রণালী কেবল রুচি উৎপাদন করিতে; মুক্তি পর্য্যন্ত সাধনের উপযোগী হইতে হইলে, যথা শাস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। এক্ষণে তিলক ধারণের প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাউক। তিল ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় করিয়া তিলক শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। তিল ধাতুর অর্থ প্রাপ্ত হওয়া। যে চিহ্ন ধারণ করিতে করিতে মন ভগবদ্ভক্তকে লাভ করে, তাহাকে তিলক কহে। অস্মদ্দেশে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌরাদি সকল সম্প্রদায়েরই

তিলক ধারণ বিধি বিহিত আছে। তিলক ধারণের দ্বিবিধ তাৎপর্য্য হইতেছে। যেমন মাল্যাদি অঙ্গে ধারণ করিলে, পদার্থ গুণ ও তদ্ব্যবহারে মনের ক্রিয়া সেই বস্তু সেবায় প্রযুক্ত ও পবিত্র হয়। সেইরূপ বস্তু তিলক ধারণেও দ্বিবিধ উপকার আছে। আমাদের শরীরে কাহারো মতে দ্বাদশটি, কাহারও মতে ত্রয়োদশটি প্রধান মর্ম্ম স্থান আছে। সেই সকল স্থানে তিলক প্রদান করিলে, যে সকল পদার্থে তিলক দেওয়া হয়, তাহার ভৌতিক গুণে দেহ পবিত্র হয় এবং ঐসকল তিলক চিহ্নের সাহায্যে ভগবৎস্মৃতি সর্ব্বদা উদিত হওয়ায় মানসিক পবিত্রতা উপস্থিত হইয়া থাকে। এমন কি তিলক না করিলে সকল সম্প্রদায়ের গুরুগণই তাহার মুখ দর্শন করিতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন।- যথা মৎস্যসূক্তেঃ—

"অকৃত্বা তিলকং ভালে চণ্ডালং সমুপশ্যতি।
পুনঃ স্নানন্তু কর্ত্তব্যং বিষ্মূত্রোৎসারণে যথা॥"

তথা পদ্মপুরাণে "ত্রিপুণ্ড্রং যস্য বিপ্রস্য ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ন দৃশ্যতে।
তদ্দৃষ্ট্বাপ্যথ স্পৃষ্ট্বা সচেল স্নানমাচরেৎ॥"

অর্থাৎ যে সাধক ললাটে তিলক চিহ্ন ধারণ না করে, সে চণ্ডালের ন্যায় অপবিত্র হইয়া থাকে; বিষ্ঠা মূত্রত্যাগের পর যেমন স্নান ও শৌচাদির প্রয়োজন হয়, তাহাকে যে ব্যক্তি দর্শন করে, তাহার পুনরায় স্নান করা কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণের শিরোদেশে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বা ত্রিপুণ্ড্র রেখা না দেখা যায়, তাহাকে দেখিলে বা স্পর্শ করিলে পরিধেয় বস্ত্র সহিত অবগাহন স্নান করিতে হয়।

এই পবিত্র চিহ্নযুক্ত তিলক, মৃত্তিকা বা পবিত্র জলে রচনা করিতে হয়। যাহারা অতি গোপনে সাধন করেন, তাঁহারা বাহ্যচিহ্ন কাহাকেও দেখান না, বলিয়া জলে করিয়া থাকেন। যাঁহারা একরূপ চিত্ত স্থির করিয়াছেন যে, কোন বাহ্য চিহ্নে প্রাণের সাধন প্রকাশ করিতে চাহেন না। তাঁহাদের পক্ষে অন্য কোন রঞ্জিত বর্ণে তিলক ধারণের প্রয়োজন নাই। কারণ তিলক ধারণের উদ্দেশ্যই হইতেছে, যে,

দেহের যে দিকে চাহিব সেই দিকেই ঈশ্বরের চিহ্ন দেখিয়া মন ও দেহকে কুপথ ও কুবিষয় হইতে সাবধান করিব। তুলসীতলস্থ, পবিত্র নদী গর্ভস্থ, পবিত্রতীর্থস্থ মৃত্তিকা এবং গোরোচনা, চন্দন ও ভস্ম প্রভৃতিতে তিলক করিতে শাস্ত্র বিধি দিয়াছেন। এই সকল দ্রব্যই আমাদের বাহ্য গ্লানি শোধক হইতেছে। যে কয়েকটি মর্ম্মস্থানে তিলক ধারণ করিতে হয়। তদ্‌যথা মৎস্যসূক্তে:—

"ললাটে প্রথমং দদ্যান্মূর্দ্ধ্নি দদ্যাত্ততো হৃদি।
কণ্ঠে চ শ্রোত্রয়োর্বাহ্বোর্বাহুমূলদ্বয়েঽপি চ॥
নাভৌ পৃষ্ঠে চ সংদধ্যাৎ পার্শ্বয়োশ্চ যুগং যুগং।
তিলকানি লিখেচ্চৈব মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥

অর্থঃ—প্রথম ললাট দেশে তিলক ধারণ করিবে; পরে মস্তকে, পরে হৃদয়ে, পরে কণ্ঠে, পরে উভয় কর্ণে, পরে উভয় বাহুদেশে, পরে উভয় স্কন্ধে, পরে নাভিতে, পরে পৃষ্ঠ দেশে, পরে উভয় পার্শ্বে, ক্রমান্বয়ে তিলক ধারণ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাঙ্গে তিলক ধারণ করিতে হইলে কোন অঙ্গে কোন্ চিহ্ন ধারণ করিতে হয় তাহা মৎস্যসূক্ত বলিতেছেন:—

"ভালে দীপশিখাকারং বাহুভ্যাং বিল্বপত্রবৎ।
হৃদয়ে কমলাকারং গ্রীবায়াং চন্দ্রমুদ্দিশেৎ

অর্থঃ—ললাটে দীপ শিখার ন্যায়, বাহুযুগলে বিল্বপত্রের ন্যায়, হৃদয়ে পদ্মের ন্যায় এবং গ্রীবায় চন্দ্রের ন্যায় তিলক চিহ্ন ধারণ করিবে।

এই বিধি সকল সম্প্রদায়েরই ব্যবহার্য্য কিন্তু বৈষ্ণব পক্ষে পৃথক বিধি করিয়াছেন। উক্ত মৎস্যসূক্তেই লিখিত আছে যথা:—

"ললাটেতু গদাকার্য্যামূর্দ্ধ্নি চাপংশরন্তথা।
নন্দকঞ্চৈব হৃন্মধ্যে, শংখং চক্রং ভুজদ্বয়ে॥"

অর্থঃ—ললাটে গদাচিহ্ন, মস্তকে ধনু ও শর, হৃদয়ে নন্দকাস্ত্র এবং ভুজদ্বয়ে শংখ ও চক্রচিহ্ন ধারণ করিবে।

এতদ্ভিন্ন আর সকল অঙ্গে কেবল অঙ্গুলি সংযোগে পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকাদির চিহ্নমাত্র ধারণ করিতে হইবে। এই যে ললাট দেশের তিলক চিহ্নের কথা বলা হইল, উহা শাস্ত্র মধ্যে বহু উপায়ে বর্ণিত হইয়াছে। দীপশিখা, গদা, উদ্ধপুণ্ড্র এবং ত্রিপুণ্ড্র এই চারিটি চিহ্ন ধারণের বিশেষ প্রয়োজন ললাট স্থানে শাস্ত্র কহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের পক্ষে উদ্ধপুণ্ড্র শৈবের পক্ষে ত্রিপুণ্ড্র এবং অন্যান্য সকল শ্রেণীর ও জাতির পক্ষে গদা ও দীপশিখা ললাটে ধারণ বিহিত হইয়াছে। কেবল ব্রাহ্মণ, শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব সকলেই ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে, একথা আদেশ করিয়াছেন। যথা স্কন্দপুরাণে ঃ—

বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণানামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে।
অন্যেষান্তু ত্রিপুণ্ড্রং স্যাদিতি ব্রহ্মবিদোবিদুঃ॥”

অর্থঃ—ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিগণে ইহা বিশেষ জ্ঞাত আছেন যে, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণেরই উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ধারণ করা উচিত, এবং অন্যের পক্ষে ত্রিপুণ্ড্র ধারণই বিধি হইতেছে। কূর্ম্মপুরাণ ত্রিপুণ্ড্রের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতে বলিয়াছেন ঃ—

“বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা শাক্তো বা সৌর এব বা।
ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা পূজাং কুর্ব্বাণো যাত্যধোগতিং॥”

অর্থ ঃ—বৈষ্ণব, শৈব, শক্তে বা সোর যে কেহই হোন না কেন, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র তিলক ধারণ না করিয়া কোন পূজাদি করিলে, নরক লাভ হয়।

যাহা হউক, ললাটের তিলক দীর্ঘ হইবে একথা সকল শাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন। পরে যাঁহার গুরু যেমন উপদেশ দিবেন, তিনি সেই রূপ আচরণ করিবেন। নাসিকার মধ্যভাগ হইতে মূলদেশ সংযুক্ত করিয়া দুইটি রেখা কেশমূল পর্য্যন্ত টানিলে উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক হয়। ইহাকে কেহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের স্থান কহেন। কেহ হরিচরণ, কেহ হরিমন্দিরও কহেন। যথা পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডে ঃ—

"নাসিকা কেশ পর্য্যন্তং উর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনং।
মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরং॥
তত্রৈবঃ—বামভাগে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষভাগে সদাশিবঃ।
মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ॥
তত্রৈব ঃ—একান্তেন মহাভাগঃ সর্ব্বভূতহিতেরতঃ।
সান্তরালং প্রকুর্ব্বন্তি পুণ্ড্রং হরিপদাকৃতিং॥"

অর্থঃ—মধ্যে ছিদ্র রাখিয়া নাসিকা হইতে কেশ পর্য্যন্ত উভয় রেখা অঙ্কিত করিলে অতি সুশোভন যে উর্দ্ধ পুণ্ড্র তিলক হয়, তাহাকে হরিমন্দির বলিয়া জানিবে, এই জন্য উভয় রেখার মধ্যভাগ শূন্য রাখিবে। ঐ তিলকের বাম ভাগে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, দক্ষিণভাগে মহেশ্বর এবং মধ্যস্থলে বিষ্ণু আছেন, এই চিন্তা করিবে। যে সকল সাধক সর্ব্ব প্রাণীর হিতকারী ও মহা ভাগ্যবান্ হইতেছেন, তাহারা গোপনে এই উর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করিয়া হরিপদাকৃতি সম্পন্ন বলিয়া চিন্তা করিবেন। এতদ্ব্যতিত যজুর্ব্বেদায় হিরণ্যকেশীয় শাখাতে এই তিলককে হরিপদরূপী বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে যথা,—

"হরেঃ পদাক্রান্তিং আত্মানো নিধায় যন্মধ্যে ছিদ্রমুর্দ্ধপুণ্ড্রং যো ধারয়তি স পরস্য প্রিয়ো ভবতি, স পুণ্যবান্ ভবতি, স মুক্তিভাগ্ ভবতীতি।"

অর্থঃ—যে সাধক উর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে "হরিপদ যেন সমস্ত দেহকে আক্রমণ করিয়া আছেন" এইরূপ ভাবনা মনে করেন। সেই ব্যক্তি পরমাত্মার প্রিয় হয়েন, তিনি পুণ্যবান্ হয়েন, তিনি মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

এইরূপে যথা শাস্ত্রানুমোদিত উপায়ে আমরা সামান্যতঃ তিলক ধারণের কারণ ও সঙ্কেত নির্দ্দেশ করিলাম। বাহ্য তিলক ধারণ করিতে যে যে অঙ্গে, যে সকল চিহ্ন ধারণ করিতে হয়, সেই সেই চিহ্ন অপেক্ষা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ধ্যান করিতে হয়। এই ধ্যানে চিত্তের বিশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। দ্বাদশাঙ্গে তিলক ধারণ করিয়া যে অঙ্গে যে দেবতাকে ধ্যান করিতে হয়, তদ্বিষয়ে পদ্ম পুরাণ বলিতেছেন:—

"ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু, গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনঃ।
ত্রিবিক্রমং স্কন্ধয়েত্তু, বামনং বামপার্শ্বকে॥
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ।
তৎ প্রক্ষালনতোয়ন্তু বাসুদেবেতি মূর্দ্ধনি॥

অর্থঃ—ললাটে কেশবমূর্ত্তির ধ্যান করিবে। উদরে নারায়ণ, বক্ষঃস্থলে মাধব, কণ্ঠকূপে গোবিন্দ, দক্ষিণকুক্ষিতে ও বাহুতে বিষ্ণু ও মধুসূদন, দক্ষিণ স্কন্ধে ত্রিবিক্রম, বামপার্শ্বে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বাম স্কন্ধে হৃষীকেশ মূর্ত্তির ধ্যান করিবে। পৃষ্ঠে পদ্মনাভ, কটীতটে দামোদর এবং চিহ্নান্তে অবশিষ্ট তিলকমৃত্তিকার ধৌতজল লইয়া মস্তকে প্রদান পূর্ব্বক তথায় বাসুদেব মূর্ত্তির ধ্যান করিবে।

এই গেল উর্দ্ধপুণ্ড্র হইতে অন্যান্য পূর্ব্বোক্ত কথিত তিলক চিহ্ন ধারণের ধ্যান। কিন্তু ত্রিপুণ্ড্র ধারণবিধি কিছু পৃথক। শরীরের ত্রয়োদশাঙ্গে তিনটি রেখার ন্যায় তিলক ধারণ করিলে তাহাকে ত্রিপুণ্ড্র বলে। অস্মদ্দেশে কেবল শৈবে ও শাক্তে এই তিলক ব্যবহার করেন। কিন্তু শাস্ত্রে বৈষ্ণবাদি সকলের ধারণেরই বিধি দেখা যায়। শাস্ত্র ও গুরুবাক্য মতে যাহা বিবেচনা সিদ্ধ হইবে তাহাই ধারণ করা উচিত হয়? এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই তিলক কেবল ভস্মে রচনা করিতে হয়। এই তিলক প্রণব ও ত্রিবেদের সঙ্কেত চিহ্ন স্বরূপ হইতেছে। ললাটদেশে উভয় কর্ণস্থল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া ভ্রূযুগের উপর দিয়া তিনটি তির্য্যক্ রেখা ভস্মে রচনা করিলেই ত্রিপুণ্ড্র হইল। কালাগ্নিরুদ্রোপনিষৎ এই তিলককে বেদ ও প্রণবময় এই ভাবে বলিয়াছেন :—

"যা স্যাৎ প্রথমা রেখা সা গার্হপত্যাগ্নিশ্চাকারোভূর্ল্লোকো রজঃ
ক্রিয়া [illegible] প্রথমং সবনং মহেশ্বরঃ।

যাস্যাদ্দ্বিতীয়া রেখা সা দক্ষিণাগ্নিরুকারঃ। সত্যমন্তরীক্ষমন্ত-রাত্মাচেচ্ছাশক্তির্যজুর্ব্বেদঃ। মাধ্যন্দিনং দ্বিতীয়সবনং সদাশিবদেবেতি।

যাস্যাত্তৃতীয়া রেখা, সা আহবনীয়োঽগ্নির্ম্মকারস্তমোদৌঃ পরমাত্মা জ্ঞানশক্তিঃ সামবেদ স্তৃতীয়সবনং শিবদেবেতি॥"

অর্থ:—এই ত্রিপুণ্ড্রের মধ্যে যে প্রথম রেখা অঙ্কিত হয়, তাহাতে গার্হপত্যাগ্নি বুঝায়, প্রণবের প্রথম মাত্রা অকার বুঝায়, ভূর্লোক বুঝায়, আত্মার ক্রিয়াশক্তি ও ঋগ্বেদ বুঝাইয়া থাকে। ইহা প্রথম যজ্ঞের স্বরূপ এবং স্বয়ং মহেশ্বর এই রেখার দেবতা হইতেছেন। এই তিলকের দ্বিতীয়া রেখাকে দক্ষিণাগ্নি বুঝায়। প্রণবের উকার নামক দ্বিতীয় মাত্রা বুঝায়। ইহাকে সত্য ও অন্তরীক্ষ বুঝায় এবং পরমাত্মার ইচ্ছাশক্তি ও যজুর্ব্বেদ বুঝাইয়া থাকে। ইহা মাধ্যন্দিন বেদ শাখোক্ত যজ্ঞস্বরূপ, সদাশিব ইহার দেবতা হইতেছেন। এই তিলকের তৃতীয় রেখাকে আহবনীয়াগ্নি বুঝায়, প্রণবের মকার মাত্রা বুঝায়, অন্ধকার ও আলোক বা সংসার ও স্বর্গ বুঝায়, পরমাত্মার জ্ঞানশক্তি এবং সাম বেদ বুঝায়, ইহাতে যজুর্ব্বেদের তৃতীয় যজ্ঞ বুঝাইয়া থাকে; এবং স্বয়ং শিবমূর্ত্তি এই রেখার দেবতা হইতেছেন।

আর্য্য ঋষিগণ এইরূপ সকল প্রকার তিলক ধারণ জনিত অনুষ্ঠানে বাহ্য ও অন্তর বিশুদ্ধির কি অপূর্ব্ব ভাবই প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। তিলক ও মাল্যে অন্তরে, বাহিরে, ও জল্পনায় সকল অবস্থাতেই আমরা ব্রহ্মের সকল ঐশ্বর্য্যময় হইয়া থাকি, এই তত্ত্ব ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় ও সমাহিত হইয়া, পরমাবস্থা লাভ করিতে পারি। এই ত্রিপুণ্ড্র তিলক বর্ণনায় ললাটে যে ভাবে ধারণ করা হইল। তাহাতে সকল বেদ, সকল যজ্ঞ, সকল ঈশ্বর শক্তি, এমন কি! ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বপর্য্যন্ত ধারণ করা হইল। এই তিলক দেহের ত্রয়োদশ স্থানে ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন দেবতার ধ্যান করিতে হয়। এই প্রমাণ বায়বীয় সংহিতার এই ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। যথা:—

"ললাটে ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়ং হৃদয়ে হব্যবহানঃ।"

নাভৌ, স্কন্ধে, গলে, পুষা ; রুদ্রো দক্ষিণবাহুকে ॥
আদিত্যো বাহুমধ্যে চ, শশী চ মণিবন্ধকে।
বামদেবো বামবাহৌ বাহুমধ্যে প্রভঞ্জনঃ।
মণিবন্ধে চ বসবঃ পৃষ্ঠদেশে হরঃ স্মৃতঃ ॥
শম্ভুঃ ককুদি সম্প্রোক্তং পরমাত্মা শিরঃস্মৃতঃ॥”

অর্থঃ—পূর্ণ ব্রহ্মাবস্থাকে ললাটে ধ্যান করিবে। হৃদয়ে হব্যবহান অগ্নির ; নাভি, স্কন্ধ ও গলে পুষা দেবতার ধ্যান করিবে। দক্ষিণ বাহুর নিম্নে, মধ্যে ও মণিবন্ধে, রুদ্র, সূর্য্য ও চন্দ্র মূর্ত্তির ধ্যান করিবে। বাম বাহুর নিম্নে, মধ্যে ও মণিবন্ধে বামদেব, প্রভঞ্জন ও অষ্টবসু দেবতার ধ্যান করিবে। পৃষ্ঠদেশে হরমূর্ত্তির ধ্যান করিবে। ককুদ দেশে অর্থাৎ ঘাড়ে শম্ভু দেবতার ধ্যান করিবে। শিরস্থলে পরমাত্মার ধ্যান করিবে।

এইরূপে মাল্য ও তিলক ধারণ করিয়া আমাদের সর্ব্বাঙ্গে ভগবচ্চিহ্ন ও তত্ত্বচিহ্ন থাকিলে, আমাদের অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইবা মাত্রেই ভগবদ্ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। যে সকল চিহ্ন বা উপায় অবলম্বন করিলে ; ব্রহ্মময়, ব্রহ্মৈশ্বর্য্য স্বরূপ সর্ব্বদেবময়, সর্ব্ববেদময় ও সর্ব্ব মন্ত্রতত্ত্বময় হওয়া যায় ; যাহা ধারণে ও চিন্তনে বাহ্য ও অন্তরের বিশুদ্ধি ঘটে। কোন বুদ্ধিমান্ তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন ; অতএব উপাসনার্থ ক্রিয়ানুষ্ঠানে এই সকল বিধি নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইতেছে। অস্মদ্দেশে বর্ত্তমান বৈষ্ণব সমাজে, প্রাচীন তিলক বিধির কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যেমন মাল্যের মধ্যে কোন্ শিষ্য বা কোন্ গুরু কোন্ সম্প্রদায় বা শাখার অন্তর্গত এই ইঙ্গিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তদ্রূপ তিলকেও গুরু এবং শিষ্যের শাখা বা সম্প্রদায় বোধক ইঙ্গিত ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন মন্ত্রের অপভ্রংশ করিয়া কেবল দেবতার নাম জপে, বর্ত্তমান গুরুগণ শিষ্যের রুচি মাত্র উৎপাদন করিয়া থাকেন, সেইরূপ বর্ত্তমান ভাবে তিলক গ্রহণ করিলে, তিলকের উপরে রুচি মাত্র হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রানুমোদিত উপায়ে ধ্যান পূজাদি

না করিতে পারিলে, প্রকৃত বাহ্য ও অন্তর শৌচ এবং অজ্ঞান ক্ষয় হয় না। নিয়মিত কার্য্য হয় না বলিয়াই ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ী গুরু ও শিষ্যের এত অবনতি ঘটিয়াছে। যেমন কোন দরিদ্র ব্যক্তি সম্রাটের উচিত বসন ও ভূষণ পরিধান করিয়া পদব্রজে পথে গমন করিলে, লোকে তাহাকে উপহাস করে। সেইরূপ যে সকল নিয়মে মাল্য ধারণ করিলে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও প্রেম লাভ হয়, যে সকল নিয়মে তিলকাদি ধারণ করিলে পরিপূর্ণ প্রেম ও ভক্তিময় হওয়া যায়; সেই সকল নিয়মানুযায়ী অনুষ্ঠান ও ব্যবহার হয় না বলিয়া ঐ সকল পরমার্থ চিহ্ন ধারণ করিয়া, ঘোর পাপাচারী, ঘোর সংসারী হওয়াতে; পূর্ব্বোক্ত পথিকের ন্যায় উপহাসাস্পদ হওয়া যায়। যেমন ঘোর মূর্খ ব্যক্তি সর্ব্ব সমক্ষে কোন পুস্তক লইয়া পাঠ করিবার ভাণ দেখাইলে, লোকে তাহাকে উপহাস করে; তদ্রূপ তত্ত্বরসে রসিক হইতে চেষ্টা না করিয়া, কেবল প্রেম ও জ্ঞানের চিহ্নগুলি ধারণ করিয়া কুকর্ম্মান্বিত হইলে, সে লোকের উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। অতএব এখনও আমাদের সাবধান হওয়া উচিত, দেবচিহ্ন ধারণ করিয়া দেবতার ন্যায় হওয়া উচিত হইতেছে।

অথ যোগাঙ্গ সাধন তত্ত্ব।

তমোগুণাবস্থা হইতে সাত্ত্বিকতায় পরিণত হইতে যে সকল অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয়, আমরা তাহা ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করিলাম। যতগুলি বর্ণিত হইয়াছে তদতিরিক্ত বহু অনুষ্ঠানের কথা শাস্ত্র লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে যাহা বলা হইয়াছে, সে গুলি অতিশয় আবশ্যকীয় এবং ঐ গুলির অনুষ্ঠান ব্যতীত পরিশুদ্ধ হইবার কোন উপায়ই নাই। দান, ব্রত অর্থাৎ একাদশী প্রভৃতির উপবাস, অধ্যাত্ম শাস্ত্রা-

লোচনা প্রভৃতিও ঐ সঙ্গে ব্যবহৃত হওয়া চাই। এই সকল কার্য্যে যে প্রকৃত উপকার হয়, তাহার বিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই। কেবল যোগ সাধন প্রণালী কি! মন্ত্র কি? দেবতা কি? সন্ধ্যা গায়ত্রীর প্রয়োজন কি? এই কয়েকটি বিষয় কিছু গুরুতর ভাব সংযুক্ত ও উপাসনার প্রধান অঙ্গ হইতেছে। ইহা ভাবিয়া ঐ সকল আলোচনা করাই উচিত হইতেছে। প্রথমে কোন্ পূজা করিতে বা সন্ধ্যাদি করিতে আরম্ভ করিলেই; আসন প্রকটন, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ন্যাস, পূরক, রেচক কুম্ভক ইত্যাদি যোগাঙ্গের আবশ্যক হইয়া থাকে। যদিও এই সকল অনুষ্ঠান অতিশয় গুরুতর ভাবযুক্ত, তথাপি সামান্য উপলব্ধির জন্য সংক্ষেপে এই যোগ সাধন তত্ত্বের মধ্যে ঐ গুলির ব্যাখ্যা করা হইতেছে। প্রথমে দেখা উচিত, যোগ কাহাকে বলে? এবং তাহার প্রয়োজন কেন? যুজ্ ধাতু হইতে যোগ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। যুজ্ ধাতুর অর্থ সমাহিত থাকা। যে কৌশল দ্বারা বাহ্যপ্রকৃতি ও সংসার হইতে মনকে পরমাত্মভাবে সমাহিত অর্থাৎ নিমগ্ন রাখা যায়, তাহাকে যোগ কহে। মহর্ষি পতঞ্জলি এই জন্য বলিয়াছেন যে:—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" অর্থাৎ যে কোন উপায়ে, বিষয়াভিনিবিষ্ট বৃত্তিমান্ চিত্তের কথিত বৃত্তিগুলিকে পরমাত্মভাবে নিরোধ করিতে পারিলেই যোগাবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে। যোগ শাস্ত্রের বৃত্তিকার শ্রীমন্মহারাজ ভোজ মহাশয় বলিয়াছেনঃ—"পুং প্রকৃত্যোর্ব্বিযোগোঽপি যোগ ইত্যুদিতো যথা।" অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে পুরুষের পার্থক্য ঘটাইয়া পুরুষকে স্বাধীন করার নামই যোগ হইতেছে। আমাদের উপাসনার প্রকৃত তাৎপর্য্যও তাহাই, অর্থাৎ বিষয় হইতে মনাদি সূক্ষ্মাবস্থাকে গ্রহণ করিয়া ভগবদ্ভাবে সমাসীন করার নামই উপাসনা। পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠানগুলি ব্যবহার করিলে, ক্রমে নিজ পরিত্রাণের জন্য একাগ্র হইলে, ক্রমে অন্তরে শ্রদ্ধা ও বিশুদ্ধি উপস্থিত হইলে, তাহার পরে এই যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্তবিশুদ্ধি একেবারে ঘটাইতে হয়। এই যোগাঙ্গানুষ্ঠানে উপবাস,

নিয়ম এবং কঠোর ভাবসমূহ অবলম্বন করিয়া কায়িক,বাচিক ও মানসিক বিশুদ্ধি ঘটাইতে হয়। অতএব ঘোর তমোগুণীর ইহা অভ্যাস হইতে পারে না। যে মানব আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও মৈথুনাদির জন্য ব্যাকুল থাকে ; যে ব্যক্তি কাম,ক্রোধ,লোভ ও মোহাদি রিপুবর্গে সতত আক্রান্ত থাকে, তাহাদের পক্ষে যোগানুষ্ঠান হইতে পারে না। যাহার সর্ব্বাঙ্গে বা অন্তরে কোন প্রকার রোগ বর্ত্তমান, তাহার যোগানুষ্ঠান হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠান যোগে অন্তর ও বাহির কিছু শ্রদ্ধাপূর্ণ ও বিশুদ্ধ করিয়া, উপযুক্ত গুরুর সমীপে নিজের একান্ত মুক্তির জন্য যোগাভ্যাস করা উচিত হয়। এই যোগানুষ্ঠান কিছু অভ্যস্ত হইলে, কেহ বা একেবারে সন্ন্যাসী হইয়া অরণ্যে ভগবৎ সাধন করেন ; কেহ বা গৃহে থাকিয়া যজ্ঞ ও পূজাদি করিয়া নিয়ত ভগবৎপর মানস হইয়া থাকেন। আমাদের উপদেশ গৃহীর পক্ষেই বিহিত হইতেছে। অতএব গৃহী যোগানুষ্ঠানপর থাকিয়া বিষয় ভোগ করিলেও কোন পাপ তাহাকে অধিকার করিতে পারে না, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু সহজে তাহাকে ক্লেশ দিতে পারে না, শোক ও দুঃখ সতত তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না। সংসারের সকল ক্লেশকে ও অজ্ঞানশক্তিকে তুচ্ছ করিয়া সেই যোগানুষ্ঠানকারী গৃহী ব্যক্তি, আপনার মুক্তি ঘটাইয়া থাকেন। অতএব গৃহীর পক্ষে যতটুকু যোগানুষ্ঠান প্রয়োজন, যে অবস্থাগুলি সন্ধ্যা ও পূজাতে আবশ্যক হয়, তাহাই এই প্রস্তাবে আলোচিত হইতেছে। যোগানুষ্ঠানে আমাদের এই কয়টি অবস্থার আবির্ভাব হয়। বায়ু ধারণাবলে দীর্ঘজীবন লাভ হয়। প্রাণায়ামাদিকালে ভগবদ্বীর্য্য চিন্তায় ভগবদ্ভাবে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। সদাচার ও নিয়মিত ভোগে, কায়ার রোগ ও মনের গ্লানি ক্ষয় হয়। নিয়ত নূতন বায়ু ধারণে ও সেবনে অন্তরের বায়ু, পিত্ত ও কফজনিত দোষের শান্তি ঘটাতে, নাড়ীর বিশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। অতএব দীর্ঘ জীবনে জরা ক্ষয় হইলে, চিত্ত বিশুদ্ধ হওয়ায়,চিরজ্ঞান বিকাশ থাকাতে,বিস্মৃতি ঘটিল না। অতএব দেহত্যাগ করিলেও মৃত্যু নামক বিস্মৃতিযন্ত্রণা

উপস্থিত হইল না। জ্ঞানের বিকাশে শোক, মোহ ও রিপু প্রভৃতিতে আকুল হইতে হয় না। নাড়ী শোধনে বাহ্যদেহের ও মনের গ্লানি নাশ হওয়ায়, রোগাদি উপস্থিত হইতে পারে না। এক যোগানুষ্ঠানে যখন রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং অজ্ঞান ক্ষয় হয়, তখন মানবজীবনে কি না লাভ হইল!! অতএব কি বৈরাগী, কি গৃহী সকলের পক্ষেই যোগানুষ্ঠান সতত কর্ত্তব্য হইতেছে। তমোভাবকে সাধন বলে রজোভাবময় করিয়া অল্প শ্রদ্ধালু ও দেহ বিশুদ্ধ করিয়া এই অনুষ্ঠান অভ্যাস করা, সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত হইতেছে। দত্তাত্রেয় সংহিতা বায়ু ধারণের ফল বলিতেছেনঃ—

"যাবদ্বায়ুস্থিতো দেহে তাবজ্জীবিতমুচ্যতে।
মরণং তস্য নিষ্ক্রান্তিস্ততো বায়ুং নিবন্ধয়েৎ॥
মলাকুলাসু নাড়ীষু মারুতো নৈব মধ্যগঃ।
কথং স্যাত্তন্মলী ভাবঃ কায়শুদ্ধিঃ কথং ভবেৎ॥
শুদ্ধিমেতি যদা সর্ব্বং নাড়ীচক্রং মলাকুলং।
তদৈব জায়তে যোগী প্রাণসংগ্রহণে ক্ষমঃ॥
প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যান্নিত্যং সাত্বিকয়া ধিয়া।
তথা সুষুম্না পার্শ্বস্থা মলাঃ শোধং প্রযান্তিহি॥"

অর্থঃ—যতক্ষণ প্রাণবায়ু আমাদের দেহে থাকে, ততক্ষণ আমরা জীবিত, সেই বায়ু নিষ্ক্রান্ত হইলেই আমরা মৃত হইয়া থাকি। অতএব অভ্যাস বলে সেই প্রাণবায়ুকে অন্তরে আবদ্ধ করা উচিত হইতেছে। কিন্তু যে সকল নাড়ীর পথ দিয়া সেই বায়ু অন্তরে নিরুদ্ধ হইবে, সেই সকল নাড়ীর মধ্যপথ কফাদির মলে একেবারে আবদ্ধ, কেমন করিয়া বায়ুকে তাহার মধ্যে প্রবেশ করা যাইতে পারে? এবং সেই মলীভাব থাকিতে আমি পবিত্র হইলাম, আমার মন ও কায়া বিশুদ্ধ হইল, একথা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে!! যখন বায়ুর অভ্যাস বলে সেই নাড়ীচক্রস্থ মলাকে বিশুদ্ধ করা যাইবে, তখনই সেই যোগানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি চিরজীবনের উপায় রূপী প্রাণবায়ুকে

অন্তরে নিরোধ করিয়া রাখিতে পারিবেন। এই দেহস্থ মলাকে ক্ষয় করিতেই, প্রথমে পবিত্র চিন্তায় সতত প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবহার দ্বারা জ্ঞানচৈতন্য প্রবাহপূর্ণা সুষুম্না নাড়ীর পার্শ্বস্থ মলিনতা বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে। (অতএব কায়শুদ্ধি ঘটিবে।)

এই শ্লোকদ্বারা যোগের ও পবনাভ্যাসের প্রয়োজন কি, তাহা বুঝান হইল। এই প্রাণায়াম অভ্যাসের অধিকারী কেমন করিয়া হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে যোগশাস্ত্র বলিয়াছেন, যেঃ—যম, নিয়ম ও আসন অভ্যস্ত হইলে, ক্রমে প্রাণসংরোধে অধিকার ঘটে। যমাদি কাহাকে বলে তাহার বর্ণনা হউক। পূর্ব্বোক্ত যোগাঙ্গাদি যাহা শ্রীমন্মহর্ষি পতঞ্জলি ঋষি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই সুবোধ্য হইতেছে। অন্যান্য ঋষিগণের প্রণীত ও কথিত যোগশাস্ত্র প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে বুঝিতে বড় সহজ হইবে না। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিতেছেন :—

"যোগানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।

যমনিয়মাসনপ্রণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।"

অর্থ :—কায়িক, বাচিক ও চিত্তের অশুদ্ধি নষ্ট করিবার জন্যই যোগানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, বিশেষ বিবেচনার সহিত তাহা অভ্যাস করিলে চিত্তের মালিন্য দূর করিয়া, জ্ঞানময় হওয়া যায়। অভ্যাস করিবার পক্ষে:—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি অঙ্গ অর্থাৎ উপায় হইতেছে।

যথা পাতঞ্জল দর্শনে:-"অহিংসা সত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।"

অর্থ :—সদাসর্ব্বদা মন হইতে প্রাণিহিংসাভাব ত্যাগ, বাক্য ও মনে কখন মিথ্যা না বলা বা মিথ্যাবিষয় চিন্তা না করা, পরস্বাপহরণে চিন্তা পর্য্যন্ত না করা, কামাদি রিপুবর্গকে শাসন করা, এবং ভোগসাধনার্থে কাহার নিকট কিছু আশা না করা, এই কয়টি সাত্ত্বিকী অভ্যাসের মধ্যে প্রত্যেকটীই যমাভ্যাসের উপযোগী হইতেছে।

তত্রৈবঃ—"শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।"

অর্থ :—মৃত্তিকা ও জলাদিতে বাহ্য শৌচকরণ, গুরুদেবাদি সেবায় অন্তর শৌচকরণ, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকা, ব্রতপর হওয়া, বেদাদি শাস্ত্রাভ্যাসে নিরত থাকা এবং একাগ্র হইয়া ঈশ্বরসেবা করা প্রভৃতি কয়েকটী উপায়কে নিয়ম কহে।

তত্রৈব:—"তত্রস্থিরসুখমাসনং।"

অর্থ:—যে উপায়ে উপবেশন করিলে, প্রাণবায়ু স্থির হয় ও কায়াতে কোন ক্লেশ উপস্থিত হয় না, তাহাকে আসন কহে। তত্রৈব :— "তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।" শ্বাস ও প্রশ্বাসের নিরোধ যে উপায়ে ঘটাইয়া প্রাণকে স্থির করা যায়, তাহাকে প্রণায়াম কহে। তত্রৈব :—"ধারণাসুচ যোগ্যতামনসঃ।" মন ক্রমে ক্রমে অভ্যাস বলে ভগবদ্বিচিন্তন স্থির করিতে, পারিলেই, ধারণা হইল। তত্রৈবঃ—"স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্বরূপানুকারে ইন্দ্রিয়ানাং প্রত্যাহারঃ।" চক্ষুকে বাহ্যরূপ দর্শন হইতে, কর্ণকে বাহ্যশব্দ হইতে, নাসাকে বাহ্য ঘ্রাণ হইতে, রসনাকে বাহ্য রস হইতে, এবং ত্বককে বাহ্য স্পর্শ হইতে বিরত করিয়া চিত্তস্থ ভাবরূপানুধ্যানে তাহাদের সংযোগ করাকে প্রত্যাহার কহে। তত্রৈব :—দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা তৎ প্রত্যয়ৈকতানতাধ্যানং। তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ॥" হৃদয় বা নাভি কিম্বা নাসার অগ্রভাগে চক্ষের দৃষ্টি স্থির করিয়া, অন্তরে বা সেই স্থলে দেব বা গুরুমূর্ত্তির স্থিরীকরণকে প্রকৃত ধারণা কহে। সেই ধারণার্থ ব্যবহৃত দেবতার ঐশ্বর্য্যে যখন মন অন্য কোন বিষয়ে বিচলিত না হইয়া এক ভাবে বাহ্য ও অন্তরে প্রতীত হয়। তাহাকে ধ্যান কহে। এই ধ্যানের উপলব্ধিভূত ধ্যেয় দেবতাতে চিত্তের যখন এমন একাগ্রতা ঘটিবে, যে চিত্ত আর দেবতা ভিন্ন আপনাকে স্মরণ করিতে পারে না, সেই আত্মবোধশূন্য অথচ দেবভাবময় অন্তর্চৈতন্যাবস্থার নামই সমাধি হইতেছে।

এই কয়েকটী যোগাঙ্গ সামান্যতঃ অভ্যাস করা সকল সাধকেরই উচিত হয়। কারণ সন্ধ্যা, আহ্নিকাদি নিত্যক্রিয়া এবং পূজা, ও শ্রাদ্ধাদি

নৈমিত্তিক ক্রিয়ায় সতত ইহা প্রয়োজন হয়। দুঃখের বিষয় এই যে: আমাদের কোন একটি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার আবশ্যক হইলে উপদেষ্টা ব্রাহ্মণের অভাব হয়না, কিন্তু কেহই উক্ত যোগানুষ্ঠানে পারদর্শী নহেন। পূজাদিতে যেখানে রেচক, পূরক, ও কুম্ভক প্রাণায়ামাদির প্রয়োজন হয়, যেখানে ধ্যান ও ধারণা প্রয়োজন হয়; সেখানে চক্ষু মুদিত করিলেই নিমেষমাত্রে ধ্যান হইয়া যায়, হৃদয়ে হস্ত দিলাই ধারণা সমাপ্ত হয়; নাভিমূলে হস্ত দিয়া চক্ষু মুদিয়া বসিলেই সমাধি হয়, আর একবার নাসার বাম ও দক্ষিণছিদ্রে অঙ্গুলি ধারণ করিলেই রেচক, পূরক ও কুম্ভক এবং প্রাণায়াম হইয়া থাকে। আসন কল্পনা করিয়া কাহাকেও পূজাদি কার্য্যে উপবিষ্ট হইতে প্রায়ই দেখা যায় না। অতএব যে ক্রিয়ার যেরূপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, তাহা অবলম্বন না করিলে কখনই তদ্বিষয়ের ফল লাভ হয় না। অতএব বিশেষ বিবেচনা করিয়া এই সকল যোগাঙ্গের অধিকারী হওয়া উচিত হইতেছে। এই উপায়ে যোগ বিষয়টী কি? এবং তাহার অভ্যাসে কি ফল লাভ হয়? তাহাই দেখান হইল। এক্ষণে তাহা কেমন করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হয়, তদ্বিষয়ে আলোচনা হউক। যম ও নিয়মাদিতে কেবল যোগের অধিকারী হইবার কথা বলা হইল। প্রাণায়াম হইতে সমাধি পর্য্যন্ত ছয়টিই হইল যোগের কৌশল, অতএব এ বিষয়ে নিরুত্তর তন্ত্র বলিতেছেন:—

"আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বদন্তি ষট্॥"

অর্থ:—আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ছয়টী প্রধান যোগাঙ্গ হইতেছে, একথা যোগীগণ বলেন।

আসনাদি কেমন করিয়া অভ্যাস করিতে হয় তাহা বলা হইতেছে। যম ও নিয়মপ্রোক্ত বিষয়গুলি চিরদিন অর্থাৎ যোগাভ্যাসের কাল হইতে দেহত্যাগের কাল পর্য্যন্ত প্রতিপালন করিতে হইবে। যম ও নিয়ম কথিত প্রণালী কখন উল্লংঘন করিলে, সমাধি সিদ্ধ হইলেও

তাহার পতন ঘটিয়া থাকে। অতএব সাধ্যানুসারে যম ও নিয়মপ্রণালী চিরদিন প্রতিপালন করিতে করিতে আসনাদির অভ্যাস করিতে হয়। সাধ্যানুসারে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে:—প্রত্যাহারাবস্থা উপস্থিত না হইলে যম ও নিয়মাদিতে সম্যক্ সিদ্ধি লাভ হয় না। সুতত দয়াশীল, কুবিষয়ে ও মিথ্যা প্রবঞ্চনাতে বিরত, আমিষাদি ভক্ষণ বর্জ্জিত এবং কেবল ঋতুমতী ভার্য্যায় গমন মাত্র অভ্যাস করিয়া যোগাভ্যাস আরম্ভ করা চাই। একাদশী প্রভৃতি দেবব্রত এবং শাস্ত্রতত্ত্ব শ্রবণে সর্ব্বদা উৎসুক থাকা চাই। এই অবস্থা স্বীকার করিয়া আসন অভ্যাস করিতে হয়। মন ও কায়াকে সুখী এবং প্রাণবায়ুকে স্থির করিতে যে কৌশল অবলম্বন করিয়া উপবেশন করিতে হয়, তাহাকে আসন কহে। এই উপায়ে উপবেশন কৌশল স্থির করিবার জন্য বহুতর আসনের কথা শাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গৃহী ও প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে একটি আসনই প্রধান হইতেছে, সেই আসন অভ্যস্ত হইলেই সামান্যতঃ যোগক্রিয়ায় অধিকার জন্মাইয়া থাকে। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হস্ত হইতে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যায়। উপাসনাতত্ত্বে সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় আসনাদির প্রসঙ্গই বলা হইতেছে। এই আসনের নাম পদ্মাসন হইতেছে। এই যমাদির মধ্যে যে নিয়মগুলি প্রধান, তাহা অভ্যাস করিয়া আসন অভ্যাস করিতে,যে হবে হয়,তদ্বিষয়ে দত্তাত্রেয় সংহিতা বলিতেছেন,—

> "যমা যে দশ সংপ্রোক্তা ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
> লঘ্বাহারস্তু তস্যেকো মুখ্যো ভবতি নাপরে॥
> অহিংসা নিয়মেষ্বেকো মুখ্যো ভবতি নাপরে।
> চতুরশীতি লক্ষেষু আসনেষ্বুত্তমং শৃণ।
> আদিনাথেন সম্প্রোক্তং পদ্মাসনমিহোচ্যতে॥

অর্থঃ—তত্ত্বদর্শী ঋষিগণে দশবিধ উপায়ে যম সাধনের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে লঘু আহার রূপী যে যমোপায় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছে। অহিংসাবৃত্তির অবধারণই বহুতর নিয়ম প্রণালরী

মধ্যে প্রধান হইতেছে। আদিনাথ ভগবান যে চতুরশীতি লক্ষ আসনের কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে পদ্মাসনই সকলের প্রধান হইতেছে। ইহার তত্ত্ব কথা বলা হইতেছে, শ্রবণ কর।”

এই প্রমাণে বলা হইল যে, সকল নিয়ম না প্রতিপালন করিতে পারিলেও, যেগুলি বীর্য্যহানিকর, গ্লানির উদয়কারী, রোগ ও অধৈর্য্য কারী, সে গুলিকে পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে বীর্য্য ও শক্তি অন্তরে ও বাহিরে প্রকাশ হয়, তাহা অবলম্বন করা উচিত হইতেছে। এক্ষণে দেখা যাউক যে, লঘু আহারের প্রয়োজন কি? যে আহার বহু গুরু-পাক অর্থাৎ আমিষ মাংসাদিতে মণ্ডিত নহে, বহু ঘৃতাদিতে পূর্ণ নহে। সেইরূপ বিশুদ্ধ অথচ পবিত্র আহারীয় অতি ক্ষুধাকালে অল্প করিয়া আহার করিলে, তাহাকে লঘু আহার কহে। গুরু বস্তুর আহারে অন্তরের অগ্নিক্রিয়া অতি প্রবল হয়, অন্তরে অগ্নি প্রবল হইলে জড়তা এবং কফে শরীর অবসন্ন হইয়া থাকে। এ অবস্থায় কখনই চিত্ত স্থির বা বিশুদ্ধ হইতে পারে না। গুরু আহারে যে বীর্য্য হয় তাহাতে কাম ও ক্রোধাদির চেষ্টা প্রবর্দ্ধিত হয়। গুরু আহারী ব্যক্তির অগ্নি এত প্রবল যে, কখনই সে ক্ষুধা সহ্য করিতে পারে না। ক্ষুধা সহ্য করিতে না পারিলে, ব্রত, নিয়ম ও যজ্ঞাদিতে উপবাসী থাকা যায় না। বিশেষতঃ কফের হ্রাস না হইলে অন্তরের সমস্ত প্রণালীতে বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবেশ ঘটে না। যে কৌশলাবলম্বনে দেহকে শান্তিপূর্ণ করা যায়, লঘু আহারই তাহার প্রধান কারণ হইতেছে। সর্ব্ব জীবে দয়া দেখাইলে কাহারো সহিত বিবাদ, কলহ বা কাহা হইতে ভয়ের প্রত্যাশা থাকে না। বিশেষতঃ ঈর্ষাদ্বেষ হইতে উদ্ধার লাভ হইয়া থাকে। এমন কি মন [illegible] তে হিংসা প্রকৃতি নষ্ট হইলে, সর্পব্যাঘ্র পর্য্যন্ত কোন জীবই [illegible] দেখিয়া হিংসা করে না। অতএব আহার ও বিহার এবং ব্যবহারে যেগুলি সতত হানিকরী বৃত্তি, তাহাদের সতত ত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়া আসনাদি অভ্যাস আরম্ভ করিতে হয়, নচেৎ রোগাদি [illegible] হইবার ভয় থাকে। পূর্ব্বে যে পদ্মাসনকে

সকলের প্রধান বলা হইল, সেই পদ্মাসন কাহাকে বলে। তদ্বিষয়ে উক্ত সংহিতা বলিতেছেন:—

"উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা উরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ।
উরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণী কৃত্বা ততোদৃশৌ॥
নাসাগ্রে বিন্যসেদ্রাজং দন্তমূলঞ্চ জিহ্বয়া।
উত্তোল্যচিবুকং বক্ষঃ সংস্থাপ্য পবনং শনৈঃ॥
যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য পুরয়েদুদরং শনৈঃ।
যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য ধারয়েদুদরং শনৈঃ॥
যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য রেচয়েদুদরং শনৈঃ।
ইদং পদ্মাসনং প্রোক্তং সর্ব্বব্যাধি বিনাশনং॥"

অর্থ:— উভয় চরণ উঠাইয়া দক্ষিণ চরণকে বাম উরুতে উঠাইয়া রাখিবে এবং বামচরণকে দক্ষিণ উরুতে উঠাইয়া রাখিবে। উভয় করযুগলও ঐ উভয় উরুস্থলে রক্ষা করিবে। চক্ষু যুগলের দৃষ্টিকে নাসাগ্রে সংস্থাপন করিবে; দন্তমূলে বদনের ভিতরে জিহ্বা সংযোগ করিয়া, চিবুক উত্তোলন পূর্ব্বক বক্ষোপরি সংস্থাপন করিয়া, অল্পে অল্পে পবন ধারণ অভ্যাস করিবে। এই অবস্থায় থাকিয়া যথাশক্তি পবন আকর্ষণ করিয়া উদর পূরণ করিবে, পরে যথাশক্তি অল্পে অল্পে রেচন করিবে। এই ভাবে থাকিলেই ইহাকে সর্ব্বব্যাধি নাশকারী পদ্মাসন কহে।

পদ্মাসন এই ভাবে অভ্যাস করিলে তাহাতে উপকার কি, দেখা যাউক। প্রথমে বলা হইয়াছে যে; আসনাদি অভ্যাস করিলে ক্রমে বায়ু ধারণ করিবার ক্ষমতা যত হয়, ততই আমাদের শরীরের নূতন সংস্কার [illegible] অর্থাৎ যৌবনকাল পর্য্যন্ত শরীর ও মনাদির শক্তিগুলি পুষ্ট হয়; সেই পুষ্টির অব্যবহিত পর হইতেই ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। যোগীগণ কহেন যে, আমাদের জন্মই হইল পরমাত্মা দর্শন ও অশেষ পুরুষার্থ ভোগ করিবার জন্য। সেই জন্ম যদি অন্যান্য প[illegible] যৌবনকাল পর্য্যন্ত পুষ্ট হইয়া ক্ষয় হইল, তাহা হইলে [illegible] [illegible]দন করিয়া হইতে পারে? কারণ

যৌবন পর্য্যন্ত দেহের সর্ব্বাংশ পুষ্ট হয় না, যৌবনে যেমন পুষ্ট হইল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়ও হইল। অতএব ক্ষয় নিবারণ না করিতে পারিলে, জ্ঞানের বিকাশ না করিতে পারিলে, কেমন করিয়া পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে!! এই যে পদ্মাসনাদি কল্পনা করিয়া পবনাভ্যাস কার্য্য করণ, ইহাতে দৈহিক ও মানসিক পুষ্টি বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। সর্ব্বাঙ্গের জড়তা ক্ষীণ হইয়া, জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। শাস্ত্র কহিয়াছেন যে:—মনের স্ফূর্ত্তি যেভাবে পরিণত থাকিবে; দেহের কান্তি ও পুষ্টি তদ্রূপ হইয়া থাকে। একজন লোক পরিপূর্ণ শোকাচ্ছন্ন থাকিলে বা দুঃখে আকুল থাকিলে, তাহার অন্তর ও বাহির মলিন হয়. শরীরের পুষ্টি হয় না, মন নিরুৎসাহ হইয়া সেই মানবকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। কোন লোক অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন থাকিলে, কালে সৌভাগ্য বা পুণ্যের উদয়ে তাহার শরীরের কান্তি ও গঠন অতি সুন্দর হইয়া থাকে; যদি সে ব্যক্তি কৃষ্ণকায়ও হয়, তথাপি তাহার অঙ্গে লাবণ্যের চিহ্ন দেখা যায়। এই প্রমাণে বুঝান হইতেছে যে, মনের সঙ্গে বাহ্যদেহের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ আছে। মন যদি উত্তম চিন্তায় অভিভূত থাকে; দেহও তদ্ভাবময় হইয়া থাকে। আমাদের দেহের পুষ্টি যদিও চিন্তার উপরে নির্ভর করে; কিন্তু সুচিন্তায় লাবণ্যের বিকাশ হয় এবং সুচিন্তা সহযোগে আহারীয় ও পানীয় প্রভৃতি হইতেও সুভাবের উদ্দীপন হওয়া চাই। সুচিন্তা করিতে করিতে কদন্ন এবং নিষিদ্ধ আহার ও বিহার করিলে, সুচিন্তার ক্ষয় হয় এবং দেহের পুষ্টি ও লাবণ্য বিকাশ হয় না। এইজন্য উভয়াবস্থার বিশুদ্ধি এই বায়ু ধারণার সময়ে আবশ্যক হইয়া থাকে। সুচিন্তার উপরে যেন কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হয়; উত্তম ও পবিত্র আহার ও বিহারের উপরে মন সর্ব্বদা লক্ষ্য থাকে। এই উভয় অবস্থার সহিত ভগবদ্বীর্য্য স্মরণ করিতে করিতে পদ্মাসন কল্পনা করিয়া পবনাভ্যাস করিলে; দেহের বহুকাল স্থায়ীত্ব উপস্থিত হয়; জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হয়, চিত্ত নির্ম্মল হওয়াতে, ভগবদ্বীর্য্যময় হওয়া যায়। পরমাত্মদর্শন হয়। এই অবস্থাটি

উপস্থিত করিতে না পারিলে, দেহ ধারণই মিথ্যা হইল। এই অবস্থা লাভ করিলে মানব দেবতা হয়, নচেৎ পশু হইতেও অধম হইয়া থাকে। এক্ষণে পবনাভ্যাসের উপকারিতা দেখা যাউক। শরীরে সমস্ত প্রণালিতে নূতন ও বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করাইবার জন্য অন্তরের প্রণালিগুলিকে উন্মুখী করিয়া রাখিতে হয়। এই নিয়মে শরীরকে রাখিবার জন্য সরল হইয়া উপবেশন করিতে হয়। সরল হইয়া উপবেশন করা বড় সহজ কথা নহে; যেমন করিয়াই উপবেশন কর, শরীর বামে বা দক্ষিণে, সম্মুখে বা পশ্চাতে হেলিয়া থাকিবেই থাকিবে। উভয় পদ ও উভয় হস্তই শরীরের ভার ও বক্রতা রক্ষা করিয়া থাকে। ঐ উভয় ইন্দ্রিয়কে পরস্পর সমান ভাবে রক্ষা করিলে এবং মেরুদণ্ড ও শিরোদেশকে সরল করিয়া রাখিলে দেহটি সরল হয়। এই জন্য বামপদের উপরে দক্ষিণ পদপ্রান্ত নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া এবং এইরূপে দক্ষিণ পদের উপরে বামপদের প্রান্ত রক্ষা করিলে, উভয় পদ বজ্রবন্ধের ন্যায় আবদ্ধ ও কটিদেশ পর্য্যন্ত সরল হইয়া থাকে। পরে উভয় হস্ত উভয় উরুতে সরলভাবে স্থাপন করিয়া উভয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উভয় কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলে রক্ষা করিলে, উভয় পার্শ্ব সরল হইল, দেহের সম্মুখে একটি আধার থাকিল এবং হৃদয়ের ও হস্তের প্রণালী গুলি অকুঞ্চিত হইয়া রস, রক্ত ও বায়ু বহনে সক্ষম হইল। পরে নাসাগ্রদৃষ্টি বা ভ্রুযুগলের মধ্যস্থলে দৃষ্টি রাখিলে শিরোদেশ ও মেরুদণ্ড সরল হইল। বাহ্য বিষয় হইতে চক্ষের দৃষ্টি একাগ্র হইল। অতএব চিন্তা একবিষয়িনী হইল। বদনের অভ্যন্তরে উভয় দন্তশ্রেণী সংযুক্ত করিয়া তাহার মূলে জিহ্বাকে দৃঢ় বদ্ধ করিলে কণ্ঠনালী আবদ্ধ থাকিল। তালুর নিম্নে যে ক্ষুদ্র জিহ্বামূল আছে; তাহার সাহায্যে কেবল বায়ুনালী দিয়া বায়ু রোধ ও নিঃসরণ কার্য্য ঘটিতে থকিল। এই নিয়মে উপবেশনে বায়ুধারণ সহজে ঘটে, শরীর কুঞ্চিত থাকিলে বায়ু কোন স্থানে না কোন স্থানে আটকাইয়া থাকিলে, রোগের উপক্রম হইয়া থাকে। অতএব আসন

কল্পনা করিয়া বায়ুধারণে তিন প্রকার উপকার শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিলেন। ভগবদ্বীর্য্য চিন্তায় জ্ঞানের আবেশ হয়, বায়ু, পিত্ত ও কফের সাম্যে ও বায়ুধারণায় দীর্ঘজীবন ও চিত্তের এবং শরীরের মালিন্য ক্ষয় হয়। উপযুক্ত ভাবে দেহের পুষ্টি ও রোগাদি নাশ হইয়া থাকে। এই অবস্থায়, চিত্তার বিশুদ্ধির জন্য আলস্য, কুসঙ্গ এবং কুস্থান ত্যাগ করিতে হয়। তদ্বিষয়ে দত্তাত্রেয়সংহিতা বলিতেছেন :—

"বক্ষ্যামি তথা বর্জ্যানি যোগবিঘ্নকরাণিচ।
লবণং সর্ষপঞ্চান্নমুষ্ণং রুক্ষঞ্চ নিন্দকং॥
অতীব ভোজনং ত্যজ্যং স্ত্রিয়া সঙ্গমনং বহু।
অগ্নিসেবাতু সংত্যজ্যা ধূর্ত্তগোষ্ঠি বিশেষতঃ॥"

অর্থ :—মহর্ষি দত্তাত্রেয় বলিতেছেনঃ—যে সকল আহার ও বিহারে যোগের বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আহারকালে লবণ, সর্ষপ ও উষ্ণ অন্ন খাইবে না; একেবারে শুষ্ক ও নিরস অন্ন খাইবে না। কাহারো উচ্ছিষ্ট, দূষিত, বা পর্য্যুষিত কোন অন্ন খাইবে না। অতীব ভোজন বা বহুতর স্ত্রী সেবন কখনই করিবে না। অগ্নির সংপর্কে কোন কার্য্য করিবে না; যে সকল লোক শঠ, চতুর, ও ধূর্ত্ত তাহাদের সহিত আলাপ করিবে না।

বিশেষ বিধি বহুতর আছে তন্মধ্যে এই কয়েকটি নিয়মকে বিশেষ সাবধানে শিক্ষা করিতে হইবে। উক্ত ঋষি বলিয়াছেন :—ক্ষীর, ঘৃত, মিষ্টরস অতিশয় নিয়মশীল হইয়া ব্যবহার করিলে, শরীরের উত্তম পুষ্টি হইয়া থাকে। বায়ু যে ভাবে ধারণ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে উক্ত শাস্ত্র বলিতেছেন :—

"মলমূত্রাদিভির্দ্দোষৈরষ্টাদশভিরেবচ।
বর্জ্জিতো দারসম্বন্ধং বস্ত্রং বাজিনমেব চ॥
নান্যত্রাস্তরণাসীনঃ পরশঙ্কাবিবর্জ্জিতঃ।
তস্মিন্ শাস্তং সমাস্তীর্য্য আসনং বিষ্টরাদিকং॥
তত্রোপবিস্য মেধাবী পদ্মাসন সমন্বিতঃ।

সমকায়ঃ প্রাঞ্জলিশ্চ প্রণম্য চেষ্টদেবতাং ॥
ততো দক্ষিণহস্তস্যাপ্যঙ্গুষ্ঠেন তু পিঙ্গলাং।
নিরুদ্ধ পূরয়েদ্বায়ুমিড়য়া তু শনৈঃ শনৈঃ ॥
যথাশক্ত্যা নিরোধেন ততঃ কুর্য্যাচ্চ কুম্ভকং।
ততস্ত্যজেৎ পিঙ্গলয়া শনৈরেব ন বেগতঃ ॥
পুনঃ পিঙ্গলয়াপূর্য্য পূরয়েদুদরং শনৈঃ।
ধারয়িত্বা যথাশক্তি রেচয়েন্মারুতং শনৈঃ ॥
যয়া ত্যজেত্তয়াপূর্য্য ধারয়েদবিরোধতঃ।
এবং প্রাতঃসমাসীনঃ কুর্য্যাদ্বিংশতি কুম্ভকান্ ॥
কুর্য্যাদেবং চতুর্ব্বারমনালস্যো দিনে দিনে।
এবং মাসত্রয়ং কুর্য্যান্নাড়ী শুদ্ধিস্ততো ভবেৎ ॥
যদা তু নাড়ীশুদ্ধিঃ স্যাত্তদা চিহ্নানি বাহ্যতঃ।
জায়ন্তে যোগিনো দেহে তানি বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥
শরীরলঘুতা দীপ্তি জঠরাগ্নি বিবর্দ্ধনং।
কৃশত্বঞ্চ শরীরস্য তস্য জায়তে নিশ্চিতং ॥”

অর্থ।—যখন সাধক প্রথমে পবনাভ্যাস আরম্ভ করিবেন, তখন এই সকল নিয়ম অবধারণ করিবেন। যে স্থানে যোগ আরম্ভ করিবেন যে স্থানটি যেন মল, মূত্র, স্বেদ, দুর্গন্ধ ও শব্দ ইত্যাদি অষ্টাদশ দোষশূন্য হয়। বিবাহিত কিম্বা অন্য সকল প্রকার স্ত্রীসঙ্গ প্রথমাবস্থায় বৰ্জ্জিত হইতে হইবে। উত্তম বস্ত্র ধারণ এবং হস্তী, অশ্ব প্রভৃতিতে গমন করিবে না। কোন শত্রুভয়ে ভীত হইবে না। কোন বস্ত্রাবৃত গৃহে থাকিবে না। পূর্ব্বোক্ত দোষ রহিত স্থানে পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলম্বী হইয়া কুশ, কম্বল, বা শুদ্ধ চর্ম্ম বিস্তার করিয়া মেধাবী সাধক পদ্মাসন কল্পনায় দেহকে রক্ষা করিবে। শরীরকে সবল করতঃ হস্তদ্বয় প্রাঞ্জলি ভাবে ধরিয়া নিজেষ্ট দেবতাকে প্রণাম করিয়া (তদ্বীর্য্যচিন্তা করিতে করিতে), দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিযোগে পিঙ্গলাপথ অর্থাৎ দক্ষিণ নাসাছিদ্র রোধ করিয়া, অল্পে অল্পে বাম নাসাপথ

দিয়া, বায়ু ধারণ করিতে থাকিবে। সম্পূর্ণ বায়ু গ্রহণ করিয়া, উদর যথাশক্তি নিরোধ করিবে। এই অবস্থাকে কুম্ভক কহে। পরে বাম নাসাছিদ্র রোধ করিয়া, দক্ষিণ নাসা দিয়া অল্পে অল্পে ঐ বায়ু সেবন করিবে। আবার দক্ষিণ নাসাপথ দিয়া, অল্পে অল্পে বায়ু গ্রহণ করিয়া উদরে ধারণ পূর্ব্বক ক্রমে বাম পথ দিয়া রেচন করিবে। এই নিয়মে প্রাতঃকালে বিংশতিবার কুম্ভক করিবে। এই বিংশতি কুম্ভক যদি প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা ও মধ্যরাত্র এই চারিবার অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে তিন মাসের মধ্যে নাড়ী শুদ্ধ হইয়া থাকে। নাড়ী শুদ্ধি যোগিগণের দেহে ঘটিলে বক্ষ্যমান লক্ষণ সমস্ত, দেখা যায়ঃ—শরীর লঘু হয়। দেহ হইতে একটি পবিত্র লাবণ্য বিকাশ হয়। জঠরাগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দেহ কৃশ ভাব ধারণ করে।

এই রূপ কুম্ভক করিতে করিতে নাড়ী শুদ্ধ হইলে, তবে প্রাণায়াম অধিকার জন্মে। সংখ্যা করিয়া পূরণ ও রেচন ঘটিলে এক প্রাণায়াম হয়। যত সংখ্যা জপ করিতে বায়ু পূরণ করা যায়; তাহার চতুর্গুণ সংখ্যা জপ কাল ধারণ করিতে হয়। তাহার দ্বিগুণ সংখ্যা জপ করিতে করিতে রেচন করিতে হয়। চারি সংখ্যা জপিতে জপিতে যদি বায়ুতে উদর পূর্ণ করা যায়, তবে ষোড়শ সংখ্যা জপ কাল পর্য্যন্ত ধারণ করিতে হইবে। আর আট সংখ্যা জপ কাল পর্য্যন্ত বায়ু রেচন করিতে হয়। এই নিয়মে অভ্যাস করিতে করিতে ষোড়শ জপ করিতে করিতে বায়ু পূরণ, চতুঃষষ্টি সংখ্যা পর্য্যন্ত বায়ু ধারণ এবং দ্বাত্রিংশতি সংখ্যা জপের মধ্যে বায়ু রেচন করিতে পারিলে মধ্যম সাধক হওয়া যায়। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে আমাদের দেবচিন্তা ও পূজাদি করিতে অধিকার হয়। এই অবস্থায় ভগবদ্বীর্য্য মনে একান্ত ভাবে রত হওয়ায়, শরীরের ও মনের বাহ্যক্রিয়া নিরুদ্ধ হওয়ায়, সমস্ত ইন্দ্রিয় ক্রিয়া ক্রমে বিষয় ভোগ হইতে বিরত হইয়া, অন্তরের আনন্দে নিমগ্ন হয়। যেমন অতিমাত্র কামসুখ ভোগে নিমগ্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাহ্য অন্য বিষয়ভোগে পরিণত হইতে পারে না, তদ্রূপ ভগবদ্বীর্য্য ভাবনা করিতে

করিতে একাগ্রতা উপস্থিত হইলে এই অবস্থায় যে সুখানুভূতি হয় তাহাতে ইন্দ্রিয়াদি বাহ্য বিষয় ভোগে একান্ত বিরত হইয়া থাকে। এই অবস্থাকে প্রত্যাহার কহে। এই অবস্থায় যে ভগবদ্বীর্য্যপূর্ণ মূর্ত্তিতে ইন্দ্রিয় প্রভৃতির একাগ্রতা উপস্থিত হয়, তাহাকে ধারণা কহে। ধারণা একাগ্র হইলেই ধ্যান হইল। ধ্যান স্থির হইলে যখন আমি ধ্যান করিতেছি, ধ্যেয় ঈশ্বরমূর্ত্তি ঐ রহিয়াছে, এই উভয় সম্বন্ধ চিত্ত হইতে অপলুপ্ত হইয়া, ঈশ্বরভাবময় হইয়া, বাহ্যচৈতন্য একেবারে বিস্মৃত হওয়া যায়। তখন শ্বাস ও প্রশ্বাস হইতে অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত ক্রিয়ার লোপ হয়। সেই পূর্ণানন্দোপভুক্তাবস্থার নামই সমাধি হইতেছে। এই অবস্থায় জরা মৃত্যু থাকে না, শোক, তাপ ও দুঃখের অনুভব হয় না। মানব এই অবস্থায় দেবতার ন্যায় হইয়া পূর্ণ জ্ঞানময় অর্থাৎ আপনার ভাগ্যের ভূত, ভবিষ্যৎ এবং অতীত ঘটনা বুঝিতে পারিয়া, সকল চেষ্টা ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া পরমানন্দপূর্ণ হইয়া থাকে।

সংখ্যাদি বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল অভ্যাসপর হইয়া পূরণ, ধারণ ও রেচন করিলে কুম্ভক হইয়া থাকে। সংখ্যানির্দ্ধারণ করিয়া রেচন, পূরণ ও ধারণ করিলে, প্রাণায়াম হইয়া থাকে। এইরূপে কুম্ভকে নাড়ী শুদ্ধি করিলে প্রাণায়ামে চিত্তশুদ্ধি ও দেহ পবিত্র হইয়া থাকে। কারণ এই অবস্থায় ভগবদ্বীর্য্যযুক্ত চিন্তাবলে বায়ু ধারণ করিলে, সেই বায়ু যখন সমস্ত জ্ঞানবহা নাড়ীতে প্রবেশ করিবে, তখন শরীরে পূর্ণজ্ঞান বিকশিত হইবে। এই জন্য যোগস্বরোদয় তন্ত্র বলিতেছেন:—

"রাজযোগেন দেবেশি নৃপপূজ্যোভবেন্নরঃ।
রাজযোগী চিরায়ুশ্চ অষ্টৈশ্বর্য্যযুতোভবেৎ।।

অর্থ:—হে দেবেশি! দরিদ্র ব্যক্তিও যদি পূর্ব্বোক্ত রাজযোগে সিদ্ধ হয়, সে ব্যক্তি রাজারও সম্মানের পাত্র হইয়া থাকে। বিশেষতঃ সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ুঃ ও অষ্টৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া থাকে।

এই যে ভাবে আমরা যোগ সাধনের বিষয় বলিলাম; কেবল যোগে অধিকার জন্মাইবার কথা প্রদর্শিত হইল মাত্র। এইরূপ স্বল্প

অভ্যাস করিতে পারিলেই আমাদের ন্যায় ভোগী ব্যক্তির পরম লাভ হইল বুঝিতে হইবে, এতদ্ব্যতিত বহু উপায়ে যোগের অভ্যাস ও সিদ্ধির বিষয় শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা আমাদের ন্যায় অধিকারীর জানিবার প্রয়োজন নাই। উপাসনায় অধিকারী হইবার জন্য এই পুস্তকের অবতারণা করা হইয়াছে, অতএব অধিকার পর্য্যন্তই দেখান হইল। পূর্ব্বোক্ত সামান্য অভ্যাস পর্য্যন্ত আমাদের পূজাদিতে প্রয়োজন হয়, তজ্জন্য এই প্রস্তাবে যোগসাধনের প্রথমাভ্যাস পর্য্যন্ত বর্ণিত হইল।

অথ মন্ত্র ও দেবতা তত্ত্ব।

—*—

এতক্ষণ এই পুস্তকে যাহা কিছু বর্ণিত হইল, সমস্তই অনুষ্ঠানের বিষয় হইতেছে। যে যুক্তি বা যোগের উপরে সেই সকল অনুষ্ঠান অভ্যস্ত হইবার কথা শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, চিত্তবিশুদ্ধিই তাহার প্রথম উদ্দেশ্য হইতেছে। সেই চিত্ত বিশোধন যখন প্রকৃষ্ট ভাবে আচরিত হয়, তখনই এই যোগানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। যোগানুষ্ঠান অভ্যাস করিতে করিতে, প্রাণায়াম হইতে সমাধি পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান, যে ভিত্তির উপরে স্থাপিত হইয়াছে, শাস্ত্রকারেরা সেই যোগানুষ্ঠানের এক মাত্র ভিত্তি এবং মানবের চরম বিশুদ্ধির এক মাত্র সেতুকে দেবতা বলিয়াছেন। এই দেবতা কাহাকে বলে; তদ্বিষয়ে বহুশাস্ত্র বহু উপায়ে একই দেবত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সহজে দেবতাতত্ত্ব এই উপায়ে বুঝা যায়। দিব্ ধাতু হইতে দেবতা শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। দিব্ ধাতুর অর্থ আলোকিত করা। যে অবস্থা বা বীর্য্য চিন্তা করিলে, মায়া, কর্ম্ম, অজ্ঞান প্রভৃতি আবরণ জনিত অন্ধকার হইতে চৈতন্যালোকে জ্ঞানময় হওয়া যায়, তাহাকে দেবতা কহে। বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগৎ এ সমস্তই সেই একমাত্র ভগবানের সত্ত্বায় পূর্ণ রহিয়াছে।

তাঁহার সত্তা এবং তাঁহার শক্তি এতদুভয়ের মিলনে কেমন করিয়া সৃষ্টি হইতেছে; এই সকল বীর্য্য আলোচনা দ্বারা জ্ঞানের বিকাশ হয়, এই জন্য বাহ্য ও অন্তর্জগতের সমস্ত সত্তাগুলিকে সেই ভগবানের বিভূতি বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্নির্দ্দিষ্ট বিভূতিগুলির নামই দেবতা হইতেছে। শ্রুতির সর্ব্বত্রই এই ভগদ্বিভূতিরূপী দেবতা জ্ঞান হইবার জন্য যজ্ঞাদির অর্থাৎ বাহ্য ও অন্তরের অনুষ্ঠান পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত আর্য্যশাস্ত্রকারগণ ভগবদ্বিভূতি চিন্তা যতদূর করিয়াছেন, তন্মধ্যে ত্রয়স্ত্রিংশতি কোটী দেবতার উল্লেখ তাঁহারা করিয়াছেন। এক ব্রহ্ম বস্তুর বিভূতিই যে ঐ অনন্ত দেবতাগণ হইতেছেন, তদ্বিষয়ে মহাভারত বলিতেছেন :—

"যুগস্যাদৌ নিমিত্তং তৎ মহদ্ভূতং প্রচক্ষতে।
যস্মিন্ সংস্থূয়তে সত্যং জ্যোতির্ব্রহ্ম সনাতনং॥
অদ্ভুতঞ্চাপ্যচিন্ত্যঞ্চ সর্ব্বত্র সমতাং গতং।
অব্যক্তং কারণং সূক্ষ্মং যৎ তৎ সদসদাত্মকং।
ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্রানি ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতানি চ।
ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ দেবানাং সৃষ্টিঃ সংক্ষেপ লক্ষণা॥"

অর্থ:—বর্ত্তমান মন্বন্তরের আদিভাগে সৃষ্টি প্রকাশ করিবার জন্য যে সকল সৃষ্টির উপাদান প্রস্তুত হইল; তাহার নিমিত্ত,কারণ স্বরূপ সেই ভগবান সৃষ্টি বিকাশ করিতে, উপাদান কারণের অন্তরে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেই অবস্থাতে সত্যে অধিকৃত থাকিলেন, জ্যোতিঃ অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিকাশশীল থাকিলেন; ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী থাকিলেন, সনাতন অর্থাৎ নিত্য বা পরিণামহীন হইয়া থাকিলেন। যাহা চিন্তায় স্থির করা যায় না, যাহা বুদ্ধিতে অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়, সেই সনাতন পুরুষ সৃষ্টির উপাদান মধ্যে সমান ভাবে অন্তর্যামী হইয়া, কোন অবস্থায় আপনি সৃষ্টপদার্থের সত্তা অর্থাৎ অব্যক্ত হইলেন। কোন অবস্থায় কারণ অর্থাৎ সৃষ্টির কৌশল হইলেন। কোন অবস্থায় সদসদাত্মক ব্রহ্মাণ্ড হইলেন। এই রূপে সেই সনাতন পুরুষ প্রথমে ত্রয়স্ত্রিংশতি

দেবসংখ্যায় বিভাজিত হইলেন; পরে ত্রয়স্ত্রিংশতি শত সংখ্যায় বিভাজিত হইলেন। পরে ত্রয়স্ত্রিংশতি সহস্র সংখ্যায় বিভাজিত হইলেন।

এই যে মহাভারতোক্ত দেবতোৎপত্তি কথা বলা হইল; ইহা সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত হইতেছে। ইহার মধ্যে আদি দেবতা ত্রয়স্ত্রিংশতিটি হইতেছে। উহাদের মধ্যে পৃথিবী, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, সূর্য্য, জ্যোতিঃ এবং চন্দ্র ও নক্ষত্র আটটি বসুদেবতা। দশেন্দ্রিয় ও মন একাদশ রুদ্র দেবতা। দ্বাদশ মাস দ্বাদশাদিত্য দেবতা। ইন্দ্র অর্থাৎ মেঘ এবং প্রজাপতি অর্থাৎ যজ্ঞ এই উভয় দেবতা।, সকল দেবতা গণনায় হইল ত্রয়স্ত্রিংশতি। এই সকল দেবতা বা ব্রহ্মবিভুতি জীব ও জগৎ সৃষ্টির প্রধান আধার। উহারা ক্রমে সৃষ্টির মধ্যে মিলিত ও বিস্তৃত হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশতি কোটিতে পরিণত হইয়াছে। এই বর্ণনায় সংক্ষেপে দেখান হইল যে, দেবতাগুলি সমস্তই চৈতন্য প্রদীপিকা ব্রহ্মশক্তি ও সত্বাবিশেষ হইতেছেন। সাধন ভেদে এই দেবতা দুই ভাগে বিভাজিত হইয়াছেন। জগৎ ও দেহের আধারে যে সকল ব্রহ্মবিভুতিকে চিন্তা করিতে হয়, তাঁহাদের বাহ্যদেবতা কহে। তাঁহাদের বোধে তত্বজ্ঞানের উদয় হয় মাত্র। কিন্তু অন্তরের মধ্যে যে সকল শক্তি বর্ত্তমান, সেই সকল শক্তিতে যে সকল দেবতা বর্ত্তমান, তাহা বাহ্য হইতে অধিক চৈতন্যের বিকাশক, এই জন্য তাঁহারা স্বাধীন দেবতা হইতেছেন। অর্থাৎ বাহ্য দেবতার ন্যায় কর্ম্মী নহেন। তাহারা কেবল চৈতন্যময় হইতেছে। কেবল চৈতন্যময় বীর্য্য ভাবনায় তাঁহাদের সাহায্যে আমাদের শরীরে চৈতন্যের উদয় হয়। যেমন ক্রোধের চিন্তায় ক্রুদ্ধতেজের আবির্ভাব হয়, যেমন কামের চিন্তায় কামতেজের আবির্ভাব হয়, সেইরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মতেজের চিন্তায় তদ্ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই চিন্তা কেমন করিয়া করিতে হয়, কেমন করিয়া সেই ভগবদ্বীর্য্য আত্মাতে আবির্ভূত হয়। তাহাই মনুষ্য জন্মের প্রধান জ্ঞাতব্য হই

েনছে। যিনি ব্রহ্ম বস্তু সকলের আধার ও আশ্রয় হইতেছেন, তাঁহাকে হৃদগত করিতে যে কৌশল বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, সেই কৌশলের নাম মন্ত্র হইতেছে। এক্ষণে মন্ত্র ও অন্তর্দ্দেবতার বিষয় বুঝা যাউক। আমাদের দেহের মধ্যে নিতম্বের মধ্যস্থল হইতে ব্রহ্মমূর্দ্ধা পর্য্যন্ত লম্বিত মেরুদণ্ডের স্থানে স্থানে জ্ঞানবহা নাড়ী গুলির সংযোগে সাতটি চৈতন্য প্রদীপক মর্ম্মস্থল আছে। যেমন রক্তপেশীতে শোণিতের সঞ্চার হইয়া ক্রমে সর্ব্বশরীরব্যাপী হয়, তদ্রূপ শরীরের মধ্যে সাতটি স্থানের ক্রিয়ানুসারে চৈতন্য আকর্ষিত হইয়া, জীবের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহিত হয়। যেমন, বৃক্ষের মূলদেশস্থ চৈতন্য বৃক্ষের সর্ব্বশরীরের পুষ্টিপ্রদ হয়। তদ্রূপ মানবদেহের নিতম্বের মধ্যভাগে এবং মেরদণ্ডের মূলে, প্রধান চৈতন্যাধার বর্ত্তমান আছে। সেই স্থান হইতে সমস্ত চৈতন্য প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া, ব্রহ্মমূর্দ্ধা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া শরীরকে সজীব এবং জ্ঞানাদির বিকাশ করে। ঐ সকল চৈতন্য প্রকাশক স্থানকে সাতটি কমল বা চক্র কহে। মেরদণ্ডের মূলে যে চক্র, তাহাকে মূলাধার কহে। তদূর্দ্ধে লিঙ্গমূলে যে চক্র, তাহাকে স্বাধিষ্ঠান কহে। নাভিতে যে চক্র তাহাকে মণিপুর কহে। হৃদয়ে যে চক্র তাহাকে অনাহত কহে। কণ্ঠে যে চক্র তাহাকে বিশুদ্ধ কহে। ভ্রূযুগলের মধ্যে যে চক্র তাহাকে আজ্ঞা কহে। ব্রহ্মরন্ধ্রের মধ্যে যে চক্র তাহাকে সহস্রদল কমল কহে। জীবাত্মা মূলাধার হইতে ব্রহ্মমূর্দ্ধা পর্য্যন্ত চৈতন্যব্যাপী হইয়া দেহগৃহে আবদ্ধ আছেন। মূলাধারের মধ্যে সমস্ত চৈতন্য প্রথম বিকাশ হয়। যে নাড়ীতে চৈতন্যের প্রথম বিকাশ এবং যেটি চৈতন্যকোষস্বরূপ, তাহার নাম কুণ্ডলিনী হইতেছে। এই নাড়ী হইতে চৈতন্য ক্রমে সুষুম্না নামক জ্ঞানপ্রবাহ যোগে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে। সেই সুষুম্নার শাখাপ্রশাখা যোগে চৈতন্য এই শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছে। স্বভাবতঃ যতটুকু চৈতন্যের বলে আমাদের দেহ জীবিত থাকে, স্বভাবতঃ মূলাধারস্থা

কুণ্ডলিনী ততটুকু চৈতন্য দেহে বিতরণ করেন। কিন্তু জ্ঞানময় চিন্ময় হইতে হইলে, তাহাপেক্ষা অধিক চৈতন্যের প্রয়োজন হয়. কুণ্ডলিনী নাড়ী, বর্ত্তমানে যে ভাবে দেহে আছেন, এ অবস্থায় তিনি অতি ক্ষীণা, এই জন্য তিনি সতত কুঞ্চিতা হইযা মেরুমূলে লতার ন্যায জড়িতা আছেন। সেই চৈতন্যাকর্ষিণী শক্তিকে পুষ্ট কবিতে পাবিলে অধিক চৈতন্যেব আকর্ষণ ঘটিয়া থাকে। যে উপায়ে সেই নাড়ীতে অধিক পবিমাণে ভগবচ্চৈতন্য আকর্ষণ কবা যায়, তাহাকেই মন্ত্র ও দেবতাযোগে চিন্তন ও পূজন ক্রিয়া কহে। অনেকে হয়তো সন্দেহ কবিতে পারেন, যে ; ভগবদ্বিচিন্তায ও দেবতামন্ত্রাদির চিন্তায় চৈতন্যেব বিকাশ বা আধিক্য কেমন করিয়া ঘটিযা থাকে? তদুত্তব এই যথাঃ—যেমন আলোচনায় বুদ্ধিব স্ফূর্ত্তি হয়, বর্ণ ও ভাষা ব্যবহাবে জ্ঞানেব বিকাশ হয়। এই সকল কার্য্য কেবল সাঙ্কেতিক চিন্তা মাত্র হইতেছে। এইরূপ অধ্যাত্ম সকল শক্তিই তদ্ভাব চিন্তায় বৃদ্ধি পাইযা থাকে। একই অক্ষব যুক্ত ভাষা বটে। কিন্তু সেই ভাষাকে কাম্যরসে রঞ্জিত করিয়া চিন্তা করিলে সহজে তাহা হইতে কামেব বিকাশ হয়। তদ্রূপ সেই ভাষাকে চৈতন্যময়ী করিয়া চিন্তা কবিলে চৈতন্যের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন কাম, লোভ, মোহাদির মূর্ত্তি উপলব্ধি হয় না, অথচ ক্রিয়ায় তাহার হ্রাসবৃদ্ধি উপলব্ধি হয় এবং ক্রিযা-বশে তাহার বর্দ্ধন ও ক্ষয় হয়। সেইরূপ যে ভাষাযোগে চৈতন্য চিন্তা কবিতে হয়, তাহাকে মন্ত্র কহে। এমন কযেকটি বর্ণেব সঙ্কেত আছে, যাহাতে ভগবদ্বীর্য্য বুঝায়, সেই সাঙ্কেতিক বর্ণে যে ভগবদ্বীর্য্য থাকে, তাহাকে দেবতা কহে। সেই দেববীর্য্য জ্ঞাপক বা উদ্দীপক ভাষাগুলিকে মন্ত্র কহে। যে বর্ণ সঙ্কেতে দেববীর্য্য বোধ হয় না, তাহাকে মন্ত্র কহে না। যেমন "ক্লীং" বিষ্ণু দেবতার বীজমন্ত্র হইতেছে। ইহাতে ক্+ল+ঈ+ং এই কয়েকটি বর্ণের যোগে উক্ত দেববীর্য্য সাঙ্কেতিক মন্ত্র হইয়াছে। এই বীজে কেমন করিয়া দেববীর্য্যের বোধ হয়, তদ্বিষয়ে বরদাতন্ত্র বলিতেছেন :—

"ক কামদেব উদ্দিষ্টোঽপ্যথবা কৃষ্ণ উচ্যতে।
ল ইন্দ্র, ঈ তুষ্টি বাচী সুখদুঃখপ্রদশ্চ অং॥
কামবীজার্থ উক্তস্তে তবস্নেহান্মহেশ্বরি।"

অর্থঃ—কামদেব অর্থাৎ যিনি সকল কামনার উদ্দীপন করিতে পারেন, ক বর্ণে তাহাই চিন্তা করিবে, কিম্বা যিনি সকলের মনকে পাপ হইতে আকর্ষণ করিতে পারেন, তাহাকেই ককারে চিন্তা করিবে। লকারে ইন্দ্র অর্থাৎ সমস্ত স্বর্গসুখ চিন্তা করিবে। ঈকারে সর্ব সন্তোষ মনন করিবে। আর অনুস্বারে বাচিক অর্থাৎ সকল জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সুখদুঃখ যিনি বিধান করেন, এই ভাবনা চিন্তা করিবে। হে মহেশ্বরি। তোমাতে স্নেহযুক্ত হইয়া আমি এইরূপ কামবীজের অর্থ প্রকাশ করিলাম।

ইহার সরল তাৎপর্য্য এই—যিনি কামদেব রূপে সমস্ত কামনার বিধাতা। যিনি কৃষ্ণরূপে সকল পাপের আকর্ষণ কর্ত্তা। যিনি ইন্দ্ররূপে সুখ ঐশ্বর্য্য বিধাতা, যিনি সন্তোষরূপে শান্তি প্রদাতা, যিনি জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সুখ ও দুঃখের উৎপাদক কর্ত্তা, তিনি এই বীজের দেবতা হইতেছেন। সাধক ইহা চিন্তা করিতে পারেন, এই গুণগুলি চিন্তা করিলেই কৃষ্ণ চিন্তা হইল, তবে আবার বর্ণাত্মক বীজ সংযুক্ত একটি শব্দের প্রয়োজন কি? তাহার উত্তর এই যথা। বর্ণাত্মক সঙ্কেত ভিন্ন বাহ্যভাব বা কোন শক্তি অন্তরে গৃহীত হয় না, এবং অন্তরের কোন ভাবও বাহিরে প্রকাশ করা যায় না। আমরা জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যে ইচ্ছা প্রকাশ করি বা কোন জ্ঞান পর হইতে গ্রহণ করি, সমস্তই বর্ণময়ী স্ফুট বা অস্ফুট ধ্বনি বা ইঙ্গিতযুক্ত বর্ণময় হইতেছে। আমাদের তাহাতেই সকল কার্য্য সাধিত হয়। আমাদের সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, বুদ্ধি যে কোন শক্তির বিকাশ করিতে হয়, সমস্তই বর্ণযোগে হয়। অতএব বর্ণ ব্যতীত আমাদের স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন শক্তির আবেশ ও প্রকাশ হইতে পারে না। সেই নিয়মে ভগবদ্বীর্য্য সম্পন্ন চৈতন্যসত্তাকে অন্তরে আবির্ভূত ও বর্দ্ধিত করিতে হইলেও বর্ণের

প্রযোজন হইয়া থাকে। যেমন,যে বর্ণযুক্ত শব্দে ক্রোধের ভাব থাকে, তাহার চিন্তায বা উচ্চারণে ক্রোধের আবেশ হয়। তদ্রূপ যে শব্দে ভগবদ্বীর্য্য ও ভাব থাকে তাহা চিন্তনে ভগবদ্ভাব উদ্দীপিত হইয়া থাকে। এই জন্য যে সকল শব্দ ভগবদ্ভাবব্যঞ্জক, যাহার অং ও উচ্চারণে ভগবদ্ভাব সর্ব্বদা অন্তরে উদ্দীপিত হয়, তাহাকে মন্ত্র কহে। সেই মন্ত্রে যে দেববীর্য্য বোধ হয, তাহাকেই অন্তরের দেবতা কহে। এই জন্য মন্ত্র শব্দের অর্থ—মৎস্যসূক্ত বলিতেছেনঃ—

"মননাৎ ত্রাযতে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।"

অর্থঃ—যে শব্দ চিন্তা করিলে মহাপাপ হইতে বা অজ্ঞান হইতে পরিত্রাণ লাভ হয, তাহাকে মন্ত্র কহে।

তথা পিঙ্গলাতন্ত্রে।—"মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসারবন্ধনাৎ।
যতঃ করোতি সংসিদ্ধো মন্ত্র ইত্যুচ্যতে ততঃ।"

অর্থঃ—যাহা চিন্তা করিলে বিশ্বতত্ত্বের অভিজ্ঞতা জন্মায, যাহা অবলম্বনে সংসার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ লাভ হয়। যাহার সহায়তায় সকল বিষযে সিদ্ধি লাভ হয়, তাহাকেই মন্ত্র কহে।

এই জন্য মনুষ্যের জন্ম মাত্রেই মন্ত্র গ্রহণের প্রয়োজন। মন্ত্র গ্রহণ না করিলে শ্রাদ্ধাদি কোন কার্য্যেই অধিকার থাকে না। এ বিষয়ে মৎস্যসূক্ত বলিতেছেন—

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাচ্চ পাপসংক্ষযং।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ।
অদীক্ষিতানা মর্ত্ত্যানাং দোষং শৃণু মহেশ্বরি।
অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্র সমং স্মৃতং।
তৎকৃতং তস্য বা শ্রাদ্ধং সর্ব্বং যাতি হ্যধোগতিং॥"

অর্থঃ—যে কার্য্য করিলে পাপক্ষয় হইয়া দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাকে তত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ দীক্ষা কহিয়াছেন। হে মহেশ্বরি! যে মর্ত্ত্য মানব, গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ না করে, তাহার অন্ন বিষ্ঠার ন্যায় ও জল মূত্রের ন্যায় ঘৃণিত ও পরিত্যজ্য হয। এমন

কি! সে ব্যক্তি শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিলে তাহার পিতৃলোকের অধোগতি হয়, অধিকন্তু সে অদীক্ষিতাবস্থায় মরিলে তাহার শ্রাদ্ধে তাহারই উদ্ধার ঘটে না।

অতএব মন্ত্র সহযোগে দীক্ষা দ্বারা জ্ঞানময় হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে। মন্ত্রবীজ শব্দ দ্বারা চৈতন্যের উদ্দীপনা হইতে পারে, একথা আমরা বুঝাইলাম। কেমন করিয়া সেই মন্ত্র ও দেবতার চিন্তা করিলে চৈতন্যের আকর্ষণ ঘটে, তদ্বিষয় বলা হইতেছেঃ—

যথা কুব্জিকা তন্ত্রেঃ—শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি চৈতন্যং পরমাদ্ভূতং।
রহস্যং পরমং পুণ্যং গোপনীয়ং ত্বয়া পুনঃ॥
চিচ্ছক্ত্যা ধ্বনিতং দেবি পরিণাম ক্রমেণ তু।
বর্ণভাবং সমাত্যজ্য নির্ম্মলং বিমলাত্মকং॥
ষট্‌চক্রঞ্চ ত।ভিত্ত্বা শব্দরূপং সনাতনং।
নাদবিন্দুসমাযুক্তং চৈতন্যং পরিকীর্ত্তিতং॥
অনাহতস্য মধ্যে তু গ্রথিতং বর্ণমুত্তমং।
সুষুম্না বর্ত্তনা দেবি কণ্ঠদেশং বিনির্গতং॥
চৈতন্যঞ্চ মহেশানি যোগিনাং যোগরূপকং॥”

অর্থঃ—হে দেবি! মন্ত্রের চৈতন্য কেমন করিয়া হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই চৈতন্য বাহ্যজ্ঞানের অতীত, এইজন্য অদ্ভুত হইতেছে। তাহা রহস্য অর্থাৎ গোপনীয়, তাহা পরম অর্থাৎ তাহাতে পরমাত্মাকে অনুমান করা যায়। এত পবিত্র যে তুমিও তাহাকে গোপন করিতে বাধ্য আছ। যখন বর্ণগুলি, সংযুক্ত ও ভগবদ্বীর্য্য ভাবে পরিণত হইয়া, চিৎশক্তি দ্বারা উচ্চারিত হইবে, তখন তাহার বর্ণভাব থাকিবে না; তাঁহা নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হইয়া যাইবে। সেই শব্দাবস্থাকে নাদবিন্দুযোগে ক্রমে ক্রমে ছয়চক্রস্থল ভেদ করাইতে পারিলে, যে বিশুদ্ধাব. . বিকাশ হয়, তাহাকেই ভগবচ্চৈতন্য কহে। বা মন্ত্রচৈতন্য কহে। হৃদয়ের অনাহত পদ্মে যে সকল বর্ণ গ্রথিত আছে; ক্রিয়াযোগে তাহাদের সুষুম্না পথ সংযুক্ত করিয়া কণ্ঠ দিয়া

প্রকাশ করিলেই, সেই উচ্চারণে ভগবচ্চৈতন্যের বিকাশ হইয়া থাকে। ইহাই যোগিগণের প্রধান যোগোপায় হইতেছে।

আমাদের মনোভাব বিকাশ করিবার জন্য বায়ুকে বক্ষ হইতে ..., তালু প্রভৃতি আটটি স্থান স্পর্শ করিয়া প্রকাশ করিলে যে শব্দ প্রকাশ হয়, তাহাকেই বর্ণ কহে। এই সকল বর্ণে বাহ্যভাব বিকাশ ...। যখন সেই বর্ণশক্তি হৃদয় হইতে ব্রহ্মমূর্দ্ধা অর্থাৎ সুষুম্না ... পূর্ণ করিয়া কণ্ঠদেশ দিয়া নির্গত হয়, তখন তাহাকে চৈতন্য ...পক ধ্বনি কহে। সেই ধ্বনি যোগে ভগবদ্বীর্য্য সম্পন্ন বীজগুলি উচ্চারিত হইলে, তাহাতে ভগবদ্ভাব আপনিই অন্তরে বিকাশ করে, এবং সেই শব্দ শ্রবণে অন্যেরও তদ্ভাব উপস্থিত হয়। অনেকে হয়তো এই যুক্তির উপরে সন্দেহ করিতে পারেন। তাহাদের সংশয়চ্ছেদের ... হইতেছে যে: —কোন এক জন লোক করুণার স্বরে মিশ্রিত ... কে ন কথা বলিলে, নিতান্ত করুণায় আর্দ্র হইতে হয় শ্রোতাকেও ...ীত ভাবে পরিণত করে। আবার সেই কথাগুলি উপহাসস্বরে ... করিলে, লোক হাসিয়া থাকে, সে নিজেও হাস্য করে। ইহা ... বলা হইল, বর্ণ ও শব্দ কেবল অন্তরের ভাবের সহিত মিলিলেই ... উদ্দীপন করিতে পারে না। অন্তর হইতে করুণাদি ভাব ব্যঞ্জক ... স্বর বা ধ্বনির সহিত মিলিলে তবে ভাবোদ্দীপক হয়। সেই ... হৃদয় হইতে, বর্ণ দ্বারা উচ্চারণকৌশলে ব্রহ্মরন্ধ্র পূর্ণ ধ্বনি যদি প্রকাশ হয়, তবে সেই সময়ের কণ্ঠনিঃসৃত স্বরে এমন ভাবের বিকাশ হয়, যাহা শ্রবণমাত্র শ্রোতার চৈতন্যোদ্দীপন হয় এবং উচ্চারণ করিলে ... চৈতন্যময় হইয়া থাকে। অন্তর দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসযোগে বহু অং সংযুক্ত বর্ণ গুলিকে সংহত করিয়া উচ্চারণ করিতে হয় বলিয়া, বহু সন্ধিতে ... বর্ণে এক মন্ত্র হয়। মন্ত্রচৈতন্য ও দেবতার আবির্ভাব-করিতে পারিলে যে অবস্থা সাধকের উপস্থিত হয়, তদ্বিষয় কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন :—

"হৃদয়ে গ্রন্থিভেদশ্চ সর্ব্বাবয়ববর্দ্ধনং।

আনন্দাশ্রূণি পুলকে দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি॥
গদ্‌গদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
সকৃদুচ্চারিতেঽপ্যেবং মন্ত্রে চৈতন্যসংযুতে॥"

অর্থঃ—চৈতন্যযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণ কালে হৃদযের আসক্তির গ্রন্থি অর্থাৎ বাসনা ক্ষয় হইয়া যায়। সর্ব্বাবয়বে কান্তি ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়। চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হয়। সর্ব্বশরীর পুলকিত ও কণ্টকিত হয। হে কুলেশ্বরি, সেই সময়ে মন্ত্রোক্ত দেবতাতে দেহের সমস্ত ক্রিয়া সমর্পিত হয়, মুখে গদ্ গদ্ প্রার্থনা বাক্য নিঃসৃত হইয়া থাকে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

উপাসনার উৎকারার্থে এই ভাবে মন্ত্রগুলিকে অভ্যাস যোগে চৈতন্যময় করিতে হয়। পরে মন্ত্রে যে দেববীর্য্য কল্পিত আছে, তাহার পূজা ও তাহাতে তন্ময় হইতে হয। এই সকল অনুষ্ঠান সক্ষম হইলে উপাসনায় সম্যক ফল লাভ হইয়া থাকে।

অথ সন্ধ্যাপ্রকরণ তত্ত্ব।

এই সন্ধ্যা কার্য্যই উপাসনা তত্ত্বের পরিণাম অনুষ্ঠান ইহাতেই ইহাতে সিদ্ধ হইতে পারিলে দেবপূজার অধিকার জন্ম ইয়া থাকে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা দেহের ক্রিয়া ও পরিবর্ত্তনের মীমাংসা করিয়া, তাহার সহিত ঐক্যমত রাখিযা, এই অহোরাত্রকে বিভাগ করিয়াছেন। অহোরাত্রকে আটটি প্রহরে তাঁহারা বিভাজিত করিয়াছেন। প্রতি দুই প্রহরান্তে জগতের ও জীবদেহের পরিবর্ত্তন ঘটিযা থাকে, এইজন্য মানবের অন্তরে প্রতি পরিবর্ত্তনের সহিত ভগবদ্বীর্য্য ও তত্ত্বজ্ঞান অন্তর্নিবিষ্ট রাখিবার জন্য, প্রতি দুই প্রহর অন্তে সন্ধ্যা ও উপাসনার বিধি শাস্ত্র বিহিত করিয়াছেন। অনেকে হয়তো সন্দেহ করেন যে, সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত দেহের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, তাহার সহিত

মনোভাবের গঠন উত্তম বা অধম কেমন করিয়া ঘটিবে? তদুত্তর এই :—একজন সুজাতীয় সদাচারী ব্যক্তি কিছুদিন জাতীয় ভাব ও সদাচার ত্যাগ করিয়া,যবনের সহবাস করিলেই তাহার যবনোচিত সংস্কার হইয়া যায়। কেন হয়?—না—প্রতি পরিবর্ত্তনকালে যবনাচার অভ্যস্ত হওয়ায় সে তদ্ভাবে পরিণত হইয়া থাকে। যদি প্রতি পরিবর্ত্তনে চিরাভ্যস্ত জাতীয় ভাব আলোচনা না রাখিলে,যবনের সঙ্গে যবন হওয়া যায়; তবে প্রতি পরিবর্ত্তনে ভগবদ্ভাব ভাবিলে ও সদাচারী হইলে,সদ্ভাবে ও চিন্ময়পরিণামে কেমনা পরিণত হওয়া যাইবে?? অহোরাত্রগত অষ্টপ্রহরের দুই প্রহরান্তে এক একটি পরিবর্ত্তন ঘটে বলিয়া এক একটি সন্ধ্যাকাল ঐ সময়ে ঘটিয়া থাকে। ধা ধাতু হইতে সন্ধ্যাশব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ধাধাতুর অর্থ ধারণ করা বা পোষণ করা। কালের বিচ্ছেদে অন্তরের পোষণ বা নবভাব ধারণ ঐ সময়ে ঘটে বলিয়া, প্রতি দুই প্রহরান্তিম কালকে সন্ধ্যা বলিয়া তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। ঐ সন্ধ্যাকালে আত্মপরিবর্ত্তনের জন্য যে উপাসনা করা হয়, তাহাকেই সন্ধ্যাপ্রক্রিয়া কহে। সন্ধ্যা দ্বিবিধা, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। সাম, ঋক, যজু এই ত্রিবেদের নিয়মানুযায়ী সন্ধ্যাকে বৈদিকী সন্ধ্যা কহে। তন্ত্রকথিত উপায়ে সন্ধ্যা করিলে তান্ত্রিকী সন্ধ্যা হইয়া থাকে। বেদোক্ত গায়ত্রীতে যাঁহাদের অধিকার আছে, তাঁহারা বৈদিকী সন্ধ্যার অধিকারী হইতেছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং এ দেশীয় কায়স্থ ও বৈদ্যের কিয়দংশ গায়ত্রীতে অধিকার রাখেন। বঙ্গদেশ ব্যতিত ভারতের অন্য সকল দেশেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিযান্তর্গত কায়স্থ, বৈশ্য এবং ঐ তিন শ্রেণীর সঙ্করণে বা মিশ্রণে যে সকল সঙ্কর জাতির আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের উপনয়ন ও গায়ত্রী আছে। অতএব সকলেই বৈদিকী সন্ধ্যার অধিকারী হইতেছেন। যাঁহারা বৈদিকী সন্ধ্যার অধিকারী, তাঁহারাও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিতে অধিকার রাখেন, এতদ্ভিন্ন নীচ জাতি হইলেও তান্ত্রিকী দীক্ষা মাত্রেই তাঁহাদের তান্ত্রিকী সন্ধ্যার অধিকার ঘটে। তান্ত্রিকী সন্ধ্যা দুইভাগে বিভক্ত,

বৈষ্ণবী ও শক্তি সম্বন্ধীয়া। যাঁহারা কেবল বিষ্ণুমন্ত্রের ও তচ্ছক্তির উপাসক, তাঁহারা বৈষ্ণবী সন্ধ্যা করিয়া থাকেন। যাহারা বিষ্ণু, শিব, ও শক্তি সকলকেই সমান প্রীতি করেন, অথচ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত, তাহার শক্তি সম্বন্ধীয়া সন্ধ্যা করেন। শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্গত অথচ বিষ্ণু বা শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করণে অধিকার থাকে। বৈদিকী হইতে তান্ত্রিকী সন্ধ্যার পার্থক্য এই, যে :—বেদোক্ত এক ব্রহ্ম গায়ত্রীমন্ত্র বৈদিকী সন্ধ্যায় ব্যবহৃত হয়, এবং যে দেবতার উপাসক সেই দেবতার গায়ত্রীই তান্ত্রিকী সন্ধ্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গায়ত্রী ধ্যান ও জপই সন্ধ্যার প্রধান কার্য্য হইতেছে। বৈদিকী ব্রহ্মগায়ত্রী এই যথা :–'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি, ধীয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।' ব্যাখ্যাঃ—তৎ তস্য ভর্গো তেজঃ ধীমহি চিন্তয়ামঃ। কিম্ভূতস্য, সবিতুঃ সর্ব্বভূতানাং প্রসবিতুরিত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতং ? যো ভর্গো ব্রহ্মতেজঃ নোঽস্মাকং ধীয়ো বুদ্ধিঃ ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষেষু প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি নিয়োজয়তি। পুনঃ কিম্ভূতং ? বরেণ্যং জন্মমৃত্যুদুঃখাদি নাশায় ধ্যানেনোপাসনীয়ং। পুনঃ কিম্ভূতং ? ভূর্ভুবস্বঃ ভূর্লোকান্তরীক্ষলোকস্বর্গলোকাত্মস্বরূপোঽপি দেবতাত্মকঃ। ইত্যর্থঃ। সেই ভর্গ অর্থাৎ ব্রহ্মতেজকে আমরা চিন্তা করি, তিনি সবিতা অর্থাৎ সকল জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতেছেন, সেই ভর্গরূপী ব্রহ্মতেজ ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষে আমাদের বুদ্ধিকে নিযুক্ত করেন। জন্মমৃত্যু ও দুঃখাদি নাশের জন্য ধ্যান যোগে তাঁহাকেই উপাসনা করা উচিত হইতেছে। কারণ তিনি ওঁকার অর্থাৎ জাগরণ, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন সকল অবস্থাতেই আত্মারূপে সংসারব্যাপী দেববীর্য্যময় হইয়া আছেন।" শক্তি গায়ত্রী এই যথাঃ—ওঁ সর্ব্বসংমোহিন্যৈ বিদ্মহে বিশ্বজনন্যৈ ধীমহি তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ।" অর্থ :—যিনি জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে অন্তর্যামী চৈতন্যশক্তি রূপে সকল সংসারকে বিমোহিত করেন, তাঁহাকে জানিতে চাহি। যিনি বিশ্বের জননী তাঁহাকে ধ্যান করি, নিজ শক্তি দ্বারা বুদ্ধিকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষে যিনি নিয়োগ করেন, তাঁহাকে ধ্যান করি। 'অথ বিষ্ণুগায়ত্রী যথা :—ওঁ কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি, তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।" যিনি ওঁকাররূপে জাগরণাদি অবস্থায় পাপ হইতে পুণ্যে মনকে আকর্ষণ করেন, তাহাকে জানিতে চাহি,

যিনি ভক্তিতে বশীভূত হইয়া ভক্তের প্রেমরজ্জুতে বদ্ধ হয়েন, তাঁহাকে ধ্যান করি, যিনি সর্ব্বান্তর্যামী আত্মারূপে সকলের বুদ্ধিকে ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষপথে নিয়োগ করেন, তাঁহাকে ধ্যান করি।

এইরূপে সন্ধ্যা কার্য্যে নিজ নিজ গুরুর উপদেশানুসারে আপনাকে দেবময় করিতে হয়। মন্ত্রস্নান, আচমন, সর্ব্বাঙ্গে দেবতার ন্যাস, পাপ ধ্বংস চিন্তা, আত্মাকে পরমাত্মময় চিন্তা এবং গায়ত্রী জপকার্য্য করিতে হয়। এই সকল অনুষ্ঠান দ্বারা প্রতি পরিবর্ত্তনে সত্যই পবিত্র হওয়া যায়। বিশুদ্ধ হৃদয়ে এই অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই পবিত্র হওয়া যায়। বাহ্যসন্ধ্যার ন্যায় অন্তঃসন্ধ্যাতে অধিক চৈতন্যপূর্ণ হওয়া যায়। তদ্বিষয়ে গন্ধর্ব্বতন্ত্র বলিতেছেন: শিবশক্ত্যাঃ সমাযোগো যস্মিন্‌কালে প্রজায়তে। সা সন্ধ্যা কুলনিষ্ঠানাং সমাধিস্থৈঃ প্রতীয়তে॥ আত্মানং সর্ব্বদা সম্যক্ ধ্যায়েৎ ধ্যানপরায়ণঃ। দেবতাভেদরূপেঃ সন্ধ্যা মানসীয়ং পরা প্রিয়ে॥,, অর্থ: -সমাধিকালে আত্মারূপী শিব, কুণ্ডলিনীচৈতন্য শক্তির সহিত যে সময়ে মিলিত হয়েন, তাহাকে প্রকৃত সাধকগণের অন্তঃসন্ধ্যা কাল কহে। সেই জন্য সন্ধ্যা কার্য্যে সতত আত্মাকে ধ্যান করিতে হয় এবং আপনাকে দেবতার সহিত মনে মনে অভেদ ভাবিতে হয়। হে প্রিয়ে। ইহাকেই শ্রেষ্ঠ অন্তঃসন্ধ্যা কহে।

এই সকল প্রস্তাবে উপাসনা প্রকরণের কেবল সংক্ষেপ আভাস মাত্র এই পুস্তকে প্রকাশ করিলাম। এই আভাসে সকলের অনুষ্ঠানে ইচ্ছা হইলে তবে মন্ত্রাদির প্রয়োজন হইবে। এই জন্য 'কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি' নামক অন্য পুস্তকে আমি সন্ধ্যা ও দেবপূজার মন্ত্র এবং আনুষ্ঠানিক সকল কার্য্য বিবৃত করিয়াছি। সে পুস্তকখানি এই পুস্তকের পরিশিষ্ট স্বরূপ হইতেছে। সন্ধ্যা ও দেবপূজার অনুষ্ঠানে তাহা প্রয়োজন হইবে। এই স্থানে ভগবানের নাম, গুরুর চরণ ও ভক্তগণের কৃপা স্মরণ করিয়া উপাসনাতত্ত্ব পুস্তকের উপসংহার করিলাম।

ইতি কান্যকুব্জ নিবাসী বিশ্বামিত্রগোত্রজক্ষত্রিয়কায়স্থকালিদাস

মিত্রবংশীয় কালিদাসাত্মজোমেশচন্দ্রাত্মজো

পেন্দ্রকৃতোপাসনাতত্ত্ব গ্রন্থ

সমাপ্ত।